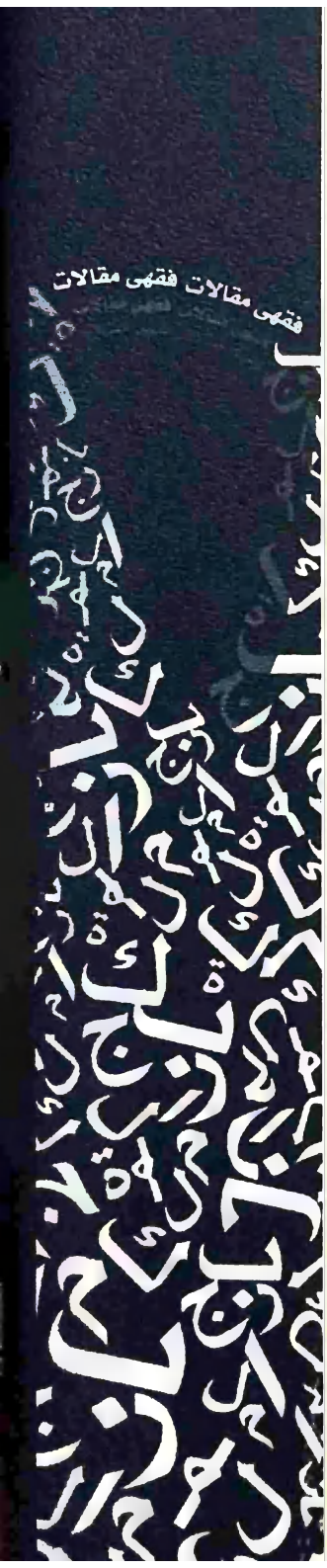

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

ফিকহি মাকালাত

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

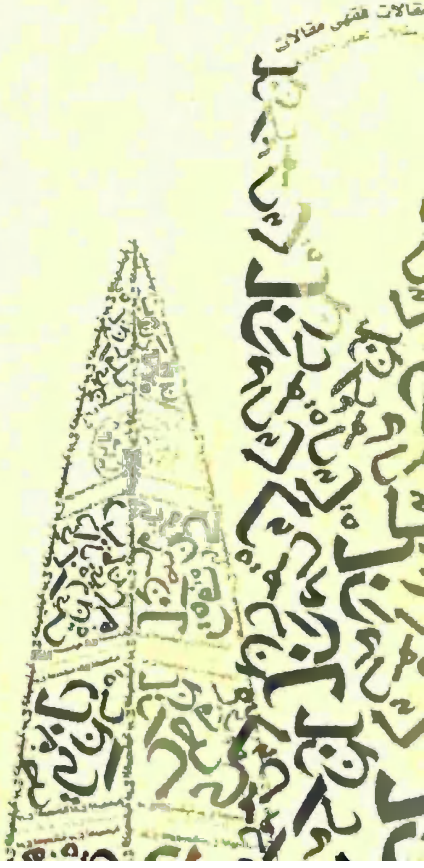

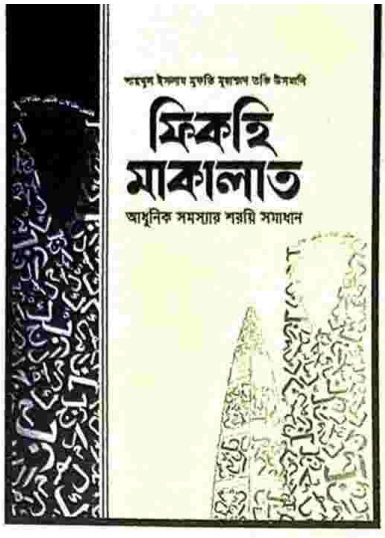

গ্রন্থ সম্পর্কে

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। আধুনিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে তার রচনা-বক্তৃতা পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক উপকার ও কল্যাণ বিতরণ করছে। 'ফিকহি মাকালাত' গ্রন্থটি শায়খুল ইসলামের সেসব রচনার সংকলন-সমষ্টি। এসব রচনার অধিকাংশ সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে আধুনিক সমস্যাবলির সমাধান তুলে ধরা হয়েছে, ফলে মুদ্রাব্যবস্থা, হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পবিত্রতা অর্জন, কাজা নামাজ, ট্রাফিক দুর্ঘটনা, মাতৃদুগ্ধ পান, আমদানি-রপ্তানি, মুদারাবা, জাকাত, জিহাদ, ভোট-নির্বাচন, পশু জবাই, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা, মানব-অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুচারুরূপে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

৩

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-৩

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি মুহাম্মাদ ইসমাইল

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

ভাষা সম্পাদনা : আহমাদ গালিব

বিষয় সম্পাদনা : মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান

বানান ও ভাষারীতি : মাকতাবাতুল ইসলাম

সম্পাদক মণ্ডলী

১. মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান। ২. মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ। ৩. মুফতি রাওয়াহা। ৪. মুফতি সাইফ আকরামি। ৫. মাওলানা আহমাদ গালিব। ৬. মাওলানা ফরিদ মাসউদ। ৭. মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ মুজাহিদ ৮. মাওলানা হাসান আহমাদ।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

৩

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

মাকতাবাতুল ইসলাম

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-৩

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি মুহাম্মাদ ইসমাইল

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক

হাফেজ কুতুবুদ্দিন ইবনু আশ-শায়খ মুহিউদ্দিন আহমাদ

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ : মাকতাবাতুল ইসলাম

মূল্য : BD ৳ ৫১০, US $ 12, UK £ 9

সার্বিক যোগাযোগ

মাকতাবাতুল ইসলাম

[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র	বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা	ইসলামি টাওয়ার
ঢাকা-১২১২	বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১, ০১৯১১৪২৫৬১৫, ০১৯১১৪২৫৮৮৬

ISBN : 978-984-91049-1-9

www.facebook/Maktabatul Islam

www.maktabatul-islam.com

FIQHI MAKALAT 3.RD

Writer : Shaikhul Islam Mufti Mohammad Taqi Osmani

Translatet by : Mufti Muhammad Ismail

একমাত্র পরিবেশক : অর্পণ প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, boibiswa.com

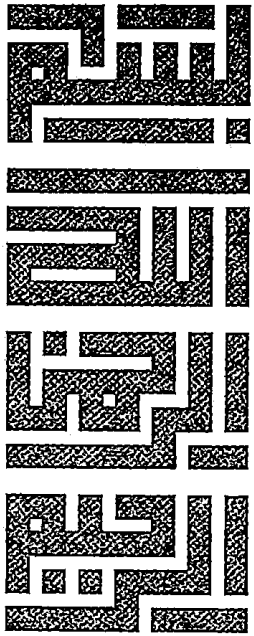
بسم الله الرحمن الرحيم

সূচি

ব্যাংক-ডিপোজিটের শরয়ি বিধান-১৫
রপ্তানির শরয়ি বিধান-৫৯
আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়ার বিধান ও
চার ইমামের মাজহাবের তাহকিক-৯১
জাকাতের আধুনিক মাসায়েল-১১৭
তিন তালাকের শরয়ি বিধান-১৫৯
চিংড়ি খাওয়ার শরয়ি বিধান-১৮৯
হাত-বহাত ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ি বিধান-১৯৭
বিনা দরদামে অল্প অল্প পণ্য ক্রয়ের বিধান-২০৭
মুদারাবা সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান-২৩১
জিহাদ আক্রমণাত্মক নাকি প্রতিরক্ষামূলক?-২৫৩

বিস্তারিত সূচি

ব্যাংক-ডিপোজিটের প্রকারভেদ ১৮
ব্যাংকে রাখা অর্থের ব্যাপারে ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি ১৯
নিকটবর্তী কারণ দুই প্রকার ৩১
এই মাকরুহ দুই প্রকার ৩২
ইসলামি ব্যাংকে টাকা রাখার শরয়ি বিধান ৩৩
ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের জামিন ৩৫
কারেন্ট একাউন্ট-এর মাধ্যমে বন্ধক
কিংবা ক্ষতিপূরণের কাজ নেওয়া ৩৭
সেভিংস একাউন্ট ও ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা বন্ধক হিসেবে রাখা ৪০
ব্যাংক কর্তৃক কারও একাউন্ট স্থগিত করা ৪০
ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের অডিট-পদ্ধতি ৪৪
সঞ্চয়ী একাউন্টের মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি ৪৬
ডেইলি প্রোডাক্টস বা দৈনিক উৎপাদনের হিসাব এবং মুনাফা
নির্ধারণে তা ব্যবহারের সীমারেখা ৫১

রপ্তানির শরয়ি বিধান ৬১
বেচাকেনা সংঘটিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করা ৬১
বিক্রয় ও বিক্রয়ের অঙ্গীকারের মাঝে পার্থক্য ৬১
অর্ডারের সময় পণ্যের অবস্থা ৬৪
যদি অর্ডার নেওয়ার সময় পণ্য প্রস্তুত থাকে ৬৫
যদি অর্ডার নেওয়ার সময় পণ্য প্রস্তুত না থাকে ৬৫
পণ্যের দায়িত্ব কখন (ক্রেতার দিকে) ফিরবে ? ৬৭
এগ্রিমেন্ট টু সেল তথা বেচাকেনার ওয়াদা পূরণ না করা ৬৮
অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে ক্ষতির ব্যাখ্যা ৬৯
শরিয়তের দৃষ্টিতে লোকসানের ব্যাখ্যা ৭০
রপ্তানির জন্য পুঁজি অর্জন করা ৭১

এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং-এর পদ্ধতি ৭১
প্রি শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং (তথা পণ্য জাহাজে তোলার আগে অর্থায়ন পদ্ধতি)-এর ইসলামি পদ্ধতি ৭২
পোস্ট শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং (তথা পণ্য জাহাজে তোলার পর অর্থায়ন প্রক্রিয়া)-এর ইসলামি পদ্ধতি ৭৩
বিল ডিসকাউন্টিং-এর জায়েজ পদ্ধতি ৭৩
ফরেন এক্সচেঞ্জের অগ্রিম বুকিং ৭৫
মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতি ৭৫
ফরেন এক্সচেঞ্জ বুকিং ফি ৭৭

প্রশ্নোত্তর পর্ব ৮০
একজনের সঙ্গে বিক্রির অঙ্গীকার করে অন্য জনের সঙ্গে বিক্রয়- চুক্তি করা ৮০
প্রত্যাহারকৃত শুল্কের প্রকৃত মালিক কে? ৮১
আমদানিকারকের সম্মতি কি জরুরি? ৮২
দোকানদার সুদে ঋণ গ্রহণকারীর কাছে পণ্য বিক্রয় করতে পারবে কি? ৮২
পণ্যের কাগজপত্র বেচাকেনা বৈধ কি না? ৮৩
ব্যাংকের জন্য কি সরাসরি ব্যাবসার অনুমতি রয়েছে? ৮৩
এজেন্টের সার্টিফিকেট জারি করার মাধ্যমে কি মালের দায়-দায়িত্ব স্থানান্তরিত হবে? ৮৪
রপ্তানির ক্ষেত্রে বীমা বাধ্যতামূলক হলে করণীয় কী? ৮৫
পণ্য বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় প্রকৃত বেচাকেনার বিধান ৮৫
কোটা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ৮৬
ফটো সম্বলিত গার্মেন্টস-পণ্য সরবরাহ করার বিধান ৮৬
ইংরেজদের পোশাক সরবরাহ করার বিধান ৮৭
অক্ষমতার দরুণ বিক্রয়ের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে না পারার বিধান ৮৭
রপ্তানিকারক যদি নিজ ওয়াদা পূরণ না করে ৮৮
ব্যাংক যদি পার্টনারশিপে সম্মত না হয় ৮৮

আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়ার বিধান ও চার ইমামের মাজহাবের তাহকিক ৯৩
মালিকি মাজহাব ৯৫
শাফিয়ি মাজহাব ৯৬
হাম্বালি মাজহাব ৯৭
ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবের বিশ্লেষণ ৯৮
সারকথা ১১৪
উপর্যুক্ত ফতোয়াকে যারা সঠিক বলেছেন ১১৫

জাকাতের আধুনিক মাসায়েল ১১৯
প্রাক্‌কথন ১১৯
জাকাত না দেওয়ার পরিণতি ১১৯
এই সম্পদ কোত্থেকে আসে? ১২১
কে পাঠান ক্রেতা-গ্রাহক? ১২১
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১২২
কাজের বণ্টন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ১২৩
জমি থেকে উৎপন্নকারী কে? ১২৪
সৃষ্টি করার ক্ষমতা মানুষের নেই ১২৪
প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ ১২৫
শতকরা মাত্র আড়াই টাকা ১২৫
জাকাতের গুরুত্ব ১২৬
হিসাব করে জাকাত বের করো ১২৬
জাকাত না দেওয়া সম্পদ ধ্বংসের কারণ ১২৭
জাকাত আদায়ের জাগতিক উপকারিতা ১২৭
সম্পদে বরকতহীনতা ১২৮
জাকাতের নেসাব ১২৯
প্রতি টাকায় বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয় ১২৯
জাকাতের প্রদানের তারিখে যে পরিমাণ টাকা থাকবে সেই পরিমাণ অর্থের জাকাত দিতে হবে ১৩০

জাকাতযোগ্য সম্পদ কী কী? ১৩১
জাকাতের সম্পদে যুক্তির কোনো অবকাশ নেই ১৩১
ইবাদত করা আল্লাহর নির্দেশ ১৩২
ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি ১৩৩
ব্যবসায়িক পণ্যের পরিচয় ১৩৩
কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে? ১৩৪
কোম্পানির শেয়ারে জাকাতের বিধান ১৩৪
কারখানার সম্পদে জাকাতের বিধান ১৩৫
ঋণের যে টাকার প্রাপ্তি নিশ্চিত তার জাকাতের বিধান ১৩৬
জাকাতের হিসাব থেকে ঋণ বাদ দেওয়া ১৩৬
ঋণ দুই প্রকার ১৩৭
ব্যবসায়িক ঋণ কখন বাদ দেওয়া হবে? ১৩৭
ঋণের উদাহরণ ১৩৭
উপযুক্ত ব্যক্তিকে জাকাত দিতে হবে ১৩৮
জাকাতের প্রকৃত হকদার ১৩৯
হকদারকে জাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দিতে হবে ১৩৯
আত্মীয় স্বজনদের মাঝে কাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে? ১৩৯
বিধবা ও এতিমদের জাকাত দেওয়ার বিধান ১৪০
ব্যাংক কর্তৃক জাকাত কর্তনের বিধান ১৪০
কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারের জাকাত কর্তন ১৪১
কোনটি হবে জাকাত আদায়ের তারিখ? ১৪২
জাকাত আদায়ের জন্য কি রমজান নির্দিষ্ট? ১৪২

প্রশ্নোত্তর পর্ব ১৪৪
চাঁদের তারিখ নির্দিষ্ট করা ১৪৪
অলংকারের জাকাত কার দায়িত্বে? ১৪৪
জাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি ১৪৫
প্রচার প্রসারের কাজে জাকাতের অর্থ ব্যয় ১৪৬
মাদরাসার ছাত্রদের জাকাত দেওয়া ১৪৬

নির্ধারিত তারিখে নেসাবের চেয়ে সম্পদ কম হলে ১৪৭
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হওয়ার ব্যাখ্যা ১৪৭
টেলিভিশন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ১৪৮
নির্মাণকাজে জাকাতের অর্থ খরচ করার বিধান ১৪৮
জাকাতের অর্থ দিয়ে খাবার খাওয়ানো ১৪৮
জাকাতের অর্থ দিয়ে কিতাব কিনে দেওয়া ১৪৯
ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ১৪৯
জাকাত হিসেবে ব্যবসায়িকপণ্য দেওয়ার বিধান ১৪৯
আমদানিকৃত পণ্যে জাকাতের বিধান ১৫০
ইংরেজি তারিখ থেকে আরবি তারিখে ফেরার পদ্ধতি ১৫০
খাঁটি স্বর্ণের ওপর জাকাত ১৫০
মুজাহিদদের জাকাত দেওয়া ১৫১
অল্প অল্প করে জাকাত দেওয়া ১৫১
একাধিক গাড়ির জাকাত ১৫১
ভাড়া বাড়ির জাকাত ১৫২
ঋণ প্রার্থীকে জাকাত দেওয়া ১৫২
ব্যাংক যদি সঠিক খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় না করে ১৫২
জাকাত আদায়ের তারিখ পরিবর্তনের বিধান ১৫৩
নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়ার বিধান ১৫৩
জাকাত আদায়ের জন্য নিয়ত করা জরুরি ১৫৩
কর্মচারীকে জাকাত দেওয়া ১৫৪
ছাত্রদেরকে বেতন বাবদ জাকাত দেওয়া ১৫৪
শেয়ারের বার্ষিক মুনাফায় জাকাত ১৫৪
শেয়ারের মূল্য কোনটি গ্রহণযোগ্য? ১৫৫
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানপত্র থাকা সত্ত্বেও জাকাত দেওয়া ১৫৫
অসুস্থ ব্যক্তিকে জাকাত হিসেবে ঔষধ দেওয়া ১৫৫
কিশোরীদের অলংকারে জাকাতের বিধান ১৫৬
অলংকার বিক্রয় করে জাকাত আদায় করবে কি? ১৫৬
নির্দিষ্ট তারিখে জাকাতের হিসাব জরুরি ১৫৭
পজিশনের টাকায় জাকাতের হুকুম ১৫৭

বাণিজ্যিক সুনামের ভিত্তিতে বিক্রিত বিল্ডিংয়ে জাকাত ১৫৮
যে ঋণ ফিরে পাওয়ার আশা নেই তার বিধান ১৫৮

একই সঙ্গে তিন তালাকের বিধান ১৬১
দুটি মাসআলা ১৬১
একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া জায়েজ কি না? ১৬১
তিন তালাক কি এক তালাক বলে গণ্য হবে? ১৬৫
প্রথম মাজহাব ১৬৫
দ্বিতীয় মাজহাব ১৬৫
তৃতীয় মাজহাব ১৬৬
তিন তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ইমামের দলিলসমূহ ১৬৮
বিপক্ষের দলিলসমূহের জবাব ১৮০

চিংড়ি খাওয়ার শরয়ি বিধান ১৯১

হাত-বহাত ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ি বিধান ১৯৯
প্রথমত : বিনাবাক্যে হাত-বহাত ক্রয় বিক্রয়ের বিধান ১৯৯

দ্বিতীয়ত : ইসলামি ব্যাংকের মুরাবাহা লেনদেনে
'হাতে হাতে বেচাকেনা' জায়েজ হওয়ার সীমারেখা ২০৩

বিনা দরদামে অল্প অল্প করে পণ্য ক্রয়ের বিধান ২০৯
সারকথা ২২৩
অগ্রীম টাকা জমা দিয়ে ইসতিজরার করা ২২৪
চতুর্থত : ব্যাংকিং সেক্টরে ইসতিজরারের ব্যবহার ২২৯

মুদারাবা সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান ২৩৩
মুদারাবা সার্টিফিকেট ২৩৩

প্রথমত : সুদি ঋণের সার্টিফিকেট ২৩৩
দ্বিতীয়ত : এসব সার্টিফিকেটের ব্যাপারে
জারিকৃত বিশেষ কিছু নীতিমালা ২৩৫
জর্ডান সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ২৩৬
সনদপত্র রহিত করার মাসআলা ২৪৩
প্রথম মাসআলা এবং তার জবাব ২৪৩
দ্বিতীয় মাসআলা ২৪৫
তৃতীয় মাসআলা ২৪৭
তৃতীয়ত : শেষ প্রশ্ন ২৪৯

ইসলামে জিহাদ আক্রমণাত্মক না প্রতিরক্ষামূলক? ২৫৫
শাইখুল ইসলাম মুফতি তকি উসমানি-এর জবাব ২৬২

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

ব্যাংক-ডিপোজিটের শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'ব্যাংক-ডিপোজিট-এর শরয়ি বিধান' প্রবন্ধটি মূলত শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) কর্তৃত রচিত 'أحكام الودائع المصرفية' নামক আরবি প্রবন্ধের অনুবাদ। উস্তাদে মুহতারাম এ প্রবন্ধটি ১৪১৬ হিজরিতে আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত ইসলামি ফিকহ একাডেমির নবম অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। 'বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা' গ্রন্থে আলোচ্য প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

—আবদুল্লাহ মায়মান

ودائع المصرفية বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেসব টাকা বা সম্পদ যাকে কোনো ব্যক্তি সঞ্চয়ী কোনো প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসেবে রাখে। তা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখুক বা পরস্পরে এই চুক্তির ভিত্তিতে রাখুক যে, মালিক ইচ্ছে করলে যে-কোনো সময় তার সম্পূর্ণ টাকা বা আংশিক টাকা ব্যাংক থেকে ওঠাতে পারে।

বর্তমান সময়ে ব্যাংকের পদ্ধতি হলো, কোনো ব্যক্তি ব্যাংকে যে টাকা রাখে অবিকল সেই টাকা ব্যাংকে অক্ষত থাকে না, বরং সেই টাকা বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক ক্লায়েন্টদের হাতে তুলে দেয় এবং পরবর্তীকালে তা থেকে সুদ বা লাভের আশা করে। এসব টাকা ব্যাংকের দায়িত্বে থাকে। পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের জন্য আবশ্যক হলো এ সমুদয় অর্থ যে-কোনো মুহূর্তে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকা।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকে সঞ্চিত টাকার জন্য সাধারণভাবে وديعت বা أمانت শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা সেই অর্থ উদ্দেশ্য নয় যা ফিকহশাস্ত্রে বলা হয়। কেননা ফিকহি পরিভাষায় যাকে أمانت বা وديعت বলা হয় তাতে কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকার ত্রুটি ছাড়া সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ আসে না। সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পদ কর্তৃপক্ষের কাছে স্বআকৃতিতে বিদ্যমান থাকতে হয়। তবে ব্যাংকে জমাকৃত টাকার ব্যাপারে যে وديعت শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে; তা মূলত শাব্দিক অর্থের বিবেচনায়। কারণ, আরবিতে وديعت শব্দটি فعيلة ওজনে আসে। এর অর্থ হলো, যে জিনিস আমানত গ্রহণকারীর কাছে রাখা

হয়। আর ব্যাংক-ডিপোজিটের ক্ষেত্রে وديعت শব্দের প্রয়োগ শুধু শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় সঠিক। অর্থাৎ, ব্যাংক হলো আমানত গ্রহণকারী। ব্যাংকে এর প্রতি লক্ষ করা হয় না যে, গচ্ছিত অর্থ আমানত হিসেবে থাকবে নাকি ক্ষতিপূরণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে? (অতএব, শরিয়তের পরিভাষায় وديعت এর যে অর্থ রয়েছে সে অনুযায়ী তা ব্যাংক-ডিপোজিটের ওপর প্রয়োগ করা সঠিক নয়।')

ব্যাংক-ডিপোজিটের প্রকারভেদ

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চার ধরনের ব্যাংক-ডিপোজিট রয়েছে—

১. কারেন্ট একাউন্ট বা চলতি হিসাব (Current Account)

এই একাউন্টে টাকা জমাকারীর জন্য এই স্বাধীনতা থাকে যে, সে যখন ইচ্ছে করবে তখনই টাকা উত্তোলন করতে পারবে। সুতরাং এ জাতীয় একাউন্ট-হোল্ডারের পূর্ণ ইচ্ছাধিকার রয়েছে যে, সে যখন ইচ্ছা যে মুহূর্তে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে পরবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষও একাউন্ট-হোল্ডার চাহিবামাত্র টাকা দিতে বাধ্য থাকবে। একাউন্ট হোল্ডার এ বিষয়ে পূর্ব থেকে ব্যাংকে অবগত করতে বাধ্য নয়। এ জাতীয় একাউন্ট-হোল্ডারকে ব্যাংক কোনো প্রকার লাভ বা সুদ দেয় না। বরং কোনো কোনো রাষ্ট্রে এমন নিয়মও চালু আছে যে, উল্টো ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একাউন্ট-হোল্ডার থেকে ফি নিয়ে থাকে। তবে এ ধরনের একাউন্টে রাখা টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পৃথকভাবে রাখে না, বরং অন্যান্য টাকার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। এমনকি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের এ অধিকারও থাকে যে, প্রয়োজন হলে ব্যাংক সেই টাকা খরচ করতে পারে। যদিও ব্যাংকের নিয়ম হলো একাউন্টে রাখা জমাকৃত টাকার নির্দিষ্ট একটি অংশ স্টক করে রেখে দেওয়া, যাতে গ্রাহক যখন ফিরিয়ে নিতে চায় তখন যেন সহজেই গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করা যায়।

২. ফিক্সড ডিপোজিট (Fixed Deposite)

ফিক্সড ডিপোজিট হলো, যে একাউন্টে গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টাকা জমা রাখে। একাউন্ট-হোল্ডারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে টাকা ওঠানোর কোনো সুযোগ নেই। সাধারণভাবে এ সময়টা পনের দিন থেকে শুরু করে এক বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেই টাকা বিনিয়োগকৃত খাতে

ব্যয় করে এবং জমাকারীকে মার্কেটের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন হারে সুদ প্রদান করে।

৩. সেভিংস একাউন্ট বা সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account)

এই একাউন্টে যে টাকা জমা রাখা হয়, তা ওঠানোর কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। তবে ব্যাংকের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী গ্রাহকের জন্য একসঙ্গে সব টাকা উত্তোলন করার সুযোগ নেই। ব্যাংক নির্দিষ্ট করে দেয় যে, এই পরিমাণ টাকা একদিনে ওঠাতে পারবে। আবার কোনো কোনো সময় যদি বড়ো অঙ্কের টাকা ওঠাতে চায়, তাহলে আগে থেকেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সে বিষয়ে অবগত করতে হবে। এই একাউন্টে সঞ্চয়কৃত টাকা একদিক দিয়ে কারেন্ট একাউন্টে টাকা জমা রাখার মতো। কারণ, এই একাউন্ট-হোল্ডার নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করা ছাড়া যখন ইচ্ছা তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ওঠাতে পারে। আরেক দিক দিয়ে এই একাউন্ট ফিক্সড ডিপোজিটের মতো। কারণ, একাউন্ট-হোল্ডার সব টাকা একসঙ্গে ওঠাতে পারে না। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই একাউন্টে সঞ্চয়কৃত টাকার ওপর কিছু লাভও দিয়ে থাকে। তবে ফিক্সড ডিপোজিটের তুলনায় তাতে লাভের পরিমাণ কম থাকে।

৪. লকার (Lockers)

লকারকে আরবি ভাষায় المقفولة الخزانة। বা 'লকার সঞ্চয়' বলা হয়। এর পদ্ধতি হলো : কোনো ব্যক্তি ব্যাংকের নির্দিষ্ট কোনো সিন্দুক ভাড়া নিয়ে নিজেই তাতে সম্পদ জমা রাখবে। এই সম্পদের সঙ্গে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি ব্যাংক কর্তৃপক্ষেরও জানা থাকে না যে, তাতে কী রয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ এই লোহার সিন্দুকে স্বর্ণ, রুপা, মূল্যবান পাথর এমনকি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রও রেখে থাকে। নগদ অর্থও কোনো কোনো সময় সেই সিন্দুকে রাখা হয়।

ব্যাংকে রাখা অর্থের ব্যাপারে ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি

উপর্যুক্ত চার প্রকার একাউন্টে জমাকৃত টাকার শরয়ি বিধান জানার আগে এ ব্যাপারে ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি জানা জরুরি। কারণ, এগুলোর শরয়ি বিধান নির্ভর করে তার ফিকহি অবস্থানের ওপর।

চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ 'লকার সঞ্চয়' সম্পর্কে যা জানা যায়—এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে লোহার সিন্দুক ভাড়ার বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে। এতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে ভাড়ার লেনদেন সংঘটিত হয়। ভাড়াচুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর ওই লকার ব্যাংকের কাছে আমানত হিসেবে বিদ্যমান থাকে। অতএব, এর ওপর আমানতের বিধান আরোপিত হবে।

আর প্রথম তিন প্রকার একাউন্টে সাধারণভাবে আমাদের ব্যাংকগুলোতে যে প্রথা চলে আসছে তার ব্যতিক্রম হলো ইসলামি ব্যাংকের অবস্থান। তাই উভয় প্রকার ব্যাংক সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা দরকার।

ক. সাধারণ ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ

সাধারণ ব্যাংকসমূহে সঞ্চিত অর্থ সম্পর্কে বর্তমান যুগের আলেমগণের বিরাট এক অংশ এই অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন যে, জমাকৃত অর্থের অবস্থা হলো ঋণস্বরূপ যা একাউন্ট-হোল্ডার ব্যাংকে প্রদান করে থাকে। যদি এই জমাকৃত অর্থকে আমানত বলা হয় তাতেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ, চুক্তির মাঝে অর্থ ধর্তব্য হয় (শব্দ নয়)। আর এই টাকার অবস্থা তিনপ্রকার একাউন্ট অর্থাৎ, কারেন্ট একাউন্ট, সেভিংস একাউন্ট এবং ফিক্সড ডিপোজিট-এর মাঝেই বিদ্যমান। কারণ, এই তিনপ্রকার একাউন্টে যে অর্থ জমা রাখা হয় সবগুলোর ব্যাপারেই ব্যাংক দায়িত্বশীল। অর্থাৎ, যদি এই অর্থ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ব্যাংকের দায়িত্বে ক্ষতিপূরণযোগ্য হবার কারণে এই টাকা আমানত হবার অবস্থান থেকে বের হয়ে যায়। কেননা আমানতের বিধান এই যে, যার কাছে আমানত রাখা হয়, তার অবহেলা ছাড়া প্রাকৃতিক কারণে যদি আমানতকৃত সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমানত গ্রহণকারী ব্যক্তি এর দায়িত্বশীল হয় না।

তবে বর্তমান সময়ের কোনো কোনো আলেম ফিক্সড ডিপোজিট এবং কারেন্ট একাউন্টের গচ্ছিত অর্থে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, ফিক্সড ডিপোজিটে জমাকৃত অর্থ ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণস্বরূপ। কারণ, তাতে একাউন্ট-হোল্ডারের এই অধিকার নেই যে, সে যখন ইচ্ছা করবে তখনই ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করবে। এ বাধ্যবাধকতার কারণে এই টাকা আমানতের গণ্ডি থেকে বের হয়ে ঋণের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছে। এমনিভাবে সেভিংস একাউন্টে জমাকৃত অর্থও আমানতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা ঋণ। কারণ,

এই একাউন্ট-হোল্ডারের জন্য একসঙ্গে সব টাকা উত্তোলনের অধিকার নেই। তবে কারেন্ট একাউন্টে জমাকৃত অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের অভিমত হলো, উপর্যুক্ত দুই একাউন্টে জমাকৃত অর্থের চেয়ে তা ব্যতিক্রম। তাদের কাছে কারেন্ট একাউন্টের টাকা ক্ষতিপূরণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমানত। কারণ, তাতে একাউন্ট-হোল্ডারের এই অধিকার রয়েছে যে, তার যখন ইচ্ছা তখন ব্যাংক থেকে নিজের সমুদয় অর্থ ওঠাতে পারে। এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ, কারেন্ট একাউন্টে টাকা সঞ্চয়কারীর আদৌ এই ইচ্ছা থাকে না যে, সে ব্যাংকের বিনিয়োগ থেকে কোনো লাভ বা সুদ গ্রহণ করবে, বরং সে শুধু সংরক্ষণের নিয়তে ব্যাংকে টাকা জমা রাখে। সুতরাং ব্যাংককে ঋণ দেওয়া যেহেতু তার উদ্দেশ্য নয়; তাই তার জমাকৃত টাকাকে ঋণ বলাও ঠিক হবে না। কেননা এটি যেন এমন হয়ে গেলো যে, কোনো কথার এমন ব্যাখ্যা করা যার প্রতি বক্তা সন্তুষ্ট নয়। সাধারণভাবে কারেন্ট একাউন্টে জমাকৃত টাকা অন্যান্য টাকার সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয় এবং সেই টাকা নিজের প্রয়োজনে খরচও করা হয়। সুতরাং এতটুকু আমানত পরিপন্থি কাজ তাকে আমানত থেকে বের করবে না। কারণ, ব্যাংক গ্রাহকের টাকায় যে হস্তক্ষেপ করে তা মূলত মালিকের অনুমতিক্রমে করে। আর মালিকের অনুমতিক্রমে আমানতে হস্তক্ষেপ করা নাজায়েজ নয়। সুতরাং কর্তৃপক্ষের এই হস্তক্ষেপের কারণে এই টাকা আমানতের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে না।

কিন্তু আমাদের কাছে ব্যাংকে রাখা জমাকৃত টাকা সম্পর্কে কোনো কোনো আলেম যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়। কেননা যারা সাধারণ ব্যাংকে টাকা রাখে তারা 'আমানত' অথবা 'ঋণ' এ জাতীয় পরিভাষার পার্থক্য বোঝে না। এমনকি তারা এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহও পোষণ করে না। জনগণ শুধু সঞ্চয়কৃত টাকা থেকে মুনাফার প্রত্যাশী হয়ে থাকে। কারণ, সাধারণ মানুষ এই শর্তে ব্যাংকে টাকা রাখে যে, যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ব্যাংক এর দায়ভার নেবে। যদি মানুষ এমনটি জানতে পারে যে, আমার টাকা ব্যাংকে আমানত-স্বরূপ। অতএব, এই টাকা যদি ব্যাংকের অবহেলা ছাড়া কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ফিরিয়ে দেবে না। বিষয়টি এমন হলে কোনো মানুষই ব্যাংকে টাকা রাখবে না। যদি ব্যাংক এই ঘোষণা না দিতো কিংবা ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই নিয়মটি প্রসিদ্ধ না হতো যে, যে ব্যক্তিই ব্যাংকে টাকা রাখবে, তার সেই টাকার পূর্ণ দায়িত্বশীল ব্যাংক

হবে, তাহলে কোনো মানুষই ব্যাংকে টাকা জমা রাখতো না। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকে জমাকারী ব্যাক্তি নিজেই এটি কামনা করে যে, যদি আমার টাকা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ব্যাংক এর দায়িত্বশীল। শুধু আমানত হিসেবে কেউই ব্যাংকে টাকা রাখে না। কারণ, আমানতের টাকা ক্ষতিপূরণযোগ্য নয়। অবশ্য ঋণের টাকা ক্ষতিপূরণযোগ্য। এর দ্বারা বুঝে আসে, ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকে টাকা জমাকারীর উদ্দেশ্য হলো ব্যাংককে দায়িত্বশীল করে নিজের অর্থ সংরক্ষণ করা। নিজের অর্থ দিয়ে ব্যাংককে কোনো প্রকার সাহায্য বা অনুগ্রহ করা উদ্দেশ্য নয়। আর শুধু এ উদ্দেশ্যের কারণে ওই লেনদেন ঋণ হওয়ার গুণ থেকে বের হবে না। কারণ, ঋণের চুক্তিতে নিম্নোক্ত দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকা জরুরি—

১. এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে নিজের সম্পদ এই অনুমতিক্রমে প্রদান করবে যে, প্রয়োজন হলে খরচ করতে পারবে। তবে শর্ত হলো যদি ঋণদাতা কখনো নিজের টাকা ফেরত নিতে চায়, তাহলে ঋণ গ্রহণকারী ওই টাকার অনুরূপ টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে।

২. দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ওই সম্পদ যদি ঋণ গ্রহণকারীর হাতে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অনুরূপ সম্পদ ঋণদাতাকে ফেরত দিতে হবে।

ব্যাংকে জমাকৃত টাকার ক্ষেত্রে এ উভয় বিষয়ই পাওয়া যায়। ঋণদাতা কখনো তার ঋণ দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়, ঋণ গ্রহণকারীর ওপর ইহসান ও অনুগ্রহ করা। তবে ঋণের মাঝে এই উদ্দেশ্য থাকা জরুরি নয়। কখনো এই উদ্দেশ্য পাওয়া যেতে পারে, আবার কখনো নাও পাওয়া যেতে পারে। (সুতরাং এ উদ্দেশ্য পাওয়া না পাওয়ার ওপর ঋণ হওয়া বা না হওয়ার কোনো প্রভাব পড়বে না।)

বর্ণিত আছে যে, জুবায়ের ইবনু আওয়াম রা. এর কাছে লোকেরা নিজের টাকা আমানত রাখার জন্য আসত। এর মাধ্যমে জুবায়ের রা.-কে সাহায্য করার কোনো উদ্দেশ্য তাদের ছিলো না, বরং নিজের সম্পদ হেফাজত করা উদ্দেশ্য ছিলো। জুবায়ের রা. এর সাধারণ নিয়ম ছিলো, কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর কাছে টাকা রাখার জন্য আসতো, তাহলে তিনি বলতেন, এই টাকা আমার প্রয়োজনে খরচ করবো। যদি কোনো কারণে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতিপূরণ দেবো। এভাবে হলে আমার কাছে টাকা রাখতে পারো। কেউ যদি এই শর্তে রাজি হতো, তাহলেই তিনি তার টাকা নিজের কাছে জমা

রাখতেন। যদি কেউ আমানত হিসেবে টাকা রাখতে আসতো, তাহলে তিনি বলতেন, এই টাকা আমানত নয় বরং ঋণ। জুবায়ের রা. এই লেনদেনকে ঋণের লেনদেন বলেছেন; অথচ ঋণদাতার এই ঋণের মাধ্যমে জুবায়ের রা.-কে কোনো প্রকার সাহায্য করা উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিলো নিজেদের টাকা সংরক্ষণ করা।[১]

উপরে উল্লিখিত বিশদ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, নিজের টাকা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া; ঋণের চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সঠিক কথা হলো, ঋণের চুক্তি একটি অনুগ্রহমূলক চুক্তি। কারণ, ঋণদাতা তা থেকে এক টাকাও লাভ করে না। অর্থাৎ, যে পরিমাণ টাকা সে ঋণ দিয়েছে তার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো টাকা সে পায় না। তবে এই আর্থিক চুক্তিটা এমন যাতে দুই পক্ষের কারও না কারও কোনো উপকার অবশ্যই হয়। যেমন : কেউ ঋণ দেওয়ার দ্বারা পরকালে প্রতিদান পাবে, যদি তার ঋণগ্রহীতাকে সহযোগিতা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কখনো ঋণ দ্বারা এই উপকার হয় যে, ওই টাকাগুলো ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে চলে যায়। এখন যদি টাকাগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ঋণগ্রহীতাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাছাড়া তার টাকা সঞ্চিত থাকার বিষয়টি তো আছেই। এ কারণেই মানুষ নগদ টাকা ব্যাংকে জমা রাখে। যদি এটুকু উপকার মানুষ না পেতো, তাহলে কেউ ব্যাংকে টাকা রাখতো না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ব্যাংকে টাকা জমাকারীর উদ্দেশ্য হলো, 'ঋণ' দেওয়া। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ যেহেতু জানে না যে, ব্যাংকে এভাবে টাকা জমা করাকে ফিকহের পরিভাষায় ঋণ বলে তাই তারা এ পদ্ধতিকে ঋণ বলে না। অথচ বাস্তবে এটি ঋণ।

কোনো কোনো সময় 'কারেন্ট একাউন্টে' জমাকৃত অর্থকে 'ঋণ' বলা হয় না, বরং ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে 'আমানত' বলা হয়। তবে অর্থ জমাকারী ব্যক্তি ব্যাংককে এই অনুমতি দিয়েছে যে, এই টাকা অন্য টাকার সঙ্গে মিলানো যাবে এবং ব্যাংক চাইলে প্রয়োজনে এই টাকা খরচ করতে পারবে। আমানতকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার কারণে অথবা অন্য অর্থের সঙ্গে মিলানোর অনুমতির কারণে সেই টাকা 'আমানতের' হুকুম থেকে বের হয়ে যাবে না। তবে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমন্বয় সঠিক নয়। কারণ, টাকার মালিক যখন এই অনুমতি দেয় যে, আমানতের টাকা অন্যান্য টাকার

[১] বুখারি শরিফ : কিতাবুল জিহাদ, ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭৫।

সঙ্গে মিলানো যাবে; তখন এই টাকা আমানতের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে শরিকানা মালিকানায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এই মিশ্রিত সম্পদ উভয়ের মাঝে শরিক হয়ে যায়। যেমনটি ফকিহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন।[২]

ফিকহশাস্ত্রে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, শরিকানা সম্পদে এক শরিকের জন্য অপর শরিকের সম্পদ গ্রহণ করাটা 'আমানত' গ্রহণের মতো হয়। যদি এই সম্পদ কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়া ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে শরিকের ওপর কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ আসবে না। কিন্তু যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তারা কখনো এমনটি চায় না যে, ব্যাংকে যে টাকা রাখা হয়েছে, সেটি আমানতের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে, বরং তারা চায় ব্যাংকে আমাদের টাকা 'ক্ষতিপূরণযোগ্য' হিসেবে থাকুক। এ থেকে বোঝা যায়, ব্যাংকে টাকা জমাকারী কখনো ব্যাংকের সঙ্গে আমানতের লেনদেন করতে চায় না, বরং ঋণ হিসেবে লেনদেন করতে চায়।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংকে যে টাকা রাখা হয় অর্থাৎ, তিন প্রকারের একাউন্টে জমাকৃত টাকার সবই 'ঋণ' হিসেবে সঞ্চিত থাকে। এই 'ঋণ' একাউন্ট-হোল্ডার ব্যাংককে দিয়ে থাকে। অতএব, এর ওপর ঋণের বিধানই প্রয়োগ হবে।

খ. প্রচলিত ব্যাংকসমূহে টাকা রাখা জায়েজ কি না?

উপরে উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ব্যাংকে জমাকৃত টাকা ঋণ হিসেবে বিবেচিত। এখন একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যেসব ব্যাংকে সুদের কারবার চলে সেসব ব্যাংকে টাকা রাখা মুসলিমদের জন্য বৈধ কি না?

এই প্রশ্নের সমাধান হলো, 'ফিক্সড ডিপোজিট' ও সেভিংস একাউন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাংক একাউন্ট-হোল্ডারকে মুনাফা দিয়ে থাকে—আর এ কথা চূড়ান্ত যে, এসব একাউন্টে জমাকৃত টাকা ঋণ হিসেবে বিবেচিত—তাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একাউন্ট-হোল্ডারকে মূলধনের অতিরিক্ত যা দেবে তা পরিষ্কার সুদ বলে গণ্য হবে। এটি বৈধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামি ফিকহ একাডেমি-এর দ্বিতীয় সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি

[২] ফতোয়ায়ে শামি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৬৯।

ওই একাউন্টসমূহে টাকা জমা রাখবে সে যেন ব্যাংকের সঙ্গে সুদভিত্তিক ঋণের লেনদেন করছে। যা সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং মুসলিমদের জন্য এ উভয় প্রকার একাউন্টে অর্থ জমা রাখা জায়েজ নেই।

অবশ্য বর্তমান সময়ের কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন, এ উভয় প্রকার একাউন্টে টাকা জমা রাখা জায়েজ। তবে ব্যাংক যে মুনাফা দিয়ে থাকে তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করা যাবে না, বরং এই মুনাফা ফকির মিসকিনদের মাঝে দান করে দেবে, অথবা অন্যকোনো নেককাজে খরচ করবে।

কিন্তু আমরা এই অভিমতের সঙ্গে একমত নই। কারণ, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রাখা; চাই তা কোনো নেক কাজে খরচ করার উদ্দেশ্যেই হোক, সেটি সুদের লেনদেনে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। আর সুদি লেনদেনে লিপ্ত হওয়া অকাট্যভাবে হারাম।

আসল বিষয় এই যে, সুদের অর্থ নেক কাজে খরচ করার পরামর্শ বা নির্দেশ তখনই দেওয়া হবে যখন কোনো মানুষ ভুলক্রমে বা শরয়ি বিধান না জানার কারণে শরিয়ত পরিপন্থি কোনো লেনদেন করে ফেলে; ফলে তার সুদের অর্থ অর্জিত হয়ে যায়! অথবা এমন ব্যক্তিকে এই পরামর্শ দেওয়া হবে যে এখনো ব্যাবসা সংক্রান্ত বিষয়ে ও আর্থিক লেনদেনে শরয়ি বিধানের তোয়াক্কা করেনি, ফলে তার কাছে সুদের টাকা জমা হয়েছে। এখন সে এর থেকে তাওবা করতে চাচ্ছে এবং সুদের টাকা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাচ্ছে। এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, আপনি সওয়াবের নিয়ত ছাড়া এই সুদের অর্থ কোনো নেককাজে খরচ করুন। কিন্তু যে ব্যক্তি শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চলে সে যদি সুদি ব্যাংকে এ উদ্দেশ্যে টাকা রাখে যে, এই টাকা থেকে যে সুদ আসবে তা নেক কাজে খরচ করে দেবে, তাহলে বিষয়টি এমন হলো যেমন কোনো ব্যক্তি এই নিয়তে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে যে, পরবর্তীকালে তাওবা করে নেবে। অথচ একজন মুসলিমের ওপর ওয়াজিব হলো এমন কোনো গুনাহে লিপ্ত না হওয়া যার দরুন পরবর্তীকালে তাকে তাওবা করতে হয়।

উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে অমুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম মালিকানাধীন ব্যাংকের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেন, ঐসব ব্যাংকে টাকা রাখা এবং ব্যাংক কর্তৃক যে মুনাফা দেওয়া হয়, তা গ্রহণ করা জায়েজ আছে। এই অভিমতের ভিত্তি হলো ইমাম আবু হানিফা র.-এর এই মূলনীতি—

يجوز أخذ مال الحربي برضاه," অর্থাৎ, হারবি কাফেরদের সম্পদ তাদের সম্মতিতে গ্রহণ করা জায়েজ। আর একটি মূলনীতি হলো যে, হারবি ও মুসলিমের মাঝে কোনো সুদ হয় না।

তবে অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদ কতিপয় আলেমের এই অভিমত গ্রহণ করেননি। এমনকি হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিন ওলামায়ে কেরামও সে অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া দেননি। কারণ, সুদ হারাম হয়েছে কুরআন-হাদিসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা। আর যারা সুদের লেনদেন বর্জন না করবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। তাই সাধারণ অবস্থায় কোনো মুসলিমের জন্য উচিত নয় যে, সে সুদের লেনদেনে জড়িত থাকবে। যদিও সেই লেনদেন কোনো হারবি কাফেরের সঙ্গে হোক।

তবে এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, আজকাল বহু মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আর অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর টার্গেট হলো মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পদ আত্মসাৎ করা অথবা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে যে ঋণ নিয়েছে সেই ঋণের বিনিময়ে সুদের বোঝা চাপিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠন করা। অপরদিকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যে বিপুল অর্থ তাদের ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছে, সেগুলোর ওপরও তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। শুধু তাই নয়, এই অর্থ তারা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ করছে! এমনকি তারা সেই অর্থ মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নীল-নকশা ও যুদ্ধের প্লান-প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার জন্যও ব্যয় করে থাকে। সুতরাং মুসলিমরা যদি নিজ অর্থের বিনিময়ে অর্জিত সুদ গ্রহণ না করে, তাহলে এর মাধ্যমে কাফেরের শক্তি বৃদ্ধি হয়; যা এক প্রকার সাহায্যের নামান্তর। তাই এই পরিস্থিতিতে আমার অভিমত এদিকে ঝুঁকে গেছে যে, মুসলিমদের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিমদের ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ গ্রহণ করা জায়েজ। তবে এই অর্থ নিজের প্রয়োজনে খরচ করা আদৌ ঠিক হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে উচিত হলো সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কোনো নেক কাজে খরচ করে দেওয়া। এর মাধ্যমে মুসলিমরা নিজেদের অর্থ অমুসলিমদের ব্যাংকে রাখার কারণে যতটুকু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

সুতরাং এ মাসআলাটি আলেমগণের সামনে পেশ করা হলো, যাতে তারা এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন।

গ. সুদি ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখা

সুদি ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখার ব্যাপারে পেছনে আলোচনা গিয়েছে যে, এ একাউন্টে টাকা জমাকারীকে ব্যাংক কোনো মুনাফা বা সুদ দেয় না। সুতরাং এই একাউন্টে টাকা রাখার মাধ্যমে সুদভিত্তিক ঋণের চুক্তিতে শরিক হওয়া আবশ্যক হয় না। এ হিসেবে 'কারেন্ট একাউন্টে' টাকা রাখা জায়েজ হওয়া উচিত। তবে সমকালীন কোনো কোনো আলেম এ বিষয়ে আপত্তি করেছেন যে, যদিও তাতে সুদভিত্তিক ঋণের চুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও সুদি লেনদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সহযোগিতা করা হচ্ছে। আর এ কথাও স্পষ্ট যে, ব্যাংক এই একাউন্টের টাকা সুদি কারবারে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং ব্যাংকে টাকা জমাকারী ব্যক্তি ব্যাংকের সুদি লেনদেনে সহযোগিত করল।

তবে উল্লিখিত আপত্তি নিচে বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব—

১. ব্যাংকের সাধারণ নিয়ম হলো, 'কারেন্ট একাউন্টে' জমাকৃত সমুদয় অর্থ ব্যাংক খরচ করে না। বরং ব্যাংক এই অর্থের বিশাল একটি অংশ এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ রেখে দেয়, যাতে দৈনন্দিন টাকা উত্তোলনকারীদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। তাই কোনো একাউন্ট-হোল্ডার এ কথা নিশ্চিত করে বলতে পারবে না, এই টাকা সুদি লেনদেনে বিনিয়োগ হয়েছে।

২. ব্যাংকে বিনিয়োগের অনেক খাত রয়েছে। সব খাতই যে শরিয়ত নিষিদ্ধ তা নয়। বরং এমন অনেক খাত রয়েছে যেগুলোতে বিনিয়োগ করা হারাম নয়। তাই কোনো একাউন্ট-হোল্ডার এ কথা নিশ্চিত করে বলতে পারবে না যে, এই টাকা এমন খাতে ব্যবহার হয়েছে যা শরয়ি দৃষ্টিকোণে হালাল নয়।

৩. সুদবিহীন লেনদেন শরিয়ত জায়েজ রেখেছে। আর মুদ্রার হুকুম হলো, এগুলো কোনো বৈধ চুক্তিতে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। 'কারেন্ট একাউন্টে' যে অর্থ রাখা হয়, তা ব্যাংককে ঋণ হিসেবে দেওয়ার মাধ্যমে সে টাকা ব্যক্তির মালিকানা থেকে বের হয়ে ব্যাংকের মালিকানায় চলে যায়। এখন ব্যাংক এই টাকার মাঝে যে হস্তক্ষেপ

করে তা মূলত একাউন্ট-হোল্ডারের মালিকানায় হস্তক্ষেপ নয় বরং এই হস্তক্ষেপ হবে ব্যাংকের নিজস্ব মালিকানায়। তাই এই হস্তক্ষেপকে একাউন্ট-হোল্ডারের দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

৪. কোনো গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা যদিও হারাম; কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে কিছু নীতিমালা বর্ণনা করেছেন, যা আলোচনার স্থান এখানে নয়।[৩]

আমার সম্মানিত পিতা মাওলানা মুফতি শফি রহ. এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সহযোগিতা বিষয়ে ফিকহশাস্ত্রের যত বর্ণনা রয়েছে সবগুলো তিনি এই পুস্তিকায় একত্রিত করেছেন। এ পুস্তিকা আহকামুল কুরআন আরবি গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই পুস্তকের শেষাংশে এ মাসআলার সারমর্ম এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

ان الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعني قوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله تعالى : فلن أكون ظهيرا للمجرمين . ولكن الإعانة حقيقة هى ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق الا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها فى استعمال هذا الشئ بحيث لا يحتمل غير المعصية وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة بل من التسبب ومن اطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز لكونه صورة اعانة كما مر من "السير الكبير."

ثم السبب إن كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى : لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وقوله تعالى : فلا تخضعن بالقول، وقوله تعالى : لاتبرجن الآية . وإن لم يكن محركا وداعيا بل موصلا محضا وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج فى إقامة المعصية به إلى إحداث صنعه من الفاعل كبيع السلاح من اهل الفتنة وبيع العصير ممن

[৩] প্রয়োজন মনে করলে দেখুন, দুররুল মুখতার সংযুক্ত রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৭২, তাকমিলায়ে ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১২৭, শরহুল মুহাজ্জাব, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৯১, নিহায়াতুল মোহতাজ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৫৪, হাওয়াশি শিরওয়ানি আলা তুহফাতুল মোহতাজ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১৭, আল ফুরুক লিল কারাফি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩, নাইলুল আওতার লিশ শাওকানি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৫৪।

يتخذ خمرا وبيع الأمرد ممن يعصي به واجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنسية أو بيت نار وأمثالها فكله مكروه تحريما بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان فإنه إن لم يعلم كان معذورا وإن علم وصرح كان داخلا فى الإعانة المحرمة.

وإن كان سببا بعيدا بحيث لا يفضى إلى المعصية على حالته الموجودة بل يحتاج إلى إحداث صنـ (احكام القرأن- /)

'গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআনের আলোকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) তোমরা গুনা ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করো না। সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩. অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে : (فلن أكون ظهيرا للمجرمين) আমি কখনো অপরাধীদের সহযোগী হবো না।[৪] তবে প্রকৃত অর্থে 'সহযোগিতা' বলা হয়, সাহায্যকারীর নিজ কর্মের মাধ্যমে গুনাহটি সংঘটিত হওয়া। আর এটি তখনই সম্ভব যখন সাহায্যকারী সাহায্য করার নিয়ত করবে অথবা স্পষ্টভাবে সাহায্য করার ঘোষণা করবে কিংবা ওই জিনিসের ব্যবহার গুনাহের কাজের জন্য এমনভাবে নির্দিষ্ট হওয়া যে, গুনাহের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনাই থাকে না। তবে গুনাহটি যদি সাহায্যকারীর নিজ কর্মের মাধ্যমে না হয়, তাহলে প্রকৃত অর্থে তাকে সাহায্য বলা হবে না, বরং তাকে গুনাহের সবব বা কারণ বলা হবে। আর যে সকল ওলামায়ে কেরাম এ থেকে 'সাহায্যের' অর্থ নিয়েছেন তারা মূলত রূপক অর্থে সাহায্যের অর্থ নিয়েছেন। কারণ, তা দেখতে সাহায্যের মতো তবে বাস্তবে সাহায্য নয়। যেমনটি 'আস-সিয়ারুল কাবির' গ্রন্থের সূত্রে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর 'কারণ' দেখা হবে, যদি ওই কারণটি গুনাহের প্রতি উৎসাহদাতা ও আহ্বানকারী হয়। তাহলে এমন 'কারণ' হওয়াও হারাম; যেমন গুনাহের কাজে সাহায্য করা হরাম। এটি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, (لاتسبوا الذين يدعون من دون الله) যারা আল্লাহ

[৪] সুরা কাসাস, আয়াত : ১৭।

ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করে তাদেরকে গালি দিয়ো না।[৫]কারণ, তারা পরবর্তীকালে অজ্ঞতাবশত সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর শানে বেয়াদবি করবে। অন্য জায়গায় ইরশাদ হয়েছে, (فلا تخضعن بالقول) তোমরা পর পুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। সুরা আহজাব, আয়াত : ৩২) অন্য আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, (ولا تبرجن) অর্থাৎ, তোমরা জাহেলি যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না।[৬]

আর 'কারণটি' যদি গুনাহের জন্য উৎসাহদাতা ও আহ্বানকারী না হয়, বরং শুধু গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে কারণটি যদি ওই গুনাহের জন্য এই হিসাবে নিকটবর্তী হয় যে, এর মাধ্যমে গুনাহ এর কাজে জড়িত হওয়ার জন্য জড়িত ব্যক্তিকে কোনো পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। যেমন : নাশকতা সৃষ্টিকারীদের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা, মদ প্রস্তুতকারীদের কাছে আঙুরের রস বিক্রয় করা, দাড়িবিহীন গোলামকে এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা যে তার মাধ্যমে মন্দ কাজ করাবে অথবা এমন ব্যক্তির কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া যে তাতে মদের ব্যাবসা করবে বা গির্জা বানাবে অথবা অগ্নিপূজারিদের ইবাদতখানা বানাবে। এ সকল অবস্থায় এ জাতীয় নিষিদ্ধ জিনিস কেনাবেচা করা এবং ভাড়া দেওয়া মাকরুহে তাহরিমি। তবে এই মাকরুহে তাহরিমির হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন বিক্রেতা বা ভাড়া দাতা, ক্রেতা বা ভাড়াগ্রহীতার স্পষ্ট মুখের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোনোভাবে এ কথা জানা যায়। আর যদি বিক্রেতা বা ভাড়াদাতা এ বিষয়ে না জানে, তাহলে তাকে এ ক্ষেত্রে অপারগ মনে করা হবে। তবে যদি বিক্রেতা ও ভাড়াদাতা পরিষ্কারভাবে এ কথা জানা সত্ত্বেও বিক্রয় করে বা ভাড়া দেয়, তাহলে বিক্রেতা বা ভাড়াদাতা হারাম কাজে সহযোগী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি ওই কারণটি নিকটবর্তী না হয়ে দূরবর্তী হয় অর্থাৎ, বর্তমান সময়ে এর থেকে কিছু পরিবর্তন করতে হয়; যেমন নাশকতাকারীর হাতে লোহা বিক্রয় করা ইত্যাদি। এ অবস্থায় তার হুকুম হলো 'মাকরুহে তানজিহি'।[৭]

---

[৫] সুরা আনয়াম, আয়াত : ১০৮।

[৬] সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৩।

[৭] জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫৩, আহকামুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭৪।

আমার সম্মানিত পিতা মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. তাঁর একটি উর্দু প্রবন্ধে এই মাসআলাটি আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম নিচে তুলে ধরা হলো—

'সবব' বা 'কারণ'-এর অর্থকে যদি সাধারণভাবে ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার কোনো কাজই আর জায়েজ থাকবে না। যেমন জমি থেকে শস্য ও ফলমূল উৎপাদনকারীও এর 'কারণ' হবে। যেহেতু এই শস্য এবং ফলমূলও আল্লাহর দুশমনের উপকারে এসেছে। তেমনিভাবে কাপড় বানানো, ঘর তৈরি করা, ব্যবহৃত জিনিস বানানো। এ সবগুলোর মাঝে এ কথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ভালো-মন্দ লোক এগুলো কিনে ও ব্যবহার করে এবং নিজের অসৎকাজেও এগুলো ব্যবহার করে। আর এসব কিছুর 'কারণ' এগুলোর প্রস্তুতকারী। এভাবে যদি হারাম হওয়াটাকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়াতে কোনো কাজই জায়েজ থাকবে না! তাই করণীয় হলো, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী 'কারণের' মাঝে পার্থক্য করা। দূরবর্তী কারণটির মধ্যে আর কোনো সমস্যা নেই।

নিকটবর্তী কারণ দুই প্রকার

১. এমন কারণ যা গুনাহের প্রতি উৎসাহদাতা ও আহ্বানকারী হয়, যা ছাড়া বাহ্যত গুনাহটি সংঘটিত হওয়ার অন্য কোনো কারণ পাওয়া যায় না। এমন 'কারণে' লিপ্ত হওয়া মানে গুনাহেই লিপ্ত হওয়া। আল্লামা শাতিবি রহ. মুওয়াফাকাত নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ভূমিকায় এমন 'কারণ' সম্পর্কে বলেন, ايقاع السبب ايقاع للمسبب অর্থাৎ, 'কারণে' লিপ্ত হওয়া মানে স্বয়ং কাজে লিপ্ত হওয়া। কেননা গুনাহের এমন 'কারণে' লিপ্ত হওয়া যেনো গুনাহে লিপ্ত হওয়া।

এ জন্য গুনাহের সম্বন্ধ ওই ব্যক্তির দিকে করা হয়, যে ব্যক্তি ওই 'কারণের' সঙ্গে জড়িত। কোনো স্বাধীন ব্যক্তি এ জাতীয় 'কারণে' লিপ্ত হলে তার থেকে গুনাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হবে না। হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দেয়; সে যেন নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। কুরআন হাদিসের ভাষায় এমন গুনাহের 'কারণ' হওয়াকে স্বয়ং গুনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২. নিকটবর্তী কারণের দ্বিতীয় প্রকার হলো, সেই কারণটি যদিও নিকটবর্তী; কিন্তু গুনাহের প্রতি উৎসাহদাতা বা আহ্বানকারী নয়। বরং গুনাহ সংঘটিত হয়েছে অন্য একজন স্বাধীন ব্যক্তির কর্মের মাধ্যমে। যেমন : এমন ব্যক্তির কাছে আঙুরের রস বিক্রয় করা, যে ব্যক্তি এর মাধ্যমে মদ তৈরি করবে। অথবা এমন ব্যক্তির কাছে বাড়ি ভাড়া দেওয়া, যে সেখানে মূর্তি পূজা করবে। এই বিক্রয় ও বাড়ি ভাড়া যদিও একদিক দিয়ে গুনাহের নিকটবর্তী 'কারণ', তা সত্ত্বেও খোদ এ কাজটি গুনাহের প্রতি উৎসাহদাতা বা আহ্বানকারী নয়।

এ জাতীয় নিকটবর্তী 'কারণ'-এর হুকুম হলো, যদি মালিকের এই বিক্রয় ও বাড়ি ভাড়া দিয়ে গুনাহের সহযোগিতা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর হবে এবং অকাট্য হারাম বলে গণ্য হবে। আর যদি বিক্রেতা ও ঘর ভাড়া দাতার এমন উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে তার দুই অবস্থা—

ক. বিক্রেতা যদি না জানে যে, ক্রেতা এর মাধ্যমে সিরকা তৈরি করবে, নাকি মদ তৈরি করবে, তাহলে তা বিক্রয় করা জায়েজ।

খ. আর যদি বিক্রেতা এ ব্যাপারে জানতে পারে যে, ক্রেতা এর দ্বারা মদ তৈরি করবে, তাহলে তা বিক্রয় করা মাকরুহ।

এই মাকরুহ দুই প্রকার

১. ক্রেতা যদি সেই পণ্যের মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া হুবহু সেই পণ্যটি গুনাহের কাজে ব্যবহার করে, তাহলে ওই পণ্যের বিক্রয় মাকরুহে তাহরিমি হবে।

১. যদি ওই পণ্যের মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন করে গুনাহের কাজে ব্যবহার করে, তাহলে তা হবে মাকরুহে তানজিহি।[৮]

সুতরাং উপরে উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে ব্যাংকে রাখা টাকার ব্যাপারে যদি চিন্তা-ফিকির করা হয়, তাহলে বুঝা যাবে কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখা সুদের লেনদেনে এমন উৎসাহদানকারী বা আহ্বানকারী কারণ নয় যে, যদি এই ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা না রাখে, তাহলে ব্যাংক সুদের লেনদেনে লিপ্ত হবে না। সুতরাং এমন ব্যক্তি নিকটবর্তী কারণের দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[৮] জাওয়াহিরুল ফিকহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬০-৪৬২।

সাধারণভাবে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য নেয় না যে, সে সুদের লেনদেনে ব্যাংককে সহযোগিতা করবে, বরং ব্যাংককে টাকা রাখার দ্বারা মানুষের উদ্দেশ্য থাকে, নিজের সম্পদের হেফাজত করা। তাছাড়া ব্যাংকে টাকা জমাকারী নিশ্চিতভাবে এ কথা জানে না যে, তার টাকা সুদি কারবারে লাগানো হবে। এতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তারা টাকা ব্যাংকে জমা করে রাখবে অথবা বৈধ কোনো খাতে খাটাবে। তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যাংক তার টাকা সুদি কারবারে লাগাবে, তাহলেও কারেন্সির মূলনীতি হলো, এ সকল ক্যাশ চুক্তির ক্ষেত্রে বিনিময় নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয় না। তাই সুদি লেনদেনগুলোকে কারেন্ট একাউন্টে জমা করা টাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে না বরং সেসব সম্পত্তির দিকে সম্পৃক্ত করা হবে যা বর্তমানে ব্যাংকের মালিকানায় আছে। বড়োজোর এ কথা বলা যেতে পারে—কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখা মাকরুহে তানজিহি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আজকাল অনেক বৈধ লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে। আর এই লেনদেনগুলো পূর্ণ করার জন্য কোনো না কোনো ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে বাধ্য। যেহেতু ব্যাংকে একাউন্ট খোলার প্রয়োজনীয়তা একেবারেই স্পষ্ট, সেই ভিত্তিতে ব্যাংকে কারেন্ট একাউন্ট খোলা মাকরুহে তানজিহিও হবে না ইনশাআল্লাহ।

ইসলামি ব্যাংকে টাকা রাখার শরয়ি বিধান

ইসলামি ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখা ও অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখার বিধান একই। এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। মূলত এই টাকা ব্যাংকের দায়িত্বে মালিকদের পক্ষ থেকে ঋণ হিসেবে থাকে। ব্যাংক এই টাকার জামিন হয় এবং তার ওপর ঋণের যাবতীয় বিধান প্রয়োগ হয়। তবে ইসলামি ব্যাংকের 'ফিক্সড ডিপোজিট' এবং 'সেভিং একাউন্টে' যে টাকা রাখা হয় তার বিধান সাধারণ ব্যাংকের 'ফিক্সড ডিপোজিট' ও 'সেভিং একাউন্টে' রাখা টাকার চেয়ে ভিন্ন। যদিও সাধারণ ব্যাংকের ওই একাউন্টে জমাকৃত অর্থ ঋণ হিসেবে থাকে। যা সুদি মুনাফার ভিত্তিতে ব্যাংকে জমা রাখা হয়। তবে ইসলামি ব্যাংক সুদি মুনাফার ভিত্তিতে কাজ করে না। বরং ইসলামি ব্যাংক ওই অর্থকে তার মালিকদের থেকে অংশীদার হওয়ার ভিত্তিতে নিয়ে থাকে। যদি মুনাফা হয়ে থাকে, তাহলে সে ব্যাংকের সঙ্গে মুনাফার মাঝে অংশীদার হবে। সুতরাং এই জমাকৃত অর্থ ইসলামি ব্যাংকে ঋণ হিসেবে থাকে না। বরং 'মুদারাবা চুক্তির'

মূলধন হয়ে থাকে এবং জমাকারী ব্যাংকের মুনাফায় একটি উপযুক্ত অংশের হকদার হয়। আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতিতেও অংশীদার হয়। আর ওই সময় ব্যাংক সেই টাকার জামিন হবে না। সুতরাং ব্যাংক না মূলধনের জামিন, না মুনাফার জামিন। অবশ্য লোকসানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষ থেকে যদি কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি কিংবা সীমালঙ্ঘন পাওয়া যায়, তাহলে ব্যাংক সেই বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেবে। আমার দৃষ্টিতে আমানত-স্বরূপ যারা ব্যাংকে টাকা রাখে অর্থাৎ, ডিপোজিটর, তারা এবং যারা ব্যাংকের কারবারে অংশীদার অর্থাৎ, ডাইরেক্টর, স্পন্সর এবং শেয়ার হোল্ডার এদের অবস্থার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, ব্যাংক ও ডিপোজিটরদের মাঝে 'মুদারাবা চুক্তি' হয়। আর অংশীদারদের মাঝে 'অংশীদারিত্বের চুক্তি' হয়। এ কারণেই অংশীদারগণ ব্যাংকের সাধারণ মিটিংয়ে নিজেদের মন্তব্য পেশ করার অধিকার রাখেন। বিষয়টি এমন হলো যেন অংশীদারগণ নিজেদের সম্পদ এবং নিজেদের কর্ম উভয়টাকে ব্যাংকের কাছে অর্পণ করে দিয়েছে। আর অংশীদারদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তবে ডিপোজিটরদের এই অধিকার নেই যে, তারা ব্যাংকের সাধারণ মিটিংয়ে নিজেদের মন্তব্য পেশ করতে পারবে। এমনকি ব্যাংকের অন্যান্য কাজগুলো যথাযথভাবে করার ক্ষেত্রেও তাদের কোনো অধিকার নেই। বরং তারা শুধু নিজেদের টাকা ব্যাংকে রাখবে। ঠিক এমন অবস্থাই 'মুদারাবা' চুক্তিতে মূল পুঁজিদাতার। (এ ক্ষেত্রেও পুঁজিদাতার কোনো হস্তক্ষেপ চলে না।)

এরপর কথা হলো, ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারগণ সকল ডিপোজিটরদের জন্য তাদের মূলধন অনুপাতে 'মুদারিব'-স্বরূপ। সুতরাং অংশীদারদের পরস্পরের সম্পর্ক 'শরিকানার' ভিত্তিতে, আর ডিপোজিটরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 'মুদারাবার' ভিত্তিতে। ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে এ দুই ধরনের সম্পর্ক অপরিচিত নয়। যেমন : ফিকহশাস্ত্রবিদগণ লিখেছেন, যদি মুদারিব মুদারাবার মালের সঙ্গে নিজের মাল মিলিয়ে ফেলে, তাহলে এটি জায়েজ। এ অবস্থায় সে অর্ধেক মালের মাঝে মুদারিব আর বাকি অর্ধেকের মাঝে 'মালিক' বলে বিবেচিত হবে।[৯]

[৯] মাবসুত-সারাখসি, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ১৩৩।

১. ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের জামিন

আগের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, প্রচলিত ব্যাংকে যে টাকা রাখা হয়, তা ব্যাংকের জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকে। চাই সে টাকা 'ফিক্সড ডিপোজিটে' রাখা হোক কিংবা 'কারেন্ট একাউন্টে' রাখা হোক বা 'সেভিংস একাউন্টে' রাখা হোক। এ সকল টাকাই ব্যাংকের জিম্মায় থাকে। ডিপোজিটরদেরকে সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া ব্যাংকের দায়িত্বে ঋণ থাকে—চাই ব্যাংক কারবারে লাভবান হোক বা ক্ষতিগ্রস্ত হোক। কারণ 'ঋণ' সর্ববস্থায় ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে অর্পিত থাকে। এমনিভাবে ইসলামি ব্যাংকের 'কারেন্ট একাউন্টে' গচ্ছিত টাকাও ঋণ হিসেবে থাকে এবং ব্যাংক তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।

এখন একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এ সকল ঋণের দায়িত্ব কি শুধু ব্যাংকের শরিকদের ওপর বর্তাবে, নাকি ব্যাংকের ডিপোজিটর ও শরিক উভয়ের ওপর বর্তাবে?

এর জবাব হলো, এর দায়-দায়িত্ব শুধু শরিকদের ওপর বর্তাবে, ডিপোজিটরদের ওপর বর্তাবে না। কারণ ঋণগ্রহীতা হলো ব্যাংক, আর শরিকরা হলো ব্যাংকের মালিক। যখন সকল ডিপোজিটর অর্থাৎ, কারেন্ট একাউন্টে টাকা জমাকারী ব্যাংককে ঋণ প্রদানকারী আর এক ঋণ প্রদানকারী অন্য ঋণ প্রদানকারীর ঋণের জামিন হতে পারে না। এমনিভাবে প্রচলিত ব্যাংকের 'ফিক্সড ডিপোজিট' এবং সেভিং একাউন্টে' টাকা জমাকারীরা ব্যাংককে ঋণ প্রদানকারী হয়, আর ব্যাংক তাদের থেকে ঋণ গ্রহণকারী হয়।

যেসব লোক ইসলামি ব্যাংকের 'মুদারাবা একাউন্টে' টাকা জমা রাখে তাদের ব্যাপারে আমরা পেছনে উল্লেখ করে এসেছি যে, এই সব মানুষ 'মুদারাবা চুক্তির' মূলধনদাতা অর্থাৎ, পুঁজিদাতা। আর ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডাররা নিজের অংশের বিবেচনায় অংশীদার আর আমানত জমাকারীদের অংশের 'মুদারিব'।

সুতরাং ব্যাংকের মূলধন শেয়ার হোল্ডার ও ডিপোজিটরদের সমন্বয়ে সঞ্চিত। তাই প্রত্যেকে নিজের অংশ অনুপাতে লাভ ও লোকসানে শরিক হবে। তবে 'কারেন্ট একাউন্টে' জমাকৃত টাকা যেহেতু ব্যাংকের জিম্মায় ঋণ এবং ব্যাংক তার সমস্ত কাজে এই অর্থ ব্যবহার করতে পারবে আর এর থেকে অর্জিত লাভও অংশীদার ও আমানতদারদের কাছে পৌঁছে যায়, তাই যেই ঋণ থেকে অংশীদার ও আমানতদার উভয়ে লাভ গ্রহণ করে, সেই ঋণের জামিনও উভয় পক্ষ হবে। এ ব্যাপারে আল্লামা কাসানি রহ. বলেন—

ولو استقرض (اى الشريك) مالا لزمهما جميعا لأنه تملك مال بالعقد فكان كالصرف فيثبت فى حقه وحق شريكه.

'যদি দুই অংশীদারের মধ্যে একজন কারও থেকে ঋণ নেয়, তাহলে ওই ঋণ উভয়ের ওপর আবশ্যক হবে। কারণ, এই কাজটি চুক্তির মাধ্যমে মালের মালিক হওয়ার মতো। ফলে এটি যেন بيع صرف -এর মতো হয়ে গেলো। তাই এই মাল ঋণ-গ্রহণকারী ও তার অংশীদার উভয়ের জিম্মায় বর্তাবে।'

এ লেনদেনটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি الخراج بالضمان বা রিস্ক অনুযায়ী লাভ অর্জিত হবে এবং الغنم بالغرم বা লাভ লোকসানের ঝুকি অনুপাতে হবে-এর ওপর ভিত্তি করে। এ বিষয়টি অন্য শব্দে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, ব্যাংক 'কারেন্ট একাউন্টে'র দিক থেকে ঋণ গ্রহণকারী। আর নিজের অংশীদার এবং ডিপোজিটর অর্থাৎ, ফিক্সড ডিপোজিট এবং সেভিংস একাউন্টে টাকা জমাকারীদের সঙ্গে মিলে কাজ করে। তাই উভয় গ্রুপ ব্যাংকের সঙ্গে সকল কারবারে অংশীদার। আর যে কারবারে এই দু-গ্রুপই শরিক হয়, তা পূর্ণ করার জন্য কারেন্ট একাউন্টের টাকাগুলো ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়। এ জন্য এই ঋণের জামিনও এ দু-গ্রুপ হবে। সুতরাং কারেন্ট একাউন্টে টাকা জমাকারী যখন টাকা ফিরিয়ে নিতে চায় তখন প্রথমে তার চাহিদা পূরণ করতে হবে। তারপর অংশীদারগণ এবং মুদারাবা একাউন্টে টাকা জমাকারীদের মাঝে মুনাফা বণ্টন করা হবে। এ জন্যই যদি কোনো সময় ব্যাংকের কার্যক্রম শেষ করতে হয়, তাহলে সর্বপ্রথম কারেন্ট একাউন্টে জমাকারীর টাকা ফিরিয়ে দিয়ে তার ঋণ আদায় করবে। কারণ হলো, তার টাকাগুলো ব্যাংকে ঋণ হিসেবে রাখা হয়েছিলো আর ব্যাংকের অংশীদার ও মুদারাবা একাউন্টে টাকা জমাকারীগণ নিজের মূলধনের মুনাফা তখনই পাবে যখন 'কারেন্ট একাউন্টের' ঋণ পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হবে। কেননা তারা উভয়ে এই টাকার ঋণ গ্রহণকারী।

অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এক ব্যক্তি 'মুদারাবা একাউন্টে' সবেমাত্র প্রবেশ করেছে। অথচ ইতোপূর্বে অনেক মানুষ 'কারেন্ট একাউন্টে' ঋণ হিসেবে নিজেদের টাকা জমা রেখেছে। তাহলে এই ব্যক্তি কীভাবে সেসব ঋণের জামিন হবে যে ঋণ ব্যাংক এমন সময় নিয়েছিলো, যখন এই ব্যক্তি ব্যাংকের সঙ্গে কোনো প্রকার লেনদেনে শরিকই হয়নি?

এই প্রশ্নের জবাব হলো, যে ব্যক্তি কোনো চলমান ব্যাবসায় অংশীদার হিসেবে প্রবেশ করে সে ওই ব্যাবসার সকল ঋণ ও মুনাফায় শরিক হয়। চাই ওই ঋণ তার ব্যাবসায় অংশগ্রহণের আগেই হোক না কেন। সুতরাং 'মুদারাবা একাউন্টে' টাকা জমাকারী অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ব্যাংকের কারবারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; এখন তাকে ব্যাংকের সঙ্গে সকল ঋণের জামিন হতে হবে।

২. কারেন্ট একাউন্ট-এর মাধ্যমে বন্ধক কিংবা ক্ষতিপূরণের কাজ নেওয়া

ইসলামি ফিকহ একাডেমির পক্ষ থেকে 'কারেন্ট একাউন্ট'-এর মাধ্যমে বন্ধক-চুক্তি সম্পাদনের মাসআলাও পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, 'কারেন্ট একাউন্ট'-এর হোল্ডারের জন্য কি এটি জায়েজ আছে যে, সে যেসব টাকা 'কারেন্ট একাউন্টে' জমা রেখেছে সেই টাকাগুলো এমন কোনো ঋণের পরিবর্তে বন্ধক হিসেবে রেখে দেবে যে ঋণ কোনো না কোনোভাবে তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়েছে?

এর জবাব হলো, অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের কাছে 'বন্ধক' শুধু ওই জিনিসই হতে পারে, যা কোনো মূল্যমান জিনিস হবে এবং তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।[১০]

অতএব ঋণ বন্ধক হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে ঋণ বিক্রয় করা জায়েজ নেই। আর আমরা পেছনে আলোচনা করে এসেছি যে, 'কারেন্ট একাউন্টে' জমাকৃত টাকা ব্যাংকের জিম্মায় ঋণ। তাই অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের অভিমত অনুযায়ী ওই টাকাকে বন্ধক রাখা সঠিক হবে না। তবে মালিকি মাজহাবের ফকিহগণের মতে স্বয়ং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং ঋণমুক্ত ব্যক্তি উভয়ের কাছেই ঋণকে বন্ধক রাখা জায়েজ। কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছেই ঋণকে বন্ধক রাখার জন্য শর্ত হলো, যে ঋণ বন্ধক রাখা হয়েছে তা ফিরিয়ে নেওয়ার সময়সীমা ওই পাওনা ঋণের সময়সীমার পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক হতে হবে। আল্লামা আদাবি রহ. বলেন—

ويشترط فى صحة رهنه من الدين أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذى رهن به أو أبعد لا أقرب لأن بقاءه بعد محله

[১০] আল মুগনি লি ইবনু কুদামাহ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭৫।

كالسلف فصار فى البيع بيعا وسلفا الا أن يجعل بيد أمين إلى محل أجل الدين الذى رهن به.

'ঋণকে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখার জন্য শর্ত হলো, বন্ধক রাখা ঋণের সময়সীমা ওই ঋণের সময়সীমার পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে যেটার পক্ষ থেকে ওই ঋণ বন্ধক রাখা হয়েছে। ওই সময়সীমার আগে হতে পারবে না। এ জন্য যে, বন্ধকের সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ঋণ বন্ধকগ্রহীতার কাছে থেকে যাওয়া ঋণের নামান্তর এবং বিক্রয় চুক্তির মধ্যে ঋণ ও বিক্রয় উভয়টাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে (যা জায়েজ নয়)। অবশ্য যদি এটি সিদ্ধান্ত করে নেয় যে, বন্ধকের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর ওই ঋণ ঋণের সময়সীমা পর্যন্ত তৃতীয় কোনো আমানতদার ব্যক্তির কাছে রাখা হবে, তাহলে এই লেনদেন শুদ্ধ হয়ে যাবে।'[১১]

মোটকথা, উপরের আলোচনা ও পর্যালোচনার আলোকে 'কারেন্ট একাউন্ট'কে বন্ধক হিসেবে ব্যবহার করার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে—

ক. প্রথম পদ্ধতি হলো, ব্যাংকের এই ঋণ ওই ব্যক্তির জিম্মায় হবে যার 'কারেন্ট একাউন্ট' এই ব্যাংকের মাঝে বিদ্যমান। আর ওই ব্যক্তি ঋণকে আস্থাশীল করার জন্য নিজের 'কারেন্ট একাউন্ট' ব্যাংকের কাছে বন্ধক হিসেবে রাখবে। এই পদ্ধতি মালিকি মাজহাবের মতে জায়েজ। তবে শর্ত হলো, 'কারেন্ট একাউন্টের' সময়সীমাকে ঋণ আদায়ের সময়সীমা পর্যন্ত এমনভাবে বিলম্বিত করা হবে, যেন 'কারেন্ট একাউন্টের' মালিকের ঋণের সময়সীমার আগে নিজের একাউন্ট থেকে ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ থেকে বেশি টাকা উত্তোলন করার অধিকার না থাকে। তবে অধিকাংশ ফকিহের অভিমত অনুযায়ী 'কারেন্ট একাউন্টের' টাকাকে বন্ধক রাখা ঠিক নয়। এই জন্য যে, ওই টাকা ব্যাংকের জিম্মায় ঋণ। আর ঋণ এমন কোনো বস্তু নয়, যার বেচাকেনা শুদ্ধ আছে। (আর বন্ধকি জিনিসটি বেচাকেনাযোগ্য হওয়া আবশ্যক)

খ. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, ঋণদাতা ব্যাংক ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি হবে। এরপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের 'কারেন্ট একাউন্ট'কে ওই ঋণদাতার

[১১] হাশিয়া আদাবি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৩৬।

কাছে এভাবে রাখে যে, যখন ইচ্ছে তখনই একাউন্ট থেকে টাকা ওঠাতে পারে। এই পদ্ধতিটি মালিকি মাজহাবের মতে জায়েজ। যেমনটি ইতঃপূবে আলোচনা হয়েছে। তবে অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের কাছে যেহেতু ঋণকে বন্ধক রাখা জায়েজ নেই; তাই এই পদ্ধতিও তাদের কাছে সহিহ নয়। তবে এই পদ্ধতিটিকে حوالة এর ভিত্তিতে বৈধ করা সম্ভব। আর তা এভাবে যে, 'কারেন্ট একাউন্ট'ধারী ব্যক্তি নিজের ঋণদাতাকে ব্যাংকের কাছে এমনভাবে সোপর্দ করে দেবে যে, ঋণদাতা যখন ইচ্ছা করবে তখনই সে ব্যাংক থেকে নিজের ঋণ আদায় করে নেবে।

গ. তৃতীয় পদ্ধতি হলো, ঋণদাতা ব্যাংক ছাড়া অন্যকেউ হবে এবং ওই ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে এই আশা করবে যে, ঋণ আদায়ের সময়সীমা আসা পর্যন্ত ওই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যাংকে বিদ্যমান নিজের 'কারেন্ট একাউন্ট'কে গচ্ছিত করে দেবে। (তার থেকে কোনো টাকা ওঠাবে না) এই পদ্ধতিকে তৃতীয় পক্ষের হাতে বন্ধক রাখার মাসআলার ওপর ভিত্তি করা যেতে পারে।

এই তৃতীয় পক্ষকে ইসলামি আইনশাস্ত্রে আদল বলা হয়। আর এই আদলের হাতে যে বন্ধকিবস্তু থাকে সেটি তার কাছে আমানতের ভিত্তিতে রয়েছে বলে বিবেচিত হয়। আদলের জন্য এই বন্ধকি বস্তুতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা নিজের মঙ্গলজনক কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েজ নেই। অথচ এ বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট যে, ব্যাংক 'কারেন্ট একাউন্টে' জমাকৃত সমুদয় টাকাকে নিজের হস্তক্ষেপে আনতে পারে। এ জন্য যে অর্থ 'কারেন্ট একাউন্টে' রাখা হয় তার ব্যাপারে ব্যাংককে আমিন (আমানতদার) বলা যায় না। তাই এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের হাতে বন্ধক রাখাকে ভিত্তি করা যায় না। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতা উভয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে (ব্যাংককে) জামিন হওয়ার শর্তে বন্ধকি বস্তুতে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে পরিষ্কার কোনো হুকুম ফিকহ শাস্ত্রের কোনো কিতাবে আমি পাইনি। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, এ পদ্ধতি জায়েজ।

মোটকথা এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যে ঋণ বন্ধক রাখা হয়েছে যদি তা আদায়ের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে যদি এই ঋণের মেয়াদ নির্দিষ্ট না হয়, যেমন ঋণ যা হানাফি এবং অন্যান্য ফকিহগণের কাছে সময়সীমা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না অর্থাৎ, যখন ইচ্ছে তখনই তা চাইতে পারে। তবে এই

অবস্থায় ওই একাউন্টকে 'হাওয়ালার' ভিত্তিতে স্থগিত করা যেতে পারে। যেমনটি পেছনে দ্বিতীয় পদ্ধতির বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে।

৩. সেভিংস একাউন্ট ও ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা বন্ধক হিসেবে রাখা

প্রচলিত ব্যাংকে সঞ্চয়ের যে টাকা রাখা হয়, তার হুকুম হুবহু ওই হুকুমের মতো, 'কারেন্ট একাউন্টে' জমাকৃত টাকার ব্যাপারে আমরা যে হুকুম ইতঃপূবে বর্ণনা করে এসেছি। কেননা এই টাকা ব্যাংকের কাছে ঋণস্বরূপ থাকে। যেমনটি 'কারেন্ট একাউন্টে' থাকে। তবে ইসলামি ব্যাংকে যে টাকা সঞ্চয়ের জন্য রাখা হয়, তা মূলত ব্যাংকের কাছে ঋণ হিসেবে রাখা হয় না। বরং তা ব্যাংকের মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে মূলধনের একটি যৌথ অংশে পরিণত হয়ে যায়। তাই যে সকল ফকিহ (رهن المشاع) 'যৌথ বস্তুর বন্ধককে জায়েজ বলে না, তাদের কাছে এই টাকাকে বন্ধক বানানো জায়েজ নেই। যেমন হানাফি ফকিহগণের কাছে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 'যৌথ বস্তুর বন্ধক' জায়েজ নেই।[১২]

তবে শাফিয়ি, মালিকি ও হাম্বালি মাজহাবে যৌথ বস্তু বন্ধক রাখা জায়েজ।[১৩]

সুতরাং এ সকল ফকিহের কাছে ইসলামি ব্যাংকের সঞ্চয়ী (সেভিংস) একাউন্টে জমাকৃত টাকাকে বন্ধক বানানো জায়েজ।

৪. ব্যাংক কর্তৃক কারও একাউন্ট স্থগিত করা

ইসলামি ফিক্হ একাডেমির আলোচনা পর্যালোচনার এক পর্যায়ে এ প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যে, যদি ব্যাংকে কারও 'কারেন্ট একাউন্ট' থাকে। আর সে ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করতে গিয়ে এক পর্যায়ে ব্যাংকের কাছে ঋণী হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার কারেন্ট একাউন্টের টাকা স্থগিত করতে পারবে কি না? অন্য কথায়, ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করতে গিয়ে যেসব পাওনা এখন তার ওপর ওয়াজিব হয়েছে, সেগুলো ব্যাংক তার কারেন্ট একাউন্ট থেকে ওঠাতে পারবে কি না?

---

[১২] রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৪৮।

[১৩] আল মুগনি লি ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭৫।

এই প্রশ্নের জবাব হলো, যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একাউন্ট-হোল্ডারের সম্মতিক্রমে তার একাউন্ট স্থগিত করে থাকে। এমতাবস্থায় এই একাউন্টের ওপর বন্ধকের সকল বিধান জারি হবে। যার আলোচনা আমরা ইতঃপূবে করেছি। এমনিভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি 'কারেন্ট একাউন্ট' থেকে তার সম্মতিতে পাওনা উসুল করে নেয়, তাহলে তার ওপর 'কাটাকাটি করে নেওয়া'-এর বিধান জারি হবে। তবে যদি একাউন্ট-হোল্ডারের অনুমতি ছাড়া ব্যাংক তার পাওনা একাউন্ট থেকে উসুল করে নিতে চায়, যেমন : কোনো একাউন্ট-হোল্ডারের জিম্মায় ঋণ রয়েছে এবং তা পরিশোধের তারিখ আসা সত্ত্বেও সে ঋণ পরিশোধ করেনি। এখন ব্যাংক চাচ্ছে তার যে একাউন্ট আছে তা থেকে পাওনা উসুল করে নিতে, তাহলে ব্যাংকের জন্য এমনটি করা বৈধ হবে কি না?

এখানে ওই মাসআলা প্রয়োগ হবে যা ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসিনে কেরামের কাছে مسئلة الظفر নামে প্রসিদ্ধ। এর সারসংক্ষেপ হলো, যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার মাল থেকে ঋণ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, তাহলে ঋণদাতার জন্য ঋণগ্রহীতার মাল থেকে ঋণ আদায় করে নেওয়া জায়েজ হবে কি?

এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যদি ঋণগ্রহীতা বৈধ কোনো কারণে ঋণ পরিশোধ না করে, যেমন ঋণ আদায়ের সময় এখনো হয়নি অথবা সে খুবই অভাবে রয়েছে, তাহলে এমন অবস্থায় ঋণদাতার জন্য তার সম্পদ থেকে ঋণ আদায় করা জায়েজ হবে না। এমনিভাবে ঋণগ্রহীতা যদি অন্যায়ভাবে ঋণ পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকে, তবে ঋণদাতা আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ঋণ উসুল করে নিতে সক্ষম হয় সে ক্ষেত্রেও ঋণগ্রহীতার মাল থেকে ঋণদাতা স্বয়ং নিজের পাওনা উসুল করে নেওয়া জায়েজ হবে না। এ বিষয়ে ফকিহগণের মাঝে কোনো মতপার্থক্য নেই। তবে ইমাম শাফিয়ি রহ. এক কারণে তা জায়েজ বলেন। তবে ঋণদাতা যদি আদালতের মাধ্যমে নিজের পাওনা উদ্ধার করতে সক্ষম না হয়, তাহলে এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতার সম্পদ থেকে ঋণ উসুল করা না করার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে যে মতভেদগুলো রয়েছে। নিচে সেই মতভেদ তুলে ধরা হলো—[১৪]

ক. ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার সম্পদ থেকে তার ঋণ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, তাহলে ঋণদাতা নিজের পাওনা তার থেকে

[১৪] বিস্তারিত জানার জন্য আল মুগনি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২৯৯।

উদ্ধার করে নিতে পারবে। চাই সেই সম্পদ ওই ঋণের প্রকার থেকে হোক অথবা ভিন্ন কোনো প্রকার থেকে হোক। ইমাম মালিক রহ.-এরও একটি অভিমত এমন।

খ. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হলো যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা থেকে স্বীয় ঋণ উসুল করতে সক্ষম হয়, তাহলেও ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার সম্পদ থেকে ঋণ উসুল না করা চাই। বরং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছেই চাইবে। ইমাম মালিক রহ.-এরও এমন একটি অভিমত রয়েছে।

গ. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সম্পদ অর্জনে সক্ষম হয়; এমতাবস্থায় দেখা হবে এই সম্পদ ঋণের প্রকারভুক্ত না ভিন্ন প্রকারের? যদি এই সম্পদ ঋণের প্রকার থেকে হয়, তাহলে এই সম্পদ থেকে ঋণ উসুল করে নেওয়া জায়েজ। যেমন : ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে দিরহাম অর্জনে সক্ষম হলো, তাহলে এমতাবস্থায় ওই দিরহাম থেকে ঋণদাতার জন্য স্বীয় ঋণ উসুল করে নেওয়া জায়েজ। তবে যদি সেই সম্পদ ভিন্ন প্রকারের হয়, তাহলে এমতাবস্থায় ঋণদাতার জন্য স্বীয় ঋণ ওই সম্পদ থেকে উসুল করে নেওয়া জায়েজ হবে না। যেমন : ঋণ ছিলো দিরহাম। আর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা থেকে দিনার অর্জনে সক্ষম হয়েছে, তাহলে ঋণদাতার জন্য এখন সেই দিনার থেকে নিজের ঋণ উসুল করে নেওয়া জায়েজ হবে না।

এটিই হলো হানাফি ফকিহগণের মূল মাজহাব। তবে হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিন ফকিহগণ এই মাসআলায় ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অভিমতের ওপর ফতোয়া দিতে গিয়ে বলেন, যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার সম্পদ অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে ঋণদাতার জন্য সেই সম্পদ থেকে নিজের ঋণ উসুল করে নেওয়া জায়েজ। চাই সেই সম্পদ ঋণের প্রকার থেকে হোক অথবা ভিন্ন প্রকার থেকে হোক। যেমন আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. শরহুল কুদুরি লিল আখসাব থেকে নকল করে বলেন—

إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان فى زمانهم لمطاوعتهم فى الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لاسيما فى ديارنا لمداومتهم العقوق.

‘ঋণদাতার জন্য ভিন্ন প্রকারের সম্পদ থেকে নিজের ঋণ উসুল করা

নাজায়েজ। এই হুকুম পূর্ববর্তী কালের ফকিহগণের যুগে ছিলো। যখন লোকেরা হক আদায়ে গড়িমসি করতো না। তবে এখন ফতোয়া হলো, ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার সম্পদ অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে সে নিজ ঋণ উসুল করে নিতে পারবে। চাই তা ঋণের প্রকার থেকে হোক বা ভিন্ন প্রকার থেকে হোক। বিশেষ করে আমাদের দেশে এমনটি করা জায়েজ। কারণ, আজকাল মানুষের মাঝে হক আদায়ে শত টালবাহানা বিদ্যমান।'[১৫]

ঘ. ইমাম মালিক রহ.-এর সূত্রে তিন ইমামের অভিমতের অনুরূপ তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। তার চতুর্থ ও প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, যদি সেই ঋণদাতা যে ঋণগ্রহীতার সম্পদ অর্জনে সক্ষম হয়েছে, সে ছাড়া অন্য কোনো পাওনাদার যদি না থাকে তাহলে ওই ঋণদাতার জন্য তার ঋণের পরিমাণ সম্পদ উসুল করে নেওয়া জায়েজ হবে। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অন্য কোনো পাওনাদার থাকে, তাহলে এই ঋণদাতার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদ থেকে স্বীয় ঋণ পরিমাণ সম্পদ উসুল করা জায়েজ নেই। কারণ, যদি এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দরিদ্র (দেউলিয়া) হয়ে যায়, তাহলে সব পাওনাদাররা তার সম্পদে সমান হকদার হবে।

অধিকাংশ ফকিহ এমন ঋণদাতাদের জন্যে সেই সম্পদ থেকে ঋণগ্রহীতার সম্পদ অর্জনে সক্ষম স্বীয় ঋণ উসুল করা জায়েজ হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের দলিল হলো, সুফিয়ান রা.-এর স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবার হাদিস। সেই হাদিসে বলা হয়েছে—

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ»،

'আয়শা রা. বলেন, আবু সুফিয়ান রা.-এর স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবা রা.

---

[১৫] রদ্দুল মুহতার-কিতাবুল হাজর, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০৫, কিতাবুল হুদুদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১৯, কিতাবুল হজরি ওয়াল ইবাহাহ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩০০।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান কৃপণ মানুষ, সে আমাদের এই পরিমাণ খরচ দেয় না, যা আমার ও আমার ছেলে-মেয়েদের জন্যে যথেষ্ট হয়। আমি যদি তার অজান্তে তার মাল থেকে খরচ করে ফেলি, তাহলে তাতে আমার কোনো গুনাহ হবে কি না? জবাবে বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি ইনসাফের সঙ্গে এই পরিমাণ সম্পদ নিয়ে নাও, যা তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়।'[১৬]

এই হাদিসের ভিত্তিতে হানাফি এবং শাফিয়ি মাজহাবের কাছে অগ্রগণ্য মতামত হলো, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের জন্যে ঋণগ্রহীতার 'কারেন্ট একাউন্ট' থেকে নিজের ঋণের পূর্ণ বা আংশিক পাওনা উসুল করে নেওয়া জায়েজ হবে।

উপরে উল্লিখিত বিষয়ে যে ফিকহি মতভেদ রয়েছে, তা দূর করার উপযুক্ত পন্থা হলো, ব্যাংক যখন কোনো ক্লাইন্টের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট (চুক্তি) করে তখন সেই এগ্রিমেন্টের মাঝে আরও একটি দিক বৃদ্ধি করবে এবং তাতে স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ থাকবে যে, যদি ক্লাইন্ট নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংকের পাওনা আদায়ে অক্ষম হয়, তাহলে ব্যাংক ক্লাইন্টের বিদ্যমান 'কারেন্ট একাউন্ট' থেকে নিজের হক উসুল করে নিতে পারবে। ক্লাইন্ট যখন এগ্রিমেন্টের এই অংশে দস্তখত করবে তখন এই দস্তখতই তার সন্তুষ্টির প্রমাণ হবে যে, ব্যাংক নিজ পাওনা এই কারেন্ট একাউন্ট বা সঞ্চয়ী একাউন্ট থেকে উসুল করে নেবে। এ অবস্থায় ওই মাসআলা (مسئلة الظفر) থেকে বের হয়ে যাবে এবং তার ওপর সম্মতিতে কর্তন-এর বিধান জারি হবে। সম্মতিতে কর্তনচুক্তি সকল ফকিহের কাছে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

৫. ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের অডিট-পদ্ধতি

আজকাল আমাদের ব্যাংকগুলোতে প্রথমে ডেবিট তথা খরচের খাত ও ক্রেডিট তথা জমার খাত বিষয়ে একটি ব্যালেন্স শিট তৈরি করা হয়। ক্রেডিটে ওইসব অর্থকে শামিল করা হয় যা ব্যাংকে বর্তমানে আছে অথবা সামনে ব্যাংকের অর্জিত হবে। যেমন : ওই পুঁজি যা ব্যাংক নিজের ক্লাইন্টকে দিয়েছে এবং ব্যাংক এ ব্যাপারে আশাবাদী যে, ওই পুঁজি সুদসহ ব্যাংকের কাছে ফিরে আসবে। আর

[১৬] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৭১৪, বুখারি : ৩৮২৫।

ডেবিটে ওইসব অর্থ শামিল করা হয়, যে অর্থ অন্যান্যরা ব্যাংক থেকে তলব করবে এবং সেই দাবি ব্যাংক পূরণ করতে বাধ্য। যেমন : প্রচলিত ব্যাংকসমূহের নীতি হলো, ব্যাংক যাবতীয় একাউন্টের সকল আমানত ডেবিটের খাতে লিখে রাখে। কারণ, 'কারেন্ট একাউন্ট' ও 'সেভিংস একাউন্টে' জমাকৃত অর্থ গ্রাহক যখনই তলব করবে ব্যাংক তখনই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। আর 'ফিক্সড ডিপোজিটে' জমাকৃত অর্থ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। আর ব্যাংক ক্লাইন্টকে যে পুঁজি প্রদান করে, সেটিকে ক্রেডিটের তালিকায় লেখা হয়। কারণ, ব্যাংক সুদসহ সেই অর্থ ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

ইসলামি ব্যাংকসমূহে সাধারণত এই পদ্ধিতিতে 'ব্যালেন্স শিট' তৈরি করা হয় না। তবে 'কারেন্ট একাউন্টের' অর্থকে সাধারণ ব্যাংকের মতো ইসলামি ব্যাংকও ডেবিটের খাতে শামিল করে। কারণ হলো, আমরা ইতঃপূবে বলে এসেছি যে, 'কারেন্ট একাউন্টে' জমাকৃত অর্থ ব্যাংকের জিম্মায় ঋণস্বরূপ। একাউন্ট-হোল্ডারের এই অধিকার আছে, তার যখন ইচ্ছে হবে, তখনই তুলে নিতে পারবে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের সঞ্চয়ী একাউন্টে জমাকৃত অর্থ যেহেতু ব্যাংকের জিম্মায় ঋণ নয় বরং তা 'মুদারাবা সম্পদ' বা 'শরিকানা সম্পদ', তা ছাড়া এই অর্থ অন্যান্য অর্থের সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলা হয় এবং এই অর্থ ব্যাংকের জিম্মায়ও থাকে না। সে হিসেবে এ জাতীয় অর্থকে ডেবিটের খাতে জমা করা ঠিক নয়। এমনিভাবে ওই সকল অর্থ যা ব্যাংক কোনো ক্লাইন্টকে দিয়ে থাকে তার সবগুলোকেই ক্রেডিটের খাতে জমা করা সম্ভব নয়। কারণ, যে পুঁজি শরিকানা ও মুদারাবা-এর ভিত্তিতে কাউকে দেওয়া হয় সেই অর্থ 'ক্ষতিপূরণ যোগ্য নয়' এমন হয়ে থাকে। তাই ক্লাইন্টের মুনাফার জামিন হওয়া তো দূরের কথা সে মূলত মূল পুঁজিরও জামিন হয় না। তবে যদি ব্যাংক কোনো মুরাবাহা ভিত্তিক ব্যাবসা করে তাহলে তার মূল্য অথবা কোনো জিনিস ভাড়ার ভিত্তিতে দেওয়া হলে, তার ভাড়া ব্যাংকের ক্রেডিটের খাতে যুক্ত করা যেতে পারে।

অতএব, উল্লিখিত পার্থক্যের ভিত্তিতে ইসলামি ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট প্রচলিত ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট-এর মতো এমনভাবে তৈরি করা যে, তার ডেবিট ও ক্রেডিট-এর অর্থসমূহে কোনো পার্থক্য থাকে না এমন করা আদৌ সম্ভব নয়। বরং উচিত হলো, ইসলামি ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট ব্যবসায়ী কোম্পানির ব্যালেন্স শিটের মতো তৈরি করা। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করাই ইসলামি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কারণ, ইসলামি ব্যাংক শুধু ঋণ

লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং তা একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। যেটা লাভ, ক্ষতি উভয়ের মাঝে সমানতালে অংশীদার হয়। যদি ইসলামি ব্যাংক নিজ ব্যালেন্স শিট সাধারণ ব্যাংকের মতো এমনভাবে তৈরি করে যে, মুদারাবা একাউন্টের টাকা ডেবিটের খাতে এবং যে পুঁজি ক্লাইন্টকে প্রদান করেছে তা ক্রেডিটের খাতে শামিল করে ফেলে, তাহলে এই ব্যালেন্স শিট অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সঠিক হলেও নিশ্চিতভাবে সঠিক বলে গণ্য হবে না।

৬. সঞ্চয়ী একাউন্টের মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি

ব্যাংক-ডিপোজিট-এর মাসআলাটির মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো, ডিপোজিটে জমাকৃত অর্থ থেকে যে মুনাফা অর্জিত হয়, সেই মুনাফা বন্টনের মাসআলা। এই মাসআলাটি জটিল হওয়ার কারণ হলো, মূলত শিরকাত ও মুদারাবা বলে যা বুঝানো হয়, তা একটি সাদাসিধা ব্যাবসা। যাতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে ব্যাবসা করে থাকে। সকল অংশীদার শুরু থেকে তাতে শরিক থাকে। এমনকি যাবতীয় ব্যবসায়িক সম্পদ মুদ্রায় পরিণত করা হয় এবং সকল শরিকদের মাঝে তার মুনাফা বণ্টন করা হয়। এই পদ্ধতিতে লাভ হিসাব করতে গিয়ে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা থাকে না।

তবে আজকাল যে বড়োবড়ো কোম্পানি রয়েছে, তাতে হাজারো মানুষ অংশীদার থাকে। প্রত্যহ অসংখ্য মানুষ এ সকল কোম্পানি থেকে বের হচ্ছে। অপরদিকে অসংখ্যা মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করছে। আর এ বিষয়টিই এ মাসআলাকে জটিল করে তুলেছে। বর্তমান যুগের প্রচলিত ব্যাংকসমূহে প্রত্যেকের একাউন্টে জমাকৃত টাকার পরিমাণ দৈনন্দিনই কম-বেশি হচ্ছে। যেমন : এক ব্যক্তি আজ ব্যাংকে নতুন একাউন্ট খুলল, কিছুদিন পর সেই একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলনের প্রয়োজন হলো। আবার কিছুদিন পর নিজ একাউন্টে টাকা জমা রাখলো। এ অবস্থা শুধু কারেন্ট একাউন্টে হয় না; বরং সেভিংস একাউন্টেও এমন হয়ে থাকে। এমনকি ফিক্সড ডিপোজিট-এর মধ্যেও এমন হয়ে থাকে। কারণ, ফিক্সড ডিপোজিট-এর ক্ষেত্রে যদিও মেয়াদ নির্দিষ্ট আর একাউন্ট-হোল্ডারের মোয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে একাউন্ট থেকে টাকা ওঠানোর কোনো অধিকার নেই। এরপরো অনেক ব্যাংকে এই প্রচলন আছে যে, ফিক্সড ডিপোজিট হোল্ডারকেও বিশেষ প্রয়োজনে স্বীয় একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করে থাকে। এ কারণে ব্যাংক

কর্তৃপক্ষ সেই পরিমাণ দিনের মুনাফা হ্রাস করে দেয়, যে পরিমাণ দিন মেয়াদ পূর্ণ হতে এখনো বাকি আছে।

অপরদিকে ফিক্সড ডিপোজিটের সকল একাউন্ট একই তারিখে খোলা হয় না, বরং প্রত্যেকের একাউন্ট খোলার তারিখ ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনিভাবে প্রত্যেকের একাউন্টের মেয়াদও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির টাকা রাখার সময়ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এসব সময়ে এত বৈপরীত্য হয় যে, সবগুলোকে একই প্রিয়ডে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। সে জন্যই লেনদেনকে যখন শরিকানা চুক্তি ও মুদারাবা চুক্তিতে পরিবর্তন করা হয়; তখন এই জটিলতা সৃষ্টি হয় যে, একাউন্টে গচ্ছিত টাকার কারবারে যে লাভ-লোকসান হয় তা শিরকাত বা মুদারাবা-এর প্রসিদ্ধ পন্থায় কীভাবে নির্ধারণ করা হবে?

কোনো কোনো আলেম এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, ইসলামি ব্যাংকও টাকা উসূলের ক্ষেত্রে ওই পদ্ধতিই অবলম্বন করবে যা সাধারণ ব্যাংক অবলম্বন করে থাকে। আর সেই পদ্ধতি হলো, সেভিংস একাউন্ট ও ফিক্সড ডিপোজিট এ টাকা জমাকারীদের জন্য একটি তারিখ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেবে যে, অমুক তারিখ থেকে অমুক তারিখ পর্যন্ত টাকা উসুল করা হবে এবং এই পরিমাণ সময়ের জন্য রাখা হবে; যাতে সকল টাকা জমাকারীর মেয়াদ একই তারিখে শুরু হয় এবং একই তারিখে শেষ হয়। ফলে ব্যাংক ওই টাকার ওপর অর্জিত মুনাফা অংশীদারদের মাঝে ইনসাফের সঙ্গে বণ্টন করতে সক্ষম হবে।

তবে এই পরামর্শ অনুযায়ী ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কারণ, ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করার দাবি হলো, একাউন্টে টাকা জমা রাখা ও টাকা উত্তোলনের জন্য সর্বদা ব্যাংক খোলা থাকা। অন্যথায় ব্যাংক যদি টাকা জমা করার জন্য ও টাকা উত্তোলনের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে বর্তমান যুগের ব্যাবসা-বাণিজ্যে জটিলতা সৃষ্টি হবে; ফলে মানুষের সঞ্চয়ের বড়ো একটি অংশ ব্যাবসায় বিনিয়োগ হবে না। আর মানুষের সঞ্চয়কে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খাতে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করাও ইসলামি শরিয়তের একটি উদ্দেশ্য। তাছাড়া মানুষের সঞ্চয়ের এই সম্পদ বিনিয়োগ না হওয়া জাতীয় সমস্যার কারণ। যা দূর করা অত্যন্ত জরুরি।

কোনো কোনো আলেম ভিন্ন আরেকটি অভিমত পেশ করেছেন। তা হলো : ব্যাংকে যে অর্থ রাখা হয়, সেগুলোকে ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত করা হবে।

যে ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা রাখতে আসবে সে নিজ টাকা অনুপাতে ওই ইউনিট ক্রয় করবে। তারপর ব্যাংক নিজ পণ্য ও আমানতের ভিত্তিতে প্রত্যহ সেই ইউনিটের মূল্য ঘোষণা করবে যে, আজ এক ইউনিটের মূল্য এতটাকা। এরপর যে ব্যক্তি ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে চাইবে, সে ওই দিনের হিসাবে নিজ ইউনিট ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করে দেবে। আর ব্যাংকও নিজের ওপর এ বিষয়টি আবশ্যক করে নেবে যে, যখনই কোনো ব্যক্তি ইউনিট বিক্রয় করার জন্য ব্যাংকে আসবে তখনই ব্যাংক ঘোষিত মূল্য দিয়ে ইউনিট কিনে নেবে। ব্যাংকের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউনিটের দৈনিক যে মূল্য বৃদ্ধি পাবে তা সেই ইউনিটের অর্জিত মুনাফা বলে গণ্য হবে। ব্যাংকের মূলধনের মূল্য কম হওয়ায় দৈনিক ইউনিটের যে মূল্য হ্রাস পাবে, তা সেই ইউনিটের লোকসান বলে গণ্য হবে।

উল্লিখিত পরামর্শ ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য কোম্পানিতে কার্যকর করা সম্ভব হলেও ব্যাংকের কার্যক্রমে উল্লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করা খুবই জটিল। জটিলতার কারণগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

প্রথম কারণ

বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনার দাবি হলো; দ্রুত লেনদেন শেষ করা। আর উল্লিখিত প্রস্তাব এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একাউন্টে টাকা রাখা ও ওঠানোর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউনিটের সঙ্গে শর্তযুক্ত করে দেওয়াটাও দ্রুত লেনদেন শেষ করার জন্য প্রতিবন্ধক। অনেক সময় সেই ইউনিট খুব ছোট হয়ে থাকে। সাধারণভাবে একাউন্ট-হোল্ডার স্বীয় ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংকের চেকই ব্যাবহার করে এবং সেই চেকের মাধ্যমেই টাকা উত্তোলন করে থাকে। এখন যদি সেই আমানতকে এভাবে ভাগ-বটোয়ারা করে দেওয়া হয় যে, একাউন্ট-হোল্ডার এই ইউনিটের পরিমাণ অনুযায়ী নিজের আমানত আদায় করবে, তখন দেখা যাবে অবস্থা আরও জটিল হবে। কারণ, প্রত্যেকের আমানত ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ইউনিটের হিসাবে তা আদায় করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কারণ

এই প্রস্তাবের দাবি হলো, ব্যাংকের তামাম পণ্যে বাজার দরের ভিত্তিতে দৈনন্দিন মূল্য নির্ধারণ করা হবে (যাতে ওই ইউনিটের মূল্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট হয়)। প্রকাশ থাকে যে, এ বিষয়টিও নিতান্ত জটিল।

ব্যাংকের অধিকাংশ সম্পদই মুদ্রা এবং ঋণ হয়ে থাকে। বর্তমান যুগের আলেমদের এক জামাতের বক্তব্য হলো : কোনো কোম্পানির শেয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত কেনাবেচা করা জায়েজ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কোম্পানির ফিক্সড সম্পদ মুদ্রা ও ঋণের তুলনায় বেশি না হবে। সুতরাং ওই সকল আলেমের মতে যদি ব্যাংকের অধিকাংশ সম্পদ মুদ্রা ও ঋণ হয়, তাহলে ব্যাংকের ইউনিট কেনাবেচা করা জায়েজ নেই।

হানাফি মাজহাবের মতানুযায়ী এই মাসআলার ভিত্তি হলো مسئلة مدعجوة এর ওপর। সেই আলোকে, কোম্পানির কিছু সম্পদও যদি বস্তু হিসেবে থাকে, তাহলেও শেয়ার বিক্রয় করা জায়েজ। চাই সে কোম্পানির অধিকাংশ সম্পদ মুদ্রা এবং ঋণ হোক। তবে শর্ত হলো, শেয়ারের মূল্য ওই মুদ্রা ও ঋণ থেকে বেশি হতে হবে যে মুদ্রা ও ঋণ ওই শেয়ারের বিপরীতে থাকবে। যাতে অতিরিক্ত মূল্যটা বস্তুর বিনিময়ে হয়ে যায়।

মোটকথা! উল্লিখিত জটিলতার কারণে এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুনাফা নির্ধারণ করার সমস্যা সমাধান করা মুশকিল।

আমি ফিকহশাস্ত্রবিদগণের কিতাবে এ বিষয়টি তালাশ করার চেষ্টা করেছি যে, যদি যৌথ কারবারে কোনো একজন শরিক নিজের পুঁজির কিছু অংশ কারবার থেকে উঠিয়ে নিতে চায় অথবা (মুদারাবার ক্ষেত্রে) মূলধনের মালিক স্বীয় পুঁজির কিছু অংশ কারবার থেকে বের করতে চায়, তাহলে ওই সময় মুনাফার হিসাব কীভাবে করা হবে? এর কোনো সমাধান আমি কোনো স্থানে পাই নি। তবে এ বিষয়ে আল্লামা নববি রহ. প্রণীত 'মিনহাজ'-এর 'কিতাবুল কিরাজ' অধ্যায়ের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে—

ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال، مثاله : رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال. وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك

مثاله : المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ، ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين.

'যদি মালিক ব্যাবসার লাভ-ক্ষতি প্রকাশের আগে নিজের কিছু সম্পদ ব্যাবসা থেকে ফেরত নিয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্ট সম্পদ মূলধনে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি ব্যাবসায় লাভ প্রকাশের পর ফিরিয়ে নেয়, তাহলে ফেরতকৃত সম্পদ মুনাফা এবং মূলধন উভয়ের মাঝে শামিল হবে। যেমন : মূলধন ছিলো ১০০ টাকা এবং তাতে লাভ হয় ২০ টাকা। তারপর মালিক তা থেকে ২০ টাকা ফেরত নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় লাভ হলো পুরো সম্পদের ছয়ভাগের একভাগ। তাই ফেরতকৃত সম্পদের ছয়ভাগের একভাগ (অর্থাৎ, ৩.৩৩ টাকা পুঁজির মুনাফা এবং ১৬.৬৭ টাকা মূলধনে প্রত্যার্পিত হয়েছে।) অংশীদারকে চুক্তি অনুযায়ী যে মুনাফা দেওয়ার শর্ত করা হয়েছিলো, তা আদায়ের পর যা অবশিষ্ট্য থাকবে তা মূলধনে পরিণত হবে। আর যদি ব্যাবসায় লোকসানের পর মালিক কিছু সম্পদ ব্যাবসা থেকে নিয়ে যায়, এমতাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্পদ এবং অবশিষ্ট সম্পদ উভয়ের মাঝে লোকসানকে বণ্টন করে দেওয়া হবে। তারপর যদি ব্যাবসায় লাভ হয়, তাহলে সেই লাভ দ্বারা ওই সম্পদের ক্ষতিপূরণ করা যাবে না, যে সম্পদ মালিক ফিরিয়ে নিয়েছে।

যেমন : মূলধন ছিলো ১০০ টাকা, লোকসান হয়েছে ২০ টাকা। তারপর মালিক সেই মূলধন থেকে ২০ টাকা ফেরত নিয়ে গেলো, তবে এই পদ্ধতিতে লোকসানে এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ, ৫ টাকা ফেরতকৃত সম্পদের বিনিময়ে হবে। মূলধন হবে ৭৫ টাকা।'[১৭]

মোটকথা! উল্লিখিত প্রস্তাব অনুযায়ী শুধু একটি পদ্ধতির সমাধান হয়। তা হলো, মূলধনের মালিক মুদারাবা সম্পদ থেকে কিছু সম্পদ ফেরত নিয়ে নেওয়া। তবে যদি মূলধনের মালিক নিজের বের করা পূর্ণ সম্পদ বা আংশিক সম্পদ দ্বিতীয়বার মুদারাবা সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় অথবা পদ্ধতিটা এমন হলো যে, মূলধনের মালিক উল্লিখিত মাসআলায় শুধু একজন এবং লাভ-ক্ষতিও তাতে একেবারে স্পষ্ট, কিন্তু রাববুল মাল (মুলধনের মালিক) একজনের স্থানে যদি

[১৭] মুগনিল মোহতাজ লিশ শিরবিনি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২১-৩২২।

হাজারো ব্যক্তি হয় এবং তাদের প্রত্যেকেই স্বীয় পুঁজির কিছু অংশ কখনো উঠিয়ে ফেলে আবার কখনো জমা করে, তাহলে এ পদ্ধতিতে এত সূক্ষ্মভাবে হিসাব করা প্রায় অসম্ভব হবে।

৭. ডেইলি প্রোডাক্টস বা দৈনিক উৎপাদনের হিসাব এবং মুনাফা নির্ধারণে তা ব্যবাহরের সীমারেখা

এ জাতীয় সমস্যার সমাধান ওই পদ্ধতির মাঝে বিদ্যমান যাকে বর্তমানে একাউন্টিং পরিভাষায় 'ডেইলি প্রোডাক্টস হিসাব' বলা হয়। আর আরবিতে তাকে 'حساب النمر' বা 'حساب الانتاج اليومى' বলা হয়। শরিকানা এবং মুদারাবায় তা থেকে সহযোগিতা নেওয়ার পদ্ধতি হলো, প্রত্যেক নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পূর্ণ পুঁজিতে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে, তাকে সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট করা হবে যে, কী পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয়েছে? তারপর সেই মুনাফাকে বিনিয়োগকৃত সকল সম্পদের ওপর এবং মেয়াদের সমষ্টিগত দিনের ওপর এমনভাবে বণ্টন করা হবে, যাতে করে এ কথা জানা যায় যে, দৈনিক এক টাকায় কী পরিমাণ লাভ হয়েছে? তারপর প্রত্যেক শরিককে প্রত্যেক টাকার উপর এই অনুপাতে মুনাফা দেওয়া হবে যে, যতদিন তার টাকা একাউন্টে ব্যবহার হয়েছে ততদিনের মুনাফা সে পাবে। যদি তার এক টাকা কয়েকদিন পর্যন্ত পুঁজি বিনিয়োগকারীর একাউন্টে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে সে অনুপাতে মুনাফা দেওয়া হবে। আর যদি কমদিন ব্যবহৃত হয়, তাহলে কম মুনাফা পাবে। যেমন : ডেইলি প্রোডাক্টস হিসাবের ফলে বের হয়ে আসল যে, প্রতি টাকায় দৈনিক এক পয়সা লাভ হয়েছে। এর ফলাফল হলো, এক টাকায় একশত দিনে একশত পয়সা লাভ হয়েছে। চাই সেই টাকা লাগাতার একাউন্টে একশত দিন থাকুক বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকুক। ফলে যে ব্যক্তির টাকা লাগাতার কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে মেয়াদের মধ্যে শতদিন ওই একাউন্টে থাকবে সে একশত পয়সার মুনাফার হকদার হবে। আর যে ব্যক্তির এক টাকা দুইশত দিন কিংবা যে ব্যক্তির দুই টাকা একশত দিন একাউন্টে থাকবে তাদের প্রত্যেকে দুইশত পয়সার মুনাফার হকদার হবে।

মোটকথা! এ পদ্ধতিতে পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যক্তি স্বীয় সঞ্চয়ী একাউন্টে এই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা ইচ্ছে বের করতে বা জমা করতে পারবে।

এ ক্ষেত্রে তার মুনাফা এভাবে নির্ধারিত হবে যে, মেয়াদের সমষ্টিগত দিনের মাঝে কতদিন পর্যন্ত কত টাকা বিনিয়োগ হয়েছে।[১৮]

এই একটি পদ্ধতিই একমাত্র সমাধান যার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকে জমাকৃত পুঁজির মুনাফা বন্টনের হিসাব সঠিকভাবে বের হয়ে আসে। তবে এই পদ্ধতিকে এমনভাবে শরিয়তের বিধি মোতাবেক গঠন করা প্রয়োজন যেন ইসলামি ফিকহের মেজাজ ও রুচি সেই পদ্ধতিটি গ্রহণ করে নেয়। ইসলামি আইনশাস্ত্রে শিরকাত ও মুদারাবার যে পদ্ধতি রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই হিসাব পদ্ধতিকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। প্রতিবন্ধকতাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

১. ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো যৌথ ব্যাবসার প্রকৃত মুনাফা সম্পর্কে অবগত হওয়া নির্ভর করে, সেই যৌথ ব্যাবসার সকল সম্পদকে মুদ্রায় রুপান্তরিত করার ওপর। এমনকি মুদ্রায় রুপান্তরিত করার আগে যে মুনাফা বণ্টন করা হয়, তাও হিসাবের ভিত্তিতে এডভান্স পেইড বলে ধরা হবে। মেয়াদ শেষে সমুদয় সম্পদকে মুদ্রায় রুপান্তরিত করার পর যে অংক দাঁড়াবে এই মুনাফা সেই অংকের অনুগামী হবে। কিন্তু ব্যাংকের লেনদেন ব্যাপক হওয়ায় বর্ষপূর্তির পরও সম্পূর্ণরূপে মুদ্রাকৃতিতে সম্পদের পরিবর্তন কল্পনাও করা যায় না। কারণ, ব্যাংকের লেনদেন বিরতিহীনভাবে চলতেই থাকে, কোনো সময় শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমার কাছে এই জটিলতার সমাধান হলো, প্রত্যেক বর্ষপূর্তিতে কোম্পানির সমুদয় সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে একটি আনুমানিক মুদ্রার হিসাব বের করে সমাধান করা হবে। এই পদ্ধতির সারকথা হলো, পুঁজি বিনিয়োগকালে ব্যাংক বৎসরের শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, সেই সমস্ত সম্পদকে ব্যাংকের অংশীদার পুঁজি বিনিয়োগকারীর অর্থ দ্বারা খরিদ করে নেবে এবং সেই খরিদের ফলে যে মূল্য অর্জিত হবে, তাকে পুঁজির অর্থের সঙ্গে মিশ্রিত করা হবে। তারপর সেই পুঁজির ভিত্তিতে মুনাফা বণ্টন করা হবে। এই পরিস্থিতিতে চলতি বছরের মুদারাবা চুক্তি ও শরিকানা চুক্তি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে! এরপর

[১৮] এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন, মুহাসাবাতুশ শারিকাত ওয়াল মাসারিফ ফিন নিযামিল ইসলামি-১৮১, ১৪০৪ হিজরি কায়রো থেকে প্রকাশিত।

নতুন বছরের শুরুতে অংশীদার এবং পুঁজি বিনিয়োগকারীর মাঝে দ্বিতীয়বার নতুন করে শরিকানা চুক্তি সম্পাদন করা হবে। এ সময় কোম্পানির সম্পদের যে মুল্য হবে তা অংশীদারদের পক্ষ থেকে এই নতুন শরিকানা চুক্তির জন্য মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে। আর অংশীদার সেই পণ্যের মূল্য বিনিয়োগের আমানতে শামিল করে ওই সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। তাই এখন নতুন শরিকানা চুক্তির সময় নিজের সম্পদকে পুনরায় পুঁজির আকৃতির মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে অংশীদার হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় যদিও শিরকাত বিল উরুয-এর সমস্যা আবশ্যক হয়। তবে মালিকি ও কতক হাম্বালি মাজহাবের অনুসারীদের কাছে ওই সব পণ্যের মূল্যের ভিত্তির ওপর এই শরিকানা কারবার নিঃশর্তভাবে জায়েজ। আর শাফিয়ি মাজহাব অবলম্বনকারীদের মতে যদি ওই সকল পণ্য এমন হয়, যার অনুরূপ বস্তু (مثلي) পাওয়া যায়, তাহলে শিরকাত জায়েজ।[১৯]

হানাফি মাজহাব মতে যদি পণ্য-কে পরস্পরে মিলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও শিরকাত জায়েজ।[২০]

আর লোকদের সুবিধার্থে মালিকি মাজহাবের মতকে গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই।[২১]

২. সাধারণ শরিকানা চুক্তি ও মুদারাবা চুক্তি এর দাবি হলো, শরিকানা কারবারের পুরো সম্পদ এবং মুদারাবার পূর্ণ মূলধন একই সময়ে ব্যাবসায় লাগানো হবে। এমনকি ফকিহগণ এমনও বলেছেন, যদি মূলধনের মালিক এতটুকু সময়ের পর ভিন্ন সম্পদ মুদারিবকে প্রদান করে যে, প্রথম সম্পদ ব্যাবসায় লেগে গেছে, এমতাবস্থায় ভিন্ন সম্পদের মাঝে মুদারাবা চুক্তি হবে না। আল্লামা নববি রহ. বলেন—

لو دفع إليه ألفا قراضا، ثم ألفا وقال : ضمه إلى الأول، لم يجز القراض في الثاني، ولا الخلط، لأن الأول استقر حكمه بالتصرف ربحا وخسرانا وربح كل مال وخسرانه يختص به

'যদি কোনো ব্যক্তি অপর এক জনকে মুদারাবার ভিত্তিতে এক হাজার টাকা দিয়ে থাকে। এরপর পুনরায় এক হাজার টাকা দিয়ে মুদারিবকে

[১৯] আল মুগনি লি ইবনু কুদামাহ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৫।

[২০] বাদায়িউস সানায়ে লিল কাসানি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৯।

[২১] ইমদাদুল ফতোয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৫।

বলে এই এক হাজারকে আগের এক হাজারের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। এমতাবস্থায় দ্বিতীয়বার যে এক হাজার দিয়েছে, তাতে না মুদারাবা জায়েজ হবে, না আগের হাজারের সঙ্গে মিলানো বৈধ হবে। কারণ, খরচ করার পর লাভ-লোকসানের হুকুম প্রথম এক হাজারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর এখন পুরো সম্পদের লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রথম এক হাজারের সঙ্গে নির্দিষ্ট হবে।'[২২]

উপরে উল্লিখিত বিধান ওই অবস্থায় প্রয়োগ হবে, যখন উভয় মূলধন একই উদ্যোক্তা দেবে। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন দুই ব্যক্তি এই সম্পদ প্রদান করে, তাহলে আরও উত্তমভাবে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কারণ, উভয়ের মুনাফাও ভিন্ন ভিন্ন হবে। ব্যাংকে বিনিয়োগের ভিত্তিতে যে টাকা জমা রাখা হয়, না ওই টাকা একই সময়ে রাখা হয়, আর না ওই টাকাকে বিনিয়োগের বিভিন্নখাতে একই সময়ে খাটানো যায়; বরং বিভিন্ন সময়ে লাগানো হয়, তাই এই পদ্ধতিকে সাধারণ শরিকানা ও মুদারাবা চুক্তির ওপর ফিট করা সম্ভব নয়।

৩. যদি কেউ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নিজ একাউন্ট থেকে কিছু অর্থ বের করে ফেলে, তাহলে এর অর্থ হলো, যে পরিমাণ অর্থ একাউন্ট থেকে বের করে ফেললো ওই পরিমাণ অর্থ থেকে শরিকানা রহিত হয়ে যাবে। আর যে পরিমাণ অর্থ উঠিয়ে ফেললো, তাতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এখন পর্যন্ত তাতে কোনো মুনাফা হয়নি। আবার এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, যেই অর্থ বের করা হয়েছে, তাতে ডেইলি প্রোডাক্টস হিসেবে যেই মুনাফা হয়েছে তার চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জিত হয়েছে। প্রথম পদ্ধতিতে যেহেতু লাভ একেবারেই হয়নি, তাই ডেইলি প্রোডাক্টস হিসেবে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে তা মূলত ভিন্ন টাকার হবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যে টাকা বের হয়েছে তার উপর যেহেতু ডেইলি প্রোডাক্টস হিসেবে আসা মুনাফার চেয়ে বেশি মুনাফা হয়েছে, তাই এ অবস্থায় এই টাকার মুনাফা অন্য টাকার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

উপরে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার একমাত্র পদ্ধতি হলো, এটিকে বলা হবে যে, এটি চলমান সামষ্টিক শরিকানা চুক্তি। এটি বর্তমান যুগে শিরকাতের একটি আধুনিক প্রকার। তবে এটি জরুরি নয় যে, তাতে শিরকাতুল ইনান বা শিরকাতে মুফাওয়াজার সকল উপকরণ পাওয়া যাবে। কারণ, এটি শরিকানার

[২২] রওজাতুত তালেবিন লিন নববি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৮।

একটি স্বতন্ত্র প্রকার। তবে শিরকাত বৈধ হওয়ার যে সকল শর্ত রয়েছে, যদি তা থেকে কোনো শর্ত পাওয়া না যায়, তাহলে তাতে নাজায়েজের হুকুম লাগানো হবে। অন্যথায় নাজায়েজ হওয়ার হুকুম লাগানো হবে না।

এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআন হাদিসে এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান নেই, যা শরিয়তকর্তৃক অনুমোদিত শরিকানা চুক্তিকে শুধু ওই সকল প্রকারে সীমাবদ্ধ করে দেবে যেগুলোকে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ নিজেদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। বরং ফকিহগণ স্বীয় যুগে প্রচলিত শরিকানার বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধান করে সেগুলোর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। শরিকানার কতক প্রকার এমন রয়েছে যেগুলো অস্তিত্বেই এসেছে মানুষের প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে। যেমন 'শিরকাতুত তাকাববুল' ও 'শিরকাতুল উজুহ'। এগুলো শিরকাতের এমন প্রকার যা কুরআন হাদিসের কোথাও বর্ণিত হয়নি। তবে ফুকাহায়ে কেরাম প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ দুটিকে বৈধ বলেছেন। সুতরাং শিরকাতের এমন কোনো নতুন প্রকার যখন সামনে আসবে যা ফিকহের কিতাবে বর্ণিত শিরকাতের কোনো প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয় তখন তাকে বাতিল বা নাজায়েজ বলা যাবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তা কুরআন হাদিসে বর্ণিত শিরকাতের মৌলিক নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হবে।

এই মূলনীতির আলোকে আমরা বলতে পারি, 'চলমান সামষ্টিক শরিকানা চুক্তি' শিরকাতের একটি আধুনিক প্রকার। যা বর্তমান যুগের মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে অস্তিত্বে এসেছে। শিরকাতের এই আধুনিক পদ্ধতিকে শুধু এ কারণে নাজায়েজ বলার সুযোগ নেই যে, শিরকাতের কতিপয় শাখাগত বিষয় তাতে বিদ্যমান নেই। গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে এটিই বুঝা যায় যে, এই শিরকাতে সকল শরিকদের অর্থ একত্র করা হয় এবং প্রত্যেকেই লাভ-লোকসান মেনে নিয়ে নিজের অর্থ এই শিরকাতের ব্যাবসায় খাটায়। কোনো শরিকের জন্যই মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণ অংক দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয় না। বরং প্রত্যেক অংশীদার লাভ-লোকসানে সমান সমান অংশীদার থাকে। কোনো অংশীদারকেই অন্যের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় না। তাই শিরকাতের এই আধুনিক প্রকারে শিরকাতের সকল মৌলিক উপাদান বিদ্যমান।

যেখানে ডেইলি প্রোডাক্টস-এর ভিত্তিতে মুনাফা বণ্টন হয়, যদিও এই প্রকার বণ্টন প্রত্যেক পণ্যের বাস্তবিক মুনাফার বণ্টন নয় বরং এক মেয়াদের পূর্ণ পণ্যের ওপর অর্জিত আনুমানিক মুনাফার বণ্টন। আর শরিকানার ভিত্তি রাখার সময়ই মুনাফা বন্টনের এই পদ্ধতি সকল অংশীদারের সন্তুষ্টিক্রমেই নির্ণয় করা হয়।

তাছাড়া মুনাফা বন্টনের এই পদ্ধতি ছাড়া অন্যকোনো ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিও নেই।

শরিকানা কারবারের পুরোনো প্রকারসমূহের মধ্যেও আনুমানিক মুনাফা বন্টনের দুটি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত

'শিরকাতুল আমাল' যাকে 'শিরকাতুল আবদান' ও শিরকাতুত তাকাববুল'ও বলা হয়। আর সেটি হলো, দুই ব্যক্তি এ ব্যাপারে শিরকাতের চুক্তি করল যে, তারা উভয়ে মানুষের কাজ করে দেবে, আর তাতে যে পারিশ্রমিক পাবে তা উভয়ের মাঝে নির্দিষ্টহারে বণ্টন করে নেবে। ফুকাহায়ে কেরাম এই শিরকাতকে পরিষ্কারভাবে জায়েজ বলেছেন। যদিও উভয়ের কাজে পরিমাণ ও অবস্থার দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। তাই যদি উভয়ে মিলে এই সিদ্ধান্ত করে যে, পারিশ্রমিক যা পাওয়া যাবে তা সমানহারে উভয়ের মাঝে বণ্টন করা হবে; তাহলে প্রত্যেকে অর্ধেক অর্ধেক করে পারিশ্রমিকের হকদার হবে। চাই সে অর্ধেক পারিশ্রমিকের তুলনায় কম কাজ করুক। কারণ, শরিকানা কাজ জিম্মাদারীর ভিত্তিতে হয়। আর এখানে উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক কাজের দায়িত্বশীল।[২৩]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

হানাফি মাজহাবের অভিমত হলো, শিরকাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য এটি শর্ত নয় যে, শরিকদের সম্পদ অবশ্যই একত্র করতে হবে। সুতরাং এর দাবি হলো, যদি দুইজন অংশীদার হয়, একজনের কাছে দিনার থাকে এবং অপরজনের কাছে দিরহাম থাকে, আর তারা উভয়ে তা মিলানো ছাড়া চুক্তি করে। তারপর প্রত্যেক শরিক নিজ নিজ টাকা দিয়ে সেই শরিকানা চুক্তির ভিত্তিতে পৃথক পৃথকভাবে ব্যাবসার পণ্য খরিদ করে; তাহলে এই শরিকানা চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যাবে। উভয় অংশীদার পরস্পরে একে অন্যের পণ্যে যে মুনাফা হবে তাতে শরিক থাকবে। আল্লামা কাসানি রহ. বলেন—

وَاخْتِلَاطُ الرِّبْحِ يُوجَدُ وَإِنْ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَالِ نَفْسِهِ عَلَى حِدَةٍ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ وَهِيَ الرِّبْحُ تَحْدُثُ عَلَى الشَّرِكَةِ

'যদি দুই অংশীদার নিজ নিজ টাকা দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবসায়িকপণ্য

[২৩] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৫।

খরিদ করে, তাহলে এমন সুরতেও মুনাফার মাঝে মিশ্রণ পাওয়া যাবে। কারণ, এখানে মুনাফা শরিকানার ভিত্তিতে হয়েছে।[২৪]

উল্লিখিত দুটি দৃষ্টান্তের দাবি হলো, শরিয়তের আলোকে এটি জরুরি নয় যে, প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফা তার ক্রয়কৃত পণ্য বা শরিকানার ভিত্তিতে অর্জিত বাস্তবিক মুনাফার ভিত্তিতে হতে হবে। বরং এটিও জায়েজ আছে যে, উভয় অংশীদার পরস্পরে মুনাফা বণ্টনের জন্য অন্যকোনো ভিত্তির ওপর একমত হয়ে সে অনুযায়ী পরস্পরে মুনাফা বণ্টন করে নেবে। এখন যদি অংশীদাররা ডেইলি প্রোডাক্টস-এর ভিত্তিতে পরস্পরে মুনাফা বন্টনের ওপর একমত হয়, তাহলে এই সুরতে শরিয়তের কোনো দলিল-প্রমাণের সঙ্গে তা সংঘাতপূর্ণ হয় না। কারণ, এটি একটি বিশেষ হিসাবের পদ্ধতি। যাকে 'চলমান সামষ্টিক শরিকানা চুক্তি'-এর অংশীদাররা শুধু এজন্য গ্রহণ করেছে যে, তাছাড়া মুনাফা বন্টনের আর কোনো কার্যকরী পদ্ধতি বিদ্যমান নেই। আর মুসলিমগণ পরস্পরে নিজেদের শর্তাবলি চূড়ান্ত করা জায়েজ আছে। তবে ওই সব শর্ত এমন হতে পারবে না, যা হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে দেয়। (কারণ, এমন শর্ত করা জায়েজ নেই।) মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

[২৪] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬০।

রপ্তানির শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'রপ্তানির শরয়ি বিধান' এ প্রবন্ধটি মূলত শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর একটি ভাষণের সংকলন। যা তিনি 'সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনোমিক্স'-এর উদ্যোগে করাচির গুলশান-ই ইকবাল বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদে 'রপ্তানি প্রক্রিয়া' শীর্ষক সেমিনারে পেশ করেন। টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে সেই ভাষণের অনুলিখন তুলে ধরা হলো।

——আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

রপ্তানির শরয়ি বিধান

আজকের এ সেমিনার 'এক্সপোর্ট' তথা 'রপ্তানি প্রক্রিয়া' শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে এটিই প্রথম সেমিনার। তাই এই সেমিনার আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হলো, 'রপ্তানি' বিষয়ে শরয়ি বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া।

বেচাকেনা সংঘটিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট করা

সর্বপ্রথম কথা হলো, ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে (আমদানি ও) রপ্তানির মাঝে বেচাকেনার সময় নির্দিষ্ট করা জরুরি। বিষয়টি আইনি দৃষ্টিকোণেও জরুরি। অর্থাৎ, পণ্যসামগ্রী সেল দেওয়া বা কেনাবেচার মূল সময় (পয়েন্ট অফ টাইম) কোনটি? ওই নির্দিষ্ট সময় কোনটি যখন রপ্তানিকারক বিক্রিত পণ্য আমদানি কারকের কাছে হস্তান্তর করবে? সময়টি এ জন্য নির্দিষ্ট করা জরুরি যে, রাষ্ট্রীয় আইন ও শরিয়তের বিবিধ মাসআলার ওপর এর বেশ প্রভাব রয়েছে। আর এ সময় নির্দিষ্ট করার জন্য দুটি বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য জানা অত্যন্ত জরুরি।

বিক্রয় ও বিক্রয়ের অঙ্গীকারের মাঝে পার্থক্য

বিক্রয় (সেল) ও বিক্রয়ের অঙ্গীকারের (এগ্রিমেন্ট টু সেল) মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। এই পার্থক্য জানা ছাড়া (আমদানি ও) রপ্তানির মাসায়েল

বিশুদ্ধরূপে বুঝা যাবে না। শরিয়তের দৃষ্টিতে বিক্রয় ও বিক্রয়ের অঙ্গীকার দুটি পৃথক পৃথক বিষয়। তা ছাড়া আইনগতভাবেও সেল ও এগ্রিমেন্ট টু সেল দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আজকাল ব্যবসায়িক পরিবেশে কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি শব্দটি উভয়টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ জন্যে যে, কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি শব্দটি যেমনিভাবে বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তেমনিভাবে বিক্রয়ের অঙ্গীকারের জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এ দুই চুক্তির মাঝে বেশ তফাৎ রয়েছে। এই পার্থক্য শরিয়ত ও আইন উভয় ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট করা হয়। এই পার্থক্য বুঝা অত্যন্ত জরুরি।

প্রথম পার্থক্য

প্রথম পার্থক্য হলো, যখন এগ্রিমেন্ট টু সেল তথা বিক্রয়ের অঙ্গীকার করা হয়, তখন যে পণ্য খরিদ করার অঙ্গীকার করা হয়, তা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতার মালিকানাধীন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবে কেনাবেচা সংঘটিত না হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে শুধুমাত্র ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার হয়েছে। অর্থাৎ, বিক্রেতা বলছে, আমি পণ্য হস্তান্তর করে দেবো। আর ক্রেতা বলছে, আমি মূল্য পরিশোধ করে দেবো। তবে শুধু এটুকু অঙ্গীকারের ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মালিকানা পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয় পার্থক্য

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, প্রচলিত আইনের আলোকে যখন কোনো জিনিস বিক্রয় করা হয়, তখন শুধু এই বিক্রয়ের ফলে তার মালিকানাই পরিবর্তন হয় না, বরং তারপর থেকে এর রিস্ক ও দায়দায়িত্বও ক্রেতার ওপরই বর্তায়। যেমন : আমি একটি টেপ রেকর্ডার ক্রয় করলাম। সেই টেপ রেকর্ডার এখনো বিক্রেতার অধীনেই রয়ে গেলো। তা সত্ত্বেও এর বেচাকেনা সংঘটিত হয়ে যাবে এবং তা বিক্রয়ের ফলে আমি তার মালিকও হয়ে যাবো। এই পদ্ধতিতে উল্লিখিত নীতিমালার কারণে টেপরেকর্ডারের দায়-দায়িত্বও আমার উপরই বর্তাবে। অর্থাৎ, এখন যদি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় তা নষ্ট হয়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায় বা অন্যকোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ আমার ওপর বর্তাবে; বিক্রেতার ওপর নয়। কারণ, প্রচলিত আইন অনুযায়ী পণ্যের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ক্রেতার ওপর বর্তানোর জন্য ক্রেতার অধীনে পণ্য থাকা জরুরি নয়। বরং যখনই মালিকানা স্থানান্তরিত হবে তখন থেকে ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্বও স্থানান্তরিত হবে। তবে ইসলামি

বিধি মোতাবেক এমন পদ্ধতি নেই; বরং ইসলামে দুটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। এক হলো মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়া। আর দ্বিতীয় হলো ক্রয়কৃত পণ্যের দায়িত্ব ও রিস্ক স্থানান্তরিত হওয়া। ইসলামি শরিয়তের হুকুম হলো, শুধু বিক্রয় এবং মালিকানা ফেরার মাধ্যমে দায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণও স্থানান্তরিত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত এর দখল ক্রেতার কাছে না আসবে। এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এই টেপরেকর্ডার আমার দখলে না নেবো অথবা আমার কোনো প্রতিনিধি তা দখলে না নেবে—চাই সেই দখল বাস্তবে হোক বা প্রচলিত প্রথা হিসেবে হোক—ততক্ষণ পর্যন্ত এই ক্রয়কৃত পণ্যের দায়-দায়িত্ব আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। প্রচলিত নীতিমালা ও ইসলামি নীতিমালার মাঝে এই হলো পার্থক্য।

তৃতীয় পার্থক্য

তৃতীয় পার্থক্য হলো, যদি কোনো জিনিস কারও কাছে বিক্রয়ের জন্য অঙ্গীকার সম্পন্ন হয় কিন্তু মূল বিক্রয় এখনো না হয় এখন যদি বিক্রেতা ওই পণ্যটিকে ওই ব্যক্তি ছাড়া অন্য জায়গায় বিক্রয় করে দেয়, তাহলে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ভালো না হলেও আইনগত দিক দিয়ে এই বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ক্রেতা ওই পণ্যের মালিক হয়ে যাবে। যেমন : আমি এই অঙ্গীকার করেছি যে, এই টেপরেকর্ডার খালেদ থেকে ক্রয় করবো। শুধু অঙ্গীকার সম্পন্ন হয়েছে মূল বেচাকেনা সম্পন্ন হয়নি। এরপর যদি খালেদ সেই টেপরেকর্ডার আমার স্থানে জায়েদের কাছে বিক্রয় করে দেয়, তাহলে এখন বলা হবে, খালেদ চুক্তির বিপরীত কাজ করেছে। চরিত্রের বিবেচনায় সে ভালো কাজ করেনি। কিন্তু আইনগত দিক দিয়ে জায়েদ এই টেপরেকর্ডারের মালিক হয়ে যাবে। এখন আমার জন্য জায়েদকে একথা বলার অধিকার নেই যে, এই টেপরেকর্ডার তো আমার ছিলো। তুমি কেন কিনেছো? মোটকথা! খালেদকে শুধু আমার এতটুকু বলার অধিকার আছে যে, তুমি আমার সঙ্গে বিক্রয়ের ওয়াদা করে ছিলে। এখন তুমি সেই ওয়াদা ভঙ্গ করেছো। এ কারণে আমার যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ দাও। এর চেয়ে বেশি আমি তাকে এতটুকু বলতে পারবো না যে, তুমি ওই টেপরেকর্ডার জায়েদ থেকে ফেরত এনে আমার কাছে বিক্রয় কর। কিন্তু যদি মূল বেচাকেনা সংঘটিত হয়ে যেতো, এরপর খালেদ সেই টেপরেকর্ডার জায়েদের কাছে বিক্রয় করে ফেলতো, তাহলে আমার এই দাবি করার অধিকার ছিলো যে,

বেচাকেনা যেহেতু সংঘটিত হয়ে গিয়েছে; তাই এই টেপরেকর্ডার এখন আমাকে দিয়ে দিতে হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রিটি এমন হবে যে, যেন তা সংঘটিতই হয়নি।

চতুর্থ পার্থক্য

সেল এবং এগ্রিমেন্ট টু সেল-এর মাঝে চতুর্থ পার্থক্য হলো, যদি কোনো বস্তুর প্রকৃত বিক্রয় সংঘটিত না হয়; বরং শুধু এই অঙ্গীকার করা হয় যে, তুমি আমার কাছে এই পণ্য বিক্রয় করবে। এমতাবস্থায় যদি বিক্রেতা নিঃস্ব হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতা এ কথা বলতে পারবে না যে, ওই পণ্যটি যেহেতু আমি কিনেছি, (অর্থাৎ, ক্রয়ের অঙ্গীকার করেছি) এজন্যে আমার পণ্য আমাকে দিয়ে দেওয়া হোক। বরং ওই পণ্য সাধারণভাবে বিক্রেতার মালিকানায় থাকবে। এবং আইনগতভাবে ওই পণ্যকেও অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে বিক্রয় করে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করা হবে। কিন্তু যদি প্রকৃত বেচাকেনা হয়ে যেতো, তাহলে ক্রেতা ওই পণ্য নিজের অধীনে নিতে পারতো যার কেনাবেচা আগেই সংঘটিত হয়েছে। এই পার্থক্য শরয়ি বিধানের মাঝেও যেমন রয়েছে প্রচলিত আইনের মাঝেও রয়েছে। এই হলো কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য, বিক্রয় এবং বিক্রয়ের অঙ্গীকারের মাঝে। উল্লিখিত মৌলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা এক্সপোর্ট তথা রপ্তানি প্রক্রিয়ার শরয়ি নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

অর্ডারের সময় পণ্যের অবস্থা

আমরা যখন কোনো পণ্য এক্সপোর্ট করতে যাই তখন প্রথমেই অন্যদেশের আমদানিকারকের পক্ষ থেকে এর অর্ডার নেওয়া হয়। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, পণ্যের অর্ডার নেওয়ার সময় ওই পণ্য আমাদের কাছে নেই বরং হয়তো কারখানায় সবেমাত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। কখনো অন্যদের মাধ্যমে প্রস্তুত করানো হয়। কখনো মার্কেট থেকে ক্রয় করা হয়। আবার কখনো দেখা যায় সেই পণ্য পূর্ব থেকেই আমাদের কাছে স্টক আছে।

যদি অর্ডার নেওয়ার সময় পণ্য প্রস্তুত থাকে

যদি পূর্ব থেকেই অর্ডারকৃত পণ্য আমাদের কাছে বিদ্যমান থাকে, তাহলে আমদানিকারকের সঙ্গে বিক্রয়ের অঙ্গীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং ওই সময়ই পণ্য সেল করে দিতে পারবে। এবং তাদেরকে বলে দেবে—আমরা আপনার কাছে এই পণ্য বিক্রয় করলাম। আমদানিকারকও সেই পণ্য কিনে নেবে। এই পদ্ধতিতে বেচাকেনায় শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নেই।

যদি অর্ডার নেওয়ার সময় পণ্য প্রস্তুত না থাকে

যদি বিক্রির পণ্য পূর্ব থেকেই বিদ্যমান না থাকে বরং বিক্রেতা হয়তো সেই পণ্য নিজে প্রস্তুত করবে বা অন্যকে দিয়ে প্রস্তুত করাবে অথবা অন্য কারও কাছ থেকে ক্রয় করবে, তাহলে এমন পদ্ধতিতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী পণ্যকে অগ্রীম বিক্রয় করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যে পণ্য বিক্রয় করবে, তা তখন বিদ্যমান থাকা বা নিজের মালিকানায় থাকা বা দখলে থাকার কোনো শর্ত নেই। এ জন্যই প্রচলিত আইন অনুযায়ী পণ্য তৈরির আগেই পণ্য বিক্রয় (ফরওয়ার্ড সেল) করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে শরয়ি বিধি মোতাবেক পণ্য বিক্রির সময় পণ্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এমনকি বিক্রেতার মালিকানা ও তার দখলে থাকাও আবশ্যক। এখন সেই দখল প্রকৃত হোক অথবা প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হোক। এখন মাসআলা হলো, যদি কোনো পণ্য আমাদের কাছে বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় তার অর্ডার আসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমরা কী করবো?

এর জবাব হলো, এ অবস্থায় আমরা এই অর্ডার-দাতার সঙ্গে বিক্রয়ের চুক্তি করবো না বরং বিক্রয়ের অঙ্গীকার করবো। এমতাবস্থায় আগে উল্লিখিত শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমাদের কাছে অন্যকোনো রাষ্ট্র থেকে এমন কোনো পণ্যের অর্ডার আসে যেই পণ্য আমাদের কাছে বিদ্যমান নেই, এমতাবস্থায় অর্ডারদাতাদের সঙ্গে আমাদের বিক্রয়ের অঙ্গীকারও হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়ের এই অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রকৃত বিক্রয় কখন সংঘটিত হবে? কোন পর্যায়ে গিয়ে আমরা এ কথা বলবো যে, এখন বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং পণ্যের মালিকানা ও রিস্ক (দায়ভার) ক্রেতার জিম্মায় স্থানান্তরিত হয়েছে?

এই প্রশ্নের জবাব হলো, বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতির পর আমরা অর্ডারকৃত পণ্য বাজার থেকে কিনে নিয়েছি বা নিজেরা প্রস্তুত করে নিয়েছি অথবা অন্যকারও মাধ্যমে তৈরি করিয়েছি, ফলে এখন সেই পণ্য আমাদের হাতে চলে এসেছে এবং এই পর্যায়ে চলে এসেছে যে, এখন আমরা এই পণ্য আমদানিকারককে হস্তান্তর করে দিতে পারি। এবং জাহাজ বা অন্যকোনো পরিবহনে উঠিয়ে দিতে পারি।

এমতাবস্থায় প্রকৃত সেলের দুটি পদ্ধতি হতে পারে। এক হলো যে সময় পণ্য প্রস্তুত হয়ে আমাদের হাতে চলে আসবে, তখন আমরা নতুন করে বিক্রয়ের প্রস্তাব দেবো। সেই প্রস্তাব চাই ফোন, ফ্যাক্স বা অন্যকোনো মাধ্যমে হোক। এখন যদি ক্রেতা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে প্রকৃত বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো কোনো কোনো সময় মৌখিক প্রস্তাব ও গ্রহণ ছাড়া শুধু পণ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমেই প্রকৃত বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়। যাকে পরিভাষায় হাতে হাতে বিক্রয় বলা হয়। যেহেতু পূর্ব থেকেই ক্রেতার সঙ্গে বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং পণ্য প্রস্তুত হয়ে আমাদের হাতে চলে এসেছে, তাই আমরা আমদানিকারক তথা ক্রেতার কাছে তা রওয়ানা করিয়ে দিয়েছি। অতএব, যখন আমরা তা শিপিং কোম্পানির কাছে সোপর্দ করে দেবো; তখন এই সোপর্দ করার মাধ্যমে হাতে হাতে বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। আর এই অর্পণ করাই প্রস্তাব ও গ্রহণ বলে বিবেচিত হবে এবং সেসময় বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়ে যাবে। বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পণ্যের ওপর ক্রেতার দখলও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (কারণ, শিপিং কোম্পানি ক্রেতার উকিল তথা প্রতিনিধি হিসেবে এই পণ্য দখল করেছে, যার আলোচনা সামনে আসছে) সুতরাং এই পণ্যের দায়-দায়িত্ব ক্রেতার (আমদানিকারকের) দিকে ফিরবে।

সারমর্ম হলো, যদি কেনাবেচার সময় বিক্রেতার কাছে পণ্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি ওই সময় পণ্য বিদ্যমান না থাকে বরং পরবর্তীকালে প্রস্তুত করে, তাহলে যে সময় এক্সপোর্টার তথা বিক্রেতা ওই পণ্য শিপিং কোম্পানির কাছে অর্পণ করবে তখন প্রকৃত বিক্রয় সংঘটিত হবে। আর বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পয়েন্ট অফ টাইম হবে এটি।

পণ্যের দায়িত্ব কখন (ক্রেতার দিকে) ফিরবে ?

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, সাধারণভাবে তিন পদ্ধতিতে পণ্য শিপমেন্ট করা হয়। প্রথম পদ্ধতি এফ. ও. বি. (F.O.B), দ্বিতীয় পদ্ধতি সি. এন্ড. এফ. (C.&.F) ও তৃতীয় পদ্ধতি, সি. আই. এফ. (C.I.F)।

প্রথম পদ্ধতি তথা এফ. ও. বি. (ফ্রি অন বোর্ড)। এতে রপ্তানিকারক বিক্রেতার দায়িত্ব হলো শুধু ওই পণ্য (আমদানিকারক ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর জন্য) শিপমেন্ট কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করা। আর এছাড়া পণ্যবাহী জাহাজের ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ স্বয়ং আমদানিকারক বহন করে। এই পদ্ধতিতে শিপিং কোম্পানি ইমপোর্টারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। সুতরাং যে সময় শিপিং কোম্পানি ওই পণ্য নিজের অধীনে নেবে সে সময় থেকে ওই পণ্য ইমপোর্টারের অধীন হিসেবে বিবেচিত হবে। আর পণ্যের সকল রিস্ক বা দায়ভার সেসময়ই ইমপোর্টারের জিম্মায় বর্তাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি তথা সি. এন্ড. এফ. (কস্ট এন্ড ফ্রেইট) এর মাধ্যমে যদি পণ্য পাঠানো হয়, তাহলে পণ্যের পরিবহন খরচ এক্সপোর্টার তথা বিক্রেতা বহন করে। এই পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী মহলের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শিপিং কোম্পানিকে ইমপোর্টারের এজেন্ট মনে করা হয়। এজন্য যখন শিপিং কোম্পানি পণ্যের দখল বুঝে নেয় তখন সেটিকে ইম্পোর্টারের দখল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, শরিয়তের দৃষ্টিতে এভাবে ক্রয় বিক্রয় করার হুকুম কি?

আমরা এই মাসআলার সমাধানের জন্য এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আলেমগণের একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। সেই সেমিনারে এ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ব্যবসায়ীদের এ জাতীয় লেনদেনে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রপ্তানিকারক পণ্য পরিবহনের ভাড়া পরিশোধ করলেও শিপিং কোম্পানিকে আমদানিকারকেরই এজেন্ট মনে করা হবে। সুতরাং যে সময় রপ্তানিকারক ওই পণ্য শিপিং কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করবে তখন থেকেই পণ্যের যাবতীয় দায়ভার ইমপোর্টারের (আমদানিকারক) কাঁধে বর্তাবে।

আর যদি তৃতীয় পদ্ধতি তথা সি. আই. এফ. (কস্ট ইন্সুরেন্স এন্ড ফ্রেইট) অনুযায়ী পণ্য পাঠানো হয়, তাহলে এর হুকুমও দ্বিতীয় পদ্ধতির মতো। কারণ, তৃতীয় পদ্ধতিটি দ্বিতীয় পদ্ধতির মতোই। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, তৃতীয়

পদ্ধতিতে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের জন্য বীমা করে, আর সেই বীমার লাভও আমদানিকারকই ভোগ করবে। রপ্তানিকারক বীমা করা ও পণ্য জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়ার পর দায়মুক্ত হয়ে যায়। তাই এর হুকুমও দ্বিতীয় পদ্ধতির হুকুমের মতোই হবে। অতএব সাধারণ লেনদেনের নিয়মানুযায়ী বিক্রেতা যদি ওই পণ্য এফ. ও. বি. কিংবা সি. এন্ড. এফ অথবা সি. আই. এফ এই তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে শিপিং কোম্পানির কাছে পৌঁছে দেয়, তাহলে পণ্যের যাবতীয় দায়িত্ব আমদানিকারকের কাঁধে বর্তাবে।

এগ্রিমেন্ট টু সেল তথা বেচাকেনার ওয়াদা পূরণ না করা

তৃতীয় মাসআলা হলো, আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মাঝে কেনাবেচার ওয়াদা হয়েছে তবে এখনো বাস্তবে বেচাকেনা হয়নি। এমতাবস্থায় রপ্তানিকারক যদি ওয়াদা পূরণ না করে ওই ওয়াদা পূরণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আমদানিকারক কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারবে কি না? অথবা রপ্তানিকারকতো নিজের ওয়াদা পূরণ করেছে তবে আমদানিকারক সেই পণ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে এবং সেই ওয়াদার বিপরীত কাজ করছে, তাহলে রপ্তানিকারক কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারবে কি না?

প্রচলিত আইন অনুযায়ী কেউ যদি বিক্রির ওয়াদা ভঙ্গ করে আর এতে প্রতিপক্ষের কোনো ক্ষতি হয় তাহলে সেই পক্ষ অপর পক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। যদি সে ক্ষতিপূরণ না দেয় তাহলে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকার তার আছে। তবে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে বিক্রির ওয়াদা যেহেতু একটি অঙ্গীকার; আর অঙ্গীকার পূর্ণ করা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকেও জরুরি নৈতিক দিক থেকেও জরুরি। তাই অঙ্গীকারকারীর জন্য উচিত হলো, তার অঙ্গীকার পূরণ করা। তবে যদি কোনো ব্যক্তি কৃত ওয়াদা পূরণ না করে, তাহলে তার ব্যাপারে শরিয়তের সিদ্ধান্ত হলো, সে একজন গুনাহগার। দুনিয়ার বিচারে তার ওপর কোনো প্রকার শাস্তি বা বল প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন : বিয়ের এনগেজমেন্ট। এটি মূলত বিয়ের অঙ্গীকার। প্রকৃত বিয়ে নয়। প্রকৃত বিয়ে ভিন্ন লেনদেন। এখন যদি কেউ এনগেজমেন্ট করে পরবর্তীকালে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কারণ, সে এখানে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। তাই সে ওয়াদা ভঙ্গকারীর অভিযোগে অভিযুক্ত হবে। চারিত্রিকভাবেও

বড়ো অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। আর সামাজিকভাবেও তাকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখবে। তবে তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা যাবে না যে, সে বিয়ের ওয়াদা করেছে কিন্তু এখনো ওয়াদা পূরণ করছে না। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়ে তাকে বিয়ে ও অঙ্গীকারের ওপর বাধ্য করা যাবে না।

সুতরাং সাধারণভাবে ওয়াদার হুকুম হলো, এর জন্য আদালতের দারস্থ হওয়া যাবে না। অর্থাৎ, আদালতের আশ্রয় নিয়ে তাকে ওয়াদা পূরণের জন্য কোনো প্রকার বল প্রয়োগ করা যাবে না।

তবে ব্যাবসার ক্ষেত্রে 'ওয়াদা' যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং ব্যবসায়ীরা এর ওপর ভিত্তি করে অনেক সময় এমন সব পদক্ষেপ নিয়ে থাকে যাতে তাদের অনেক টাকা ও শ্রম ব্যয় হয়। এখন যদি ওয়াদাকারী এ কথা বলে দেয়, আমি কৃত ওয়াদা পূরণ করতে পারবো না। এতে করে দ্বিতীয় ব্যক্তির অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে! এ জন্য কোনো কোনো ফকিহ্ এ অনুমতি দিয়েছেন যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীকে আদালতের মাধ্যমে ওয়াদা পূরণের জন্য বল প্রয়োগ করা যাবে। আদালত তাকে দুটি বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করবে—

১. হয়তো সে ওয়াদা পূরণ করবে। যেমন : সে পণ্য ক্রয়ের ওয়াদা করে থাকলে অবশ্যই এখন তাকে পণ্য ক্রয় করতে হবে।

২. কোনো কারণবশত যদি ওয়াদা পূরণ করতে সক্ষম না হয়; তাহলে কোনো কোনো ফকিহের অভিমত অনুযায়ী ওই ব্যক্তি থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে।

অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে ক্ষতির ব্যাখ্যা

আজকাল ব্যাবসার মাঝে যে ক্ষতির (Damage) ধারণা চালু আছে এবং কোনো কোনো ফকিহ শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে যে ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন, এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

প্রচলিত আইনে যেসব ক্ষতির ক্ষতিপূরণ আদায়ের অনুমতি আদালত প্রদান করে সেগুলোর ভিত্তি হলো অপরচুনিটি কস্ট তথা সম্ভাব্য লাভের উপর। যেমন : ধরে নিন, আমি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ওয়াদা করলাম, আমি এই পণ্য আপনার কাছে বিক্রয় করবো। সেও ওয়াদা করলো আমি এই পণ্য ক্রয় করবো। কিন্তু পরবর্তীকালে

সে ক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানালো। এখন দেখা হবে সে যদি আমার থেকে ওই পণ্য ক্রয় করতো, তাহলে আমার কি পরিমাণ লাভ হতো আর এখন সে তা ক্রয় না করায় আমার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে? কারণ, এখন অন্যের কাছে কমমূল্যে বিক্রয় করতে হবে। এখন উভয় মূল্যের এই ব্যবধানকে ক্ষতি ধরে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার ক্ষতিপূরণের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে। অনুরূপ কোনো ব্যক্তি পণ্য বিক্রয়ের ওয়াদা করলো; তার এই ওয়াদার ওপর ভিত্তি করে অপর ব্যক্তি এক মাস যাবত পুঁজি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করেনি। পরবর্তীকালে ওই ব্যক্তি পণ্য বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির লোকসান হয়েছে; কারণ, এ অর্থ সে অন্যখাতে বিনিয়োগ করে অনেক লাভবান হতে পারতো; কিন্তু সেটি হয়নি তার ওয়াদার কারণে। এখন এই ক্ষতিপূরণের জন্য সে আদালতের আশ্রয় নিতে পারে, আর এ ধরনের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয় সম্ভাব্য লাভ তথা অপরচুনিটি কস্ট-এর ওপর ভিত্তি করে হিসাব-নিকেশ করার মাধ্যমে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে লোকসানের ব্যাখ্যা

শরিয়তে এ জাতীয় লোকসানের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। বরং শরিয়তে লাভ না হওয়া ও লোকসান হওয়ার মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে। লোকসান হওয়ার অর্থ হলো, বাস্তবেই কিছু টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যাওয়া এবং আর্থিক ক্ষতি হওয়া। আর লাভ না হওয়ার অর্থ হলো, কোনো লেনদেনে এই ধারণা ছিলো যে, তাতে এ পরিমাণ লাভ হবে, কিন্তু পরবর্তীকালে ওই লেনদেনে এ পরিমাণ লাভ হয়নি। বর্তমানে ব্যবসায়ীরা এই লাভ না হওয়াকেও লোকসান বলে ব্যক্ত করে। অথচ শরিয়ত তাকে লোকসান বলে না।

যেমন : কোনো একটি পণ্য আপনি দশ টাকায় ক্রয় করলেন। এতে আপনি ধারণা করলেন যে, তাকে ১৫ টাকায় বিক্রয় করে পাঁচ টাকা লাভ করবেন। এখন একজন ক্রেতা এসে ১৫ টাকার স্থানে ১২ টাকায় ক্রয় করলো। ব্যবসায়ী মহলে সেটিকে লোকসান বলবে যে, তাতে তিন টাকা লোকসান হয়েছে। তবে শরিয়ত তাকে লোকসান বলে না। বরং শরিয়ত তখন লোকসান বলবে, যখন আপনি দশ টাকা দরে ক্রয়কৃত পণ্যটি নয় টাকায় বিক্রয় করবেন। সুতরাং বর্তমানে ব্যবসায়ী মহলে যাকে লোকসান বলে তা মূলত লোকসান নয়। শরিয়তে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। মোটকথা এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিলো 'ওয়াদা'-এর ব্যাপারে।

রপ্তানির জন্য পুঁজি অর্জন করা

রপ্তানির লেনদেনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, 'ডকুমেন্ট ক্রেডিট'। প্রবাদ আছে 'মানুষ চাদর দেখে কদম বাড়ায়' (অর্থাৎ, সামর্থ অনুযায়ী অগ্রসর হয়)। শরিয়ত ও সামাজ ব্যবস্থা এ নীতিই শিক্ষা দেয়। তবে আজকাল মানুষ এ নীতির পরিবর্তে 'মানুষ প্রথমে কদম বাড়ায়, পরে চাদর তালাশ করে' এ নীতি গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, রপ্তানির ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে যে, প্রথমে তারা পণ্য পাঠাবার অর্ডার নিচ্ছে। অথচ ওই সময় না তার কাছে পণ্য বিদ্যমান আছে, না পণ্য ক্রয়ের জন্য কোনো টাকা-পয়সা আছে। আফসোস! আজ ব্যবসায়ীরা এ বিষয়টি ভ্রুক্ষেপই করে না। অথচ নৈতিকভাবেও এ বিষয়টি কত নিকৃষ্ট, তা বলাই বাহুল্য। তারপরও প্রচলিত সে পদ্ধতির ব্যাপারে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী? তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হলো—

রপ্তানিকারকের পণ্য ক্রয়ের জন্য পুঁজির প্রয়োজন। আর সে জন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়ে পুঁজি সংগ্রহ করে এবং তা দিয়ে 'এক্সপোর্টার' পণ্য প্রস্তুত করে রপ্তানি করে। যাকে বর্তমানে 'এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং' বলা হয়। বর্তমান বিশ্বে যে নীতি চলছে সে অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান পুঁজি প্রদান করে থাকে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলো এ জাতীয় 'আর্থিক ঋণ' 'ইন্টারেস্ট'-এর ভিত্তিতে দিয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, যদি কোনো মুসলিম সুদবিহীন পুঁজি পেতে চায়, তাহলে সে কী করবে? অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আমরা যদি এমন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চাই যার ভিত্তি হলো, ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা, তাহলে তাতে 'এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং' কীভাবে হবে?

এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং-এর পদ্ধতি

'এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং'-এর দুটি পদ্ধতি চালু রয়েছে—

১. প্রি শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং; ও

২. পোস্ট শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং।

প্রি শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং (তথা পণ্য জাহাজে তোলার আগে অর্থায়ন পদ্ধতি)-এর ইসলামি পদ্ধতি

'প্রি শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং'-এর পদ্ধতি হলো, রপ্তানিকারক সাধারণত প্রথমে এমন অবস্থায় পণ্যের অর্ডার নেয়। যে সময় তার কাছে সেই পণ্য সরবরাহ করার মতো থাকে না। অর্ডার পাওয়ার পর; প্রথমে সে পুঁজি সংগ্রহের চেষ্টা করে। এখন রপ্তানিকারক যদি সুদবিহীন পুঁজি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পেতে চায়, তাহলে এর পদ্ধতি অনেক সহজ। সেটি হলো : 'ফাইন্যান্সিং' কে মুশারাকার ভিত্তিতে নেওয়া হবে। কারণ, রপ্তানিকারকের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের অর্ডার আছে। আর অর্ডারে সাধারণত পণ্যের মূল্যও নির্দিষ্ট থাকে যে, এই পরিমাণ মূল্যের এই পরিমাণ পণ্য দেওয়া হবে। আর সেই মূল্যের ভিত্তিতে ব্যাংকে এল. সি. খোলা হবে এবং এ বিষয়টিও জানা থাকে যে, এই পরিমাণ পণ্য প্রদান করলে এই পরিমাণ লাভ হবে। ব্যয়ের পরিমাণও জানা থাকে। কারণ, ব্যয়ের ভিত্তিতেই দাম নির্ধারণ করা হয়। ফলে এতে প্রায় ব্যয়ও নির্দিষ্ট থাকে এবং মূল্যও নির্দিষ্ট থাকে। আর সেই ভিত্তিতে লাভও প্রায় নির্দিষ্ট। এখন যদি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই বিশেষ লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রপ্তানিকারকের সঙ্গে শরিকানা চুক্তি করে এবং বলে যে, আমরা আপনাকে পুঁজি দিচ্ছি। আপনি অর্ডার অনুপাতে পণ্য তৈরি করে রপ্তানি করুন। তারপর আপনি আমদানিকারক থেকে যে মূল্য পাবেন এবং এতে যা লাভ হবে; তা আমরা পরস্পরে নির্ধারিত হারে বণ্টন করে নেবো। তো এভাবে অত্যন্ত সহজভাবে সুদবিহীন ফাইন্যান্স হয়ে যাবে।

মোটকথা শরিকানার জন্য জরুরি হলো, রপ্তানিকারকও কিছু বিনিয়োগ করবে। আর ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট পুঁজি বিনিয়োগ করবে। তবে যদি রপ্তানিকারক নিজের পক্ষ থেকে কোনো পুঁজি বিনিয়োগ না করে, বরং পুরো পুঁজি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে এটি মুদারাবা চুক্তি বলে গণ্য হবে। কারণ, মুদারাবার মাঝে এক পক্ষের পুঁজি ও অপর পক্ষের শ্রম থাকে। তবে সাধারণ নিয়ম হলো, রপ্তানিকারকও নিজে কিছু পুঁজি তাতে বিনিয়োগ করে। এ জন্যই তাকে মুশারাকা বা শরিকানা ব্যাবসা বলা যায়। আর লাভের হার পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে নির্ধারণ করে নেবে। সারকথা, প্রি শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং-এর মধ্যে অত্যন্ত সহজভাবে মুশারাকা করা যেতে পারে।

পোস্ট শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং (তথা পণ্য জাহাজে তোলার পর অর্থায়ন প্রক্রিয়া)-এর ইসলামি পদ্ধতি

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, 'পোস্ট শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং'। এতে রপ্তানিকারক অর্ডারকৃত পণ্য পাঠিয়ে দেয় এবং তার কাছে বিল বিদ্যমান থাকে। তবে বিলের টাকা আসতে কিছু সময়ের প্রয়োজন কিন্তু তারও তাৎক্ষণিক টাকার দরকার। তাই সে ওই বিল নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে বলে, এই বিলের টাকা আপনি নির্দিষ্ট সময়ে 'ইম্পোর্টার' থেকে উসুল করে নেবেন। তবে এখন আমাকে এই বিলের টাকা দিয়ে দিন। অতএব, ব্যাংক এই বিল থেকে কিছু কমিশন রেখে বাকি সব টাকা রপ্তানিকারককে দিয়ে দেয়। যাকে 'বিল ডিসকাউন্টিং' বলা হয়। উদাহরণসরূপ : বিল যদি এক লাখ টাকার হয় তাহলে ব্যাংক এক লাখ টাকায় দশ পার্সেন্ট কমিশন রেখে অবশিষ্ট নববই হাজার টাকা রপ্তানিকারককে দিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে আমদানিকারক থেকে বিলের পূর্ণ এক লাখ টাকা উসুল করে নেয়। বিল ডিসকাউন্টিং-এর এই পদ্ধতি শরিয়ত-সম্মত নয়, বরং তা পরিষ্কার নাজায়েজ। কারণ, তাতে সুদের লেনদেন বিদ্যমান।

বিল ডিসকাউন্টিং-এর জায়েজ পদ্ধতি

বিল ডিসকাউন্টকে ইসলামি পদ্ধতিতে রূপান্তর করার দুই অবস্থা।

১. যে রপ্তানিকারক পোস্ট শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং করার ইচ্ছে করেছে; সে ওই শিপমেন্ট ও পণ্য পাঠাবার আগে ব্যাংকের সঙ্গে মুশারাকা চুক্তি করে নেবে। যার বিশদ আলোচনা ইতোপূর্বে গিয়েছে।

২. রপ্তানিকারক আমদানিকারকের কাছে পণ্য পাঠাবার আগে ওই পণ্য ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এল. সি.-এর মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে বিক্রয় করে দেবে। তারপর ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ওই পণ্য আমদানিকারকের কাছে বিক্রয় করে দেবে এল. সির মূল্যের সমমূল্যে। আর এভাবে দুই মূল্যের মাঝে যে পার্থক্য হবে, তা ব্যাংকের লাভ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন : একলাখ টাকার ওপর এলসি খুলেছে। এখন রপ্তানিকারক ব্যাংকের কাছে সেই পণ্য ৯৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করে দেবে। আর ব্যাংক আমদানিকারকের কাছে সেই পণ্য এক লাখ টাকায় বিক্রয় করবে। এতে করে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকের লাভ অর্জিত হবে।

কিন্তু ডিসকাউন্টের এই দ্বিতীয় পদ্ধতি তখনই সম্ভব হবে যখন আমদানিকারকের সঙ্গে 'প্রকৃত বিক্রি' সংঘটিত না হয়ে শুধু বিক্রির অঙ্গীকার তথা 'এগ্রিমেন্ট টু সেল' হবে। আমদানিকারকের সঙ্গে যদি প্রকৃত বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। যাহোক, এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেও এক্সপোর্টার নিজের বিনিয়োগকৃত পুঁজি তৎক্ষণাৎ আদায় করে নিতে পারবে। নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করা লাগবে না। মোটকথা ব্যাংকে বিল ডিসকাউন্ট করার যে পদ্ধতি বর্তমান সময়ে চালু আছে তা শরিয়ত-সম্মত নয়।

'বিল ডিসকাউন্টিং'-এর ধারাবাহিকতায় আরেকটি প্রস্তাব রয়েছে। সেই প্রস্তাবটিও কিছু শর্ত সাপেক্ষে আমলযোগ্য হতে পারে। তবে সাধারণত সেই শর্ত পূরণ হয় না। এ কারণে সেই প্রস্তাবের ওপর আমল করার অনুমতি দেওয়া হয় না। তবে যদি কেউ সেই শর্তগুলো মেনে আমল করতে চায়, তাহলে তার জন্য সুযোগ রয়েছে। শর্তগুলো হলো, যে ব্যক্তি 'বিল ডিসকাউন্ট' করতে চায়, সে ব্যাংকের সঙ্গে পৃথকভাবে দুটি লেনদেন করবে—

১. 'এক্সপোর্টার' ব্যাংককে 'আমদানিকারক' থেকে পণ্যের মূল্য উসুলের এজেন্ট বানিয়ে বলবে, আপনি আমার পক্ষে আমদানিকারক থেকে টাকা উসুল করে আমাকে প্রদান করবেন। আর এ জন্য আমি (এক্সপোর্টার) আপনাকে (ব্যাংক) সার্ভিস চার্জ দেব।

২. ব্যাংক এলসির মূল্য থেকে কিছু কমমূল্য সুদবিহীন করজে হাসানা এক্সপোর্টারকে প্রদান করবে। যেমন : এক্সপোর্টার যে 'বিল ডিসকাউন্ট' করতে চাচ্ছে তার পরিমাণ এক লাখ টাকা। এখন এক্সপোর্টার ব্যাংককে নিজের এজেন্ট বানিয়ে বলবে, আপনি আমদানিকারক থেকে এ পরিমাণ টাকা উসুল করে আমাকে দেবেন। আমি আপনাকে (ব্যাংককে) এ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা সার্ভিস চার্জ দেবো। দ্বিতীয় চুক্তি হলো: সে ব্যাংক থেকে ৯৫ হাজার টাকা সুদবিহীন ঋণ নেবে ও ব্যাংককে বলবে, যখন আমার বিল-এর টাকা উসুল হয়ে যাবে তখন তা থেকে ৯৫ হাজার টাকা ঋণ বাবদ আর পাঁচ হাজার টাকা চার্জ হিসেবে নিয়ে নেবেন।

উল্লিখিত প্রস্তাব অনুযায়ী আমল করা সম্ভব। তবে এতে একটি শর্ত পালন করা অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় লেনদেন শরিয়ত-সম্মত হবে না। আর তা হলো,

উভয়পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে যে সার্ভিস চার্জ নির্দিষ্ট করা হয়, তা বিল আদায়ের সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ, সার্ভিস চার্জ বিলের ম্যাচিউরিটি ডেটের সঙ্গে রিলিটেড হবে না। উদাহরণ-স্বরূপ : এমন হতে পারবে না যে, যদি বিল পরিশোধের মেয়াদ তিন মাস হয়, তাহলে সার্ভিস চার্জ হবে চার হাজার টাকা। আর যদি বিল পরিশোধের মেয়াদ হয় চার মাস, তাহলে সার্ভিস চার্জ হবে ছয় হাজার টাকা। অর্থাৎ, বিল আদায়ের মেয়াদ কমবেশি হওয়ার কারণে চার্জ কমবেশি করা যাবে না। তবে কিছু চার্জ তো অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে। এ জাতীয় শর্ত সাপেক্ষে ওই প্রস্তাবটির ওপর আমল জায়েজ হবে। 'এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং' প্রসঙ্গে এই ছিলো কিছু বিশ্লেষণ। এখন ফরেন এক্সচেঞ্জ-এর অগ্রিম বুকিং প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

ফরেন এক্সচেঞ্জের অগ্রিম বুকিং

এ ক্ষেত্রে প্রথম মাসআলা হলো, ফরেন এক্সচেঞ্জের (তথা বৈদেশিক মুদ্রার) অগ্রিম বুকিং শরিয়তে বৈধ কি না? এ প্রসঙ্গে প্রথমে মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের কতিপয় মূলনীতি জানতে হবে। এরপর সেসব মূলনীতির আলোকে এ মাসআলা নিরীক্ষণ করা সহজ হবে।

মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতি

১. প্রথম মূলনীতি হলো, এক দেশের মুদ্রাকে অপর দেশের মুদ্রা দিয়ে বিনিময় করা জায়েজ। বিনিময়ের সময় পরস্পরের সম্মতিক্রমে মুদ্রার যে-কোনো মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। তবে যেসব দেশে সরকার কর্তৃক মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এবং সেই নির্ধারিত মূল্যের কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় করা আইনত নিষিদ্ধ থাকে সেসব দেশে সরকারি আইনবিরোধী হওয়ার কারণে কমবেশি করে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা শরিয়ত-সম্মত নয়। কেননা কোনো প্রকার কারণ ছাড়া সরকারি আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া শরিয়তেও জায়েজ নেই। তবে এই বিনিময়ের মাঝে সুদের লেনদেনও পাওয়া যায় না। আর নাজায়েজ হওয়ার হুকুমও সুদের কারণে নয়।

   যেমন মনে করুন, পাকিস্তানে সরকারিভাবে ডলারের মূল্য ৩০ টাকা

নির্ধারণ করে দেওয়া হলো। এখন দুইজন পরস্পরে ডলার ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন করলো। বিক্রেতা বললো আমি ৩১ টাকার বিনিময়ে ডলার বিক্রয় করবো। এ ক্ষেত্রে এমন লেনদেনকে সুদি লেনদেন তো বলা যাবে না। তবে যেহেতু সরকার ডলারের মূল্য ৩০টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে, আবার সরকারী আইনের যথাযথ মূল্যায়ন করাও জরুরি, তাই এই ভিত্তিতে এই লেনদেন মাকরুহ হয়ে যাবে। যে তারা আইনের বিপরীত কাজ করেছে। তবে সরকার যদি বাজারে মুদ্রা কমবেশি করে বেচাকেনার অনুমতি দেয়, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতেও সেই কারবার জায়েজ বলে গণ্য হবে। যেমনটি আজকাল হচ্ছে।

২. দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, যখন দুই দেশের দুই ভিন্ন মুদ্রার লেনদেন হবে তখন জরুরি হলো, ওই মজলিসেই যে-কোনো একপক্ষ মুদ্রা হস্তগত করবে। চাই দ্বিতীয়পক্ষ ওই সময় হস্তগত করুক অথবা পরবর্তীকালে করুক।

৩. তৃতীয় মূলনীতি হলো, যদি একপক্ষ নগদ আদায় করে আর দ্বিতীয় পক্ষ আদয়ের জন্য সময় নেয়, তাহলে এমতাবস্থায় মুদ্রার যে মূল্য পরস্পরে নির্ধারণ করেছে ওই মূল্য বাজার মূল্য থেকে কমবেশি হতে পারবে না। যেমন : আজ আমি এক হাজার টাকা কাউকে দিলাম এবং তাকে বল্লাম তুমি একমাস পর আমাকে এই পরিমাণ ডলার ফিরিয়ে দেবে। এ ক্ষেত্রে ডলারের যে মূল্য নির্ধারণ করা হবে, তা ডলারের বাজার মূল্য থেকে কমবেশি হতে পারবে না। কারণ, যদি বাজার মূল্য থেকে কমবেশি মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে সুদের দরজা খুলে যাবে এবং অনায়াসে সুদ খাওয়া সম্ভব হবে। যেমন : আমি তাকে বল্লাম, বাজারে তো ডলারের মূল্য ৩০ টাকা। সে হিসাবে এক হাজার টাকার আনুমানিক মূল্য দাঁড়ায় ৩৩ ডলার। তবে আমি তোমার থেকে একমাস পর চলিলশ ডলার নেবো। স্পষ্ট যে, এ জাতীয় লেনদেন শরিয়ত-সম্মত নয়। কারণ, এভাবে সুদের লেনদেন সহজ হয়ে যাবে এবং সুদের দরজা খুলে যাবে।

উপরোক্ত তিনটি মূলনীতি বা শর্তাবলির অনুগামী হওয়া ওই সময় জরুরি, যখন বাস্তবেই মুদ্রার বেচাকেনা হবে। তবে যদি বাস্তবে বেচাকেনা না হয়, বরং শুধু বিক্রয়ের প্রতিশ্রুতি হয় অর্থাৎ, দুই পক্ষ পরস্পরে এই ওয়াদা করে যে, আগামী অমুক তারিখে আমরা পাকিস্তানি টাকা ডলার দিয়ে বিনিময় করবো। ওয়াদার সময় না সে মুদ্রা প্রদান করেছে আর না ওই ব্যক্তি পাকিস্তানি টাকা হস্তান্তর করেছে। এ

অবস্থায় উল্লিখিত মূলনীতি ও শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে না। তাই ওই সময় জরুরি নয়, কোনো এক পক্ষ ওই মজলিসেই নগদ আদায় করবে। আবার এটিও জরুরি নয় যে, পরস্পরে যে মূল্য নির্ধারণ করেছে বাজার মূল্য থেকে তা কমবেশি হতে পারবে না। বরং ওয়াদার সময় পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে যে মূল্য নির্ধারণ করতে চায় তা করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, বেচাকেনার প্রতিশ্রুতি হওয়া; বাস্তবে বেচাকেনা না হওয়া। কারণ, বাস্তবে বেচাকেনার সময় যেহেতু এক পক্ষ থেকে ওই সময়ই আদায় পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় পক্ষ থেকে ঋণ হয়ে থাকে, তাই বাজার মূল্য থেকে কমবেশি মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। অতএব, আমি যদি অন্যকারও সঙ্গে এ জাতীয় লেনদেন করি যে, অমুক তারিখে এই পরিমাণ ডলার ক্রয় করবো এ পরিমাণ টাকার বিনিময়ে, তাহলে পরস্পরের সম্মতিতে যে-কোনো রেট নির্ধারণের সুযোগ ইসলামে রয়েছে। কারণ, তা হলো বিক্রয়ের ওয়াদা মাত্র, প্রকৃত বেচাকেনা নয়। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোনো পার্টি শুধু বিক্রয়ের ওয়াদার ভিত্তিতে 'ফি' বা 'চার্জ' নিতে পারবে না। যেমন : কোনো পক্ষ এ কথা বলতে পারবে না যে, আমি যেহেতু তোমার সঙ্গে ওয়াদা করেছি, অমুক তারিখে এই রেটে এ পরিমাণ ডলার প্রদান করবো, তাই ওই ওয়াদার ভিত্তিতে এ পরিমাণ 'ফি' তোমার কাছ থেকে উসুল করবো—চাই ওই তারিখে তুমি আমার থেকে ডলার ক্রয় কর বা না কর। এ জাতীয় 'ফি' আদায় করা শরিয়তে জায়েজ নেই। তবে ডলারের যে রেটই নির্ধারণ করতে চায় করতে পারবে। মোটকথা! মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে এই হলো কয়েকটি মূলনীতি যার বিবরণ পেশ করা হলো।

ফরেন এক্সচেঞ্জ বুকিং ফি

এখন আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসছি। 'ফরেন এক্সচেঞ্জ'-এর বুকিং বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, যে ব্যাংক 'ফরেন এক্সচেঞ্জ'-এর বুকিং করে, সে ব্যাংক বুকিং-এর জন্য আলাদাভাবে ফি উসুল করে। বুকিং ফি যদি পৃথকভাবে উসুল করা হয় তাহলে এ জাতীয় লেনদেন শরিয়ত-সম্মত হবে না। তবে ব্যাংক যদি পৃথকভাবে বুকিং ফি আদায় না করে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ডলারের মূল্য নির্ধারণ করে, তাহলে এটি জরুরি নয় যে, ওই রেট বাজারদর অনুযায়ী হতে হবে (বরং কমবেশিও করা যাবে) আর

এই বুকিং যেহেতু ওয়াদার ভিত্তিতে হয় তাই তা জায়েজ হবে। তবে শর্ত হলো তাতে অন্য কোনো প্রকার অবৈধ শর্ত আরোপ করা যাবে না।

এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন এই যে, আমাদের পাকিস্তানে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ'-এর বুকিং-এর ক্ষেত্রে ফি আদায় করা হয় কি না? এ বিষয়ে আমি অনেক বিপরীত তথ্য পেয়েছি। কোনো কোনো লোক বলেন, ফি আদায় করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, কোনো ফি আদায় করা হয় না। এ বিষয়ে আমার কাছে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি শরয়ি বিধান বলে দিয়েছি যে, যদি ফি আদায় করা হয়, তাহলে এই বুকিং বৈধ নয়, আর যদি আদায় করা না হয়, তাহলে এই বুকিং বৈধ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, বুকিং দেওয়ার পর নির্ধারিত তারিখে যদি গ্রাহক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন না করে, তাহলে ব্যাংক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে? যেমন : ধরে নেওয়া যাক যে, আমি তিন দিনের পরবর্তী তারিখের জন্য 'ফরেন এক্সচেঞ্জ' বুকিং দিয়েছি। তবে তারিখ আসার পরও আমি ব্যাংক থেকে ওই বৈদেশিক মুদ্রা উসুল করতে পারিনি, তাহলে কি ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমার ওপর কোনো ধরনের জরিমানা আরোপ করা হবে? এ বিষয়েও আমার কাছে সঠিক কোনো তথ্য নেই। কারণ, এ বিষয়ে আমার কাছে অনেক বিপরীতমুখী প্রমাণ এসেছে।

যেমন : এক ব্যক্তি এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আজকাল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা একচেঞ্জ করার জন্য বিভিন্ন মেয়াদের ভিত্তিতে ফরওয়ার্ড বুকিংয়ের বিভিন্ন রেট নির্ধারণ করে থাকে। এরপর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত রেট এর ওপর অন্যান্য সকল ব্যাংক এগ্রিমেন্ট টু সেলও করে থাকে এবং প্রকৃত বেচাকেনাও করে থাকে। যেমন এক ব্যক্তি ব্যাংকে গিয়ে বলল, আমি তিন মাসের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার বুকিং দিতে চাই। তখন রাষ্ট্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত রেটের ওপর ওই ব্যাংক বুক করে দেবে। এখন যদি ওই ব্যক্তি কোনো এক সময় ব্যাংকে গিয়ে বলে, আমি আমার বুকিং ক্যান্সেল করতে চাই। তখন ব্যাংক দেখবে আজকের রেট কত? সেই রেট সামনে রেখে ব্যাংক দেখবে যে, বুকিং ক্যান্সেল করলে ব্যাংকের লাভ হবে না লোকসান হবে? যদি ব্যাংকের লাভ হয়, তাহলে ব্যাংক চুপ থেকে সেই বুকিং ক্যান্সেল করে দেবে। তবে যদি ব্যাংকের ক্ষতি অনুভব হয়, আর পার্টির লাভ হয় তাহলে ব্যাংক ওই ব্যক্তিকে বলে, আপনার বুকিং ক্যান্সেল করার কারণে ব্যাংকের এত টাকা লোকসান হয়েছে। অতএব আপনি এখন এই টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করুন।

অবশ্য বুকিং-এর সময় কোনো চার্জ বা এ জাতীয় কোনো কিছু নেওয়া হয় না। আর এই বুকিং শুধু এক প্রকার বিক্রয়ের ওয়াদা মাত্র।

মোটকথা রপ্তানি বিষয়ে যেসব প্রয়োজনীয় বিধান ছিলো; আমি তা আপনাদের কাছে পেশ করলাম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এসব বিধানের ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

আলোচনার শেষে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছিলো। শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। নিচে তা তুলে ধরা হলো।

১. একজনের সঙ্গে বিক্রির অঙ্গীকার করে অন্য জনের সঙ্গে বিক্রয়-চুক্তি করা

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, যদি পোস্ট শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিংকে শরিয়ত-সম্মত করতে হয়, তাহলে এর পদ্ধতি হলো, যখন রপ্তানিকারক অর্ডার পাবে তখন সে আমদানিকারকের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট টু সেল অর্থাৎ, বিক্রয়ের ওয়াদা করে নেবে। তারপর রপ্তানিকারক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এলসি থেকে কম মূল্যে ওই পণ্য বিক্রয় করে দেবে। পরবর্তীকালে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমদানিকারকের কাছে এলসি-এর সমমূল্যে বিক্রয় করে দেবে। এখন প্রশ্ন হলো, এ বিষয়টি কি শরিয়ত বিরোধী হবে না যে, একদিকে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট টু সেল করছে। আর অপরদিকে ওই পণ্যই ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করছে?

উত্তর : আমি আগেই বলেছিলাম, আমদানিকারকের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত প্রকৃত কেনাবেচা হয়নি। বরং এখন শুধু কেনাবেচার অঙ্গীকার হয়েছে। আর

এদিকে রপ্তানিকারকের জরুরি ভিত্তিতে টাকার প্রয়োজন হয়েছে। তাই সে ব্যাংকে গিয়ে বলবে, আমার এই পণ্য আমদানিকারকের কাছে আমি বিক্রয়ের পরিবর্তে আপনি আমার থেকে নগদে কিনে আমাদানিকারকের কাছে বিক্রয় করে দিন। আমদানিকারকের সঙ্গে যেহেতু প্রকৃত বেচাকেনা হয়নি, বরং বিক্রয়ের অঙ্গীকার হয়েছে। আর এদিকে আমদানিকারকের পণ্যের প্রয়োজন। এখন সেই পণ্য তাকে যে কেউ প্রদান করলেই হলো। কারণ, রপ্তানিকারক নিজের এগ্রিমেন্ট টু সেল ব্যাংকের দিকে স্থানান্তরিত করে দিয়েছে। এতে আমদানিকারকের কোনো ক্ষতি নেই। তাই এ পদ্ধতিতে বেচাকেনা হলে শরয়িভাবেও কোনো সমস্যা থাকে না।

এমনিভাবে এটিও সম্ভব যে, ব্যাংক আমদানিকারককে বলবে, আগের এগ্রিমেন্ট টু সেল খতম হয়ে গিয়েছে। এখন আমার সঙ্গে নতুন চুক্তি করুন। তারপর ব্যাংক সেই চুক্তি অনুযায়ী পণ্য পাঠিয়ে দিলে—এ পদ্ধতিও জায়েজ।

২. প্রত্যাহারকৃত শুল্কের প্রকৃত মালিক কে?

প্রশ্ন : যদি রপ্তানিকারক বহির্বিশ্ব থেকে পণ্য পাঠানোর অর্ডার পায়, আর সে ওই অর্ডার ব্যাংকের কাছে এভাবে স্থানান্তর করে দেয় যে, এই পণ্য তুমি আমদানিকারকের কাছে বিক্রয় করে দাও। এখন কথা হল, ব্যাংক যেহেতু সাধারণত নিজে লেনদেন করে না, বরং এজেন্টের মাধ্যমে লেনদেন করে থাকে, তাই ব্যাংক রপ্তানিকারককেই নিজের এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করে বললো যে, তুমি আমাদের পক্ষ থেকে আমদানিকারকের কাছে পণ্য পাঠিয়ে দাও। এখন প্রশ্ন হলো এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রত্যাহারকৃত শুল্কের হকদার কে হবে? ব্যাংক না রপ্তানিকারক?

উত্তর : এখানে দুটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন—

অর্ডার কে ব্যাংকের কাছে স্থানান্তর করা।

ব্যাংক কর্তৃক ওই পণ্য বিক্রয় করা।

মূলত অর্ডার স্থানান্তর করার বিষয়টি শরিয়তে বৈধ নয়। তবে এটি করতে পারে যে, রপ্তানিকারক ওই পণ্য প্রথমে ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করে দেবে। তারপর ব্যাংক ওই পণ্য আমদানিকারকের কাছে বিক্রয় করে দেবে। এ

পদ্ধতিতে ব্যাংক যেহেতু বিক্রয়কারী, তাই বিক্রির যাবতীয় দায়িত্ব ব্যাংকের জিম্মায় আসবে। যদি কোনো ওয়ারেন্টি থাকে, তাহলে তা ব্যাংকেরই দায়িত্বে থাকবে।

রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত শুল্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকার আছে। সে যদি চায়, তাহলে ওই ব্যক্তিকে দিতে পারে যে বহির্বিশ্ব থেকে অর্ডার গ্রহণ করেছে তারপর পণ্য তৈরি করেছে। কিন্তু কোনো অপারগতার কারণে পণ্য পাঠাতে পারেনি। ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছে ফলে ব্যাংক সেই পণ্য আমদানিকারকের কাছে সাপ্লাই করে দিয়েছে, আবার রাষ্ট্র চাইলে তা ব্যাংককেও দিয়ে দিতে পারে। কারণ, এ ক্ষেত্রে পণ্য সাপ্লাইকারী মূলত ব্যাংক, আর ওই ব্যক্তি শুধু ব্যাংকের এজেন্ট।

৩. আমদানিকারকের সম্মতি কি জরুরি?

প্রশ্ন : যদি রপ্তানিকারক সেই অর্ডারকে ব্যাংকের দিকে স্থানান্তরিত করে দিতে চায়, তাহলে এ অবস্থায় আমদানিকারকের সম্মতি জরুরি কি না?

উত্তর : নিঃসন্দেহে তার সম্মতি জরুরি। সুতরাং যদি আমদানিকারক এ জাতীয় স্থানান্তরের ব্যাপারে উৎসাহী না হয়, তাহলে রপ্তানিকারক নিজের এগ্রিমেন্ট চুক্তিকে রহিত করে দেবে। তারপর ব্যাংক আমদানিকারকের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র চুক্তি করে পণ্য পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

৪. দোকানদার সুদে ঋণ গ্রহণকারীর কাছে পণ্য বিক্রয় করতে পারবে কি?

প্রশ্ন : যদি রপ্তানিকারক পণ্য সরবরাহ করার জন্য ব্যাংক থেকে সুদের ওপর ঋণ গ্রহণ করে। আর সেই টাকা দিয়ে দোকানদার থেকে পণ্য ক্রয় করতে আসে। দোকানদারও জানে যে, সে সুদের ওপর ঋণ গ্রহণ করেছে। এখন দোকানদার তার কাছে পণ্য বিক্রয় করতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি সুদের ওপর নেওয়া ঋণ দিয়ে দোকানদার থেকে পণ্য ক্রয় করতে আসে, আর দোকানদারেরও সেই বিষয়টি জানা

থাকে। এমতাবস্থায়ও তার কাছে পণ্য বিক্রয় করলে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো গুনাহ হবে না। কারণ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি সুদের ওপর ঋণ গ্রহণ করে তখন বাস্তবিক অর্থে সে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করে। এমনকি এটি এত বড়ো অপরাধ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধে নামার নামান্তর। তবে যে টাকা ঋণ হিসেবে তার হস্তগত হয়েছে; সে টাকা দিয়ে কোনো জিনিস ক্রয় করলে বিক্রেতার ওপর সেই গুনাহের প্রভাব পড়বে না। অতএব, দোকানদার তার কাছে পণ্য বিক্রয় করতে পারবে।

৫. পণ্যের কাগজপত্র বেচাকেনা বৈধ কি না?

প্রশ্ন : পণ্যের কাগজপত্র বেচাকেনা বৈধ কি না?

উত্তর : শুধু ডকুমেন্ট-এর কাগজপত্র বেচাকেনা করা বৈধ নয়। তবে যেসব পণ্যের কাগজপত্র বিক্রয় করা হয় সেসব পণ্যকে যদি এভাবে বিক্রয় করে যে, তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ক্রেতার জিম্মায় চলে যাবে; তাহলে এ পদ্ধতিতে বেচাকেনা করা বৈধ। শুধু কাগজপত্র স্থানান্তরের শরয়ি কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

৬. ব্যাংকের জন্য কি সরাসরি ব্যাবসার অনুমতি রয়েছে?

প্রশ্ন : ব্যাংকের জন্য সরাসরি বেচাকেনার কোনো অনুমতি নেই। ব্যাংক শুধু অর্থায়ন করতে পারে। সুতরাং যে পদ্ধতি আপনি ইতোপূর্বে বর্ণনা করে এসেছেন যে, রপ্তানিকারক পণ্য প্রথমে ব্যাংকের কাছে বিক্রয় করবে। তারপর ব্যাংক আমদানিকারকের কাছে তা বিক্রয় করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে ব্যাংক কেনাবেচা করছে। প্রশ্ন হলো, ব্যাংক কীভাবে কেনাবেচা করতে পারে?

উত্তর : আমাদের বিদ্যমান আইনে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। একদিকে তো আইন বলছে ব্যাংক ব্যাবসা করতে পারবে না। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে সাধারণ ব্যাংককে যেসব পদ্ধতির (মুড অফ ফাইন্যান্সিং (অর্থ বিনিয়োগ)-এর) অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাতে ট্রেড রিলেটেড মুড (ব্যবসায়ীক ধারা) বিদ্যমান।

এর মধ্যে পরিষ্কার ভাষায় ব্যাবসা শব্দ উল্লেখ রয়েছে। যেমন মুরাবাহা ট্রেড রিলেটেড এমনিভাবে মার্কআপও মূলত ট্রেড রিলেটেড। অতএব, এখানে একদিকে ট্রেড রিলেটেড মুড-এর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে; আবার অপরদিকে বলা হচ্ছে যে, ব্যাংক ব্যাবসা করতে পারবে না। সুতরাং এখানে বৈপরীত্য বিদ্যমান। তাই এই বিষয়টি কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছানো দরকার। তারপর কোর্টই সিদ্ধান্ত নেবে যে, এই বৈপরীত্য কীভাবে দূর করবে? তবে আমার অভিমত হলো, ব্যাংকগুলোর ট্রেডিংয়ের অনুমতি থাকা উচিত। যাতে করে ব্যাংকগুলো সুদি লেনদেন ধীরে ধীরে হ্রাস করতে পারে।[২৫]

৭. এজেন্টের সার্টিফিকেট জারি করার মাধ্যমে কি মালের দায়-দায়িত্ব স্থানান্তরিত হবে?

প্রশ্ন : সাধারণভাবে ভিনদেশীয় ক্রেতাদের এজেন্ট আমাদের নিজ দেশেই অবস্থান করে। তাদের কাজ পণ্য দেখাশোনা করা এবং এ বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা যে, পণ্যটি তৈরির কোন স্তরে আছে। যখন পণ্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন এজেন্ট এ মর্মে একটি সার্টিফিকেট জারি করে যে, এই পণ্যগুলো সম্পূর্ণ ঠিক আছে, রপ্তানি করা যেতে পারে। এরপর রাপ্তানিকারক আমদানিকারকের কাছে মাল পাঠিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, এজেন্ট সার্টিফিকেট জারি করার পর আমদানিকারকের দিকে মালের ক্ষয়ক্ষতির দায়-দায়িত্ব স্থানান্তরিত হবে কি না?

উত্তর : যদি সেই এজেন্টের ডেলিভারি গ্রহণেরও অধিকার থাকে, তাহলে ওই পণ্যের দায়িত্ব সেসময়ই স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। তবে যদি সেই এজেন্ট শুধু পণ্য চেক করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, পণ্যের ওপর দখল বা পণ্য পাঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত না হয়; তাহলে এমতাবস্থায় শুধু সার্টিফিকেট জারি করার কারণে তার প্রতি মালের ক্ষয়ক্ষতির দায়-দায়িত্ব স্থানান্তরিত হবে না।

---

[২৫] এ নিয়ম অনেক আগে পকিস্তানে প্রচলিত ছিলো। এখন সেখানে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন غير سودي بنكاري পৃষ্ঠা : ৩৫৭।

৮. রপ্তানির ক্ষেত্রে বীমা বাধ্যতামূলক হলে করণীয় কী?

প্রশ্ন : পণ্য রপ্তানি করার ক্ষেত্রে একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো, ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে, তুমি প্রথমে পণ্যের বীমা করে নাও। তারপর পণ্য পাঠাও। অথচ বীমা করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এখন আমরা কীভাবে বীমা ছাড়া পণ্য পাঠাব?

উত্তর : বীমার ব্যাপারে মাসআলা হলো, বর্তমানে আমাদের দেশে বীমার যতগুলো পদ্ধতি চালু আছে, এর সবগুলোতেই সুদ ও জুয়ার সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত না হবে যা নাজায়েজ লেনদেন থেকে মুক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স করা বা করানো শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ হবে না। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, মানুষ মনে করে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া ব্যাবসা করা বা এ জাতীয় কোনো কাজ করা যাবে না। অথচ এই ধারণা আদৌ সঠিক নয়। রপ্তানি-কার্যক্রমে যদি F.O.B কিংবা C.and.F পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ জাতীয় লেনদেন অতি সহজ। কারণ, এই উভয় অবস্থায় ইন্সুরেন্স করানো, এক্সপোর্টারের দায়িত্বে নেই। বরং পণ্যকে শিপিং কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করার পরই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। আর ইন্স্যুরেন্স করানো আমদানিকারকের দায়িত্বে চলে যায়। শুধু CIF পদ্ধতিতে রফতানিকারককে ইন্স্যুরেন্স-এর দায়িত্ব নিতে হয়। তাই যে মুসলিম ব্যবসায়ী রপ্তানি-কার্যক্রম পরিচালনা করে তার জন্য উচিত হলো, সে যেন সি.আই.এফ. পদ্ধতিতে লেনদেন না করে; বরং এফ.ও.বি. বা সি.এন্ড.এফ. পদ্ধতিতে লেনদেন করে। যাতে ইন্সুরেন্স করানোর দায়িত্ব তার ওপর না আসে।

৯. পণ্য বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় প্রকৃত বেচাকেনার বিধান

প্রশ্ন : আপনি যেমনটি বলেছেন, রপ্তানিকারক যখন (পণ্য হস্তগত না থাকা অবস্থায়) আমদানিকারকের সঙ্গে লেনদেন করবে তখন এগ্রিমেন্ট টু সেল করে নেবে, বাস্তবে সেল করবে না। এরপর যখন আমদানিকারকের কাছে পণ্য পাঠিয়ে দেবে তখন বাস্তবে সেল হয়ে যাবে। তবে আজকাল সাধারণভাবে যে সকল লেনদেন হয়, তার সবগুলোতেই প্রথমেই বাস্তবে সেল করা হয়ে থাকে অথচ তখনো পর্যন্ত পণ্য হস্তগত হওয়া তো দূরের কথা

পণ্য অস্তিত্বেই আসেনি। এখন প্রশ্ন হলো, পণ্য হাতে নেই এমতাবস্থায় এ জাতীয় লেনদেন শরিয়তে জায়েজ কি না?

উত্তর : ইতোপূর্বে আমি আলোচনা করেছিলাম, যদি পণ্য বিদ্যমান না থাকে, বরং তা নিজে প্রস্তুত করতে হবে বা প্রস্তুত করানো লাগবে অথবা তা ক্রয় করা লাগবে, তাহলে এমতাবস্থায় প্রকৃত সেল শুদ্ধ হবে না; বরং এগ্রিমেন্ট টু সেল করতে হবে। তবে এ বিষয়ে ক্রেতা যদিও মনে করে যে, আমি নিশ্চিতভাবে লেনদেন করছি সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে আপনার পক্ষ থেকে বিক্রয়ের অঙ্গীকার চূড়ান্ত হয়েছে।

১০. কোটা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

প্রশ্ন : রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রপ্তানি করার একটি কোটা কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট থাকে। যেমন : অমুক কোম্পানি এ পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। এখন প্রশ্ন হলো, এক ব্যক্তি পণ্য রপ্তানি করতে চাচ্ছে। তবে তার কাছে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোটা বরাদ্দ নেই (অর্থাৎ, রাষ্ট্রকর্তৃক রপ্তানি-কার্যক্রমের অনুমতি নেই)। এখন যদি অন্য কোম্পানির কোটা খরিদ করে পণ্য পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার এই কোটা খরিদ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ হবে কি না?

উত্তর : কোটা একটি আইনগত অধিকার। যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা ক্রয়-বিক্রয় করার ওপর কোনো বিধিনিষেধ না থাকে, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতেও তা বেচাকেনা করা জায়েজ হবে। তবে এ থেকে এমনটি মনে করা যাবে না যে, সব ধরনের স্বত্বের বেচাকেনাই শরিয়ত-সম্মত। বরং তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কোনো কোনো স্বত্ব বেচাকেনা করা বৈধ। আবার কোনো কোনো স্বত্ব বেচাকেনা করা অবৈধ। বিষয়টি ফিকহি মাকালাত : প্রথম খন্ডে 'হকের কেনাবেচা' শিরোনামে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

১১. ফটো সম্বলিত গার্মেন্টস-পণ্য সরবরাহ করার বিধান

প্রশ্ন : অনেক সময় বহির্বিশ্ব থেকে অর্ডার আসে যে, অমুক প্রকারের শার্টে এমন ছবি যুক্ত করে আমাদের কাছে সরবরাহ করতে হবে। অথচ ওই সকল

ছবিতে স্পষ্ট উলঙ্গপনা বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন হলো এ জাতীয় অর্ডার গ্রহণ করা এবং এমন পণ্য প্রস্তুত করে বিদেশে রপ্তানি করা জায়েজ হবে কি না?

উত্তর : এ জাতীয় অর্ডার গ্রহণ করে পণ্য সরবরাহ করা শরিয়তে জায়েজ নেই।

১২. ইংরেজদের পোশাক সরবরাহ করার বিধান

প্রশ্ন : অনেক সময় লেডিস শার্ট, ব্লাউজ, শর্ট কামিজ ইত্যাদির অর্ডার আসে। এগুলো সাধারণত ইংরেজরা পরে থাকে। প্রশ্ন হলো, এ জাতীয় অর্ডার গ্রহণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো: যদি কোনো বস্তু বা পোশাক এমন হয়, যার বৈধ ব্যবহারও হতে পারে, আবার অবৈধ ব্যবহারও হতে পারে, তাহলে এমন পোষাক ও বস্তুর কেনাবেচা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ আছে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি সেই পোশাক খরিদ করে অবৈধ পন্থায় ব্যবহার করে, তাহলে এর গুনাহের জিম্মাদার সেই ক্রেতা হবে। বিক্রেতা এ গুনাহের জিম্মাদার হবে না। তবে যদি কোনো বস্তু এমন হয় যাকে বৈধভাবে ব্যবহারই করা যায় না, তাহলে এমন জিনিসের কেনাবেচাও নাজায়েজ।

১৩. অক্ষমতার দরুণ বিক্রয়ের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে না পারার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তুলো সাপ্লাই করার জন্য এগ্রিমেন্ট টু সেল করে; তবে সেই বছর তুলোর বাজার মন্দা থাকায় রপ্তানিকারক সাপ্লাই করতে না পারে, তাহলে এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান কী?

উত্তর : উপরে উল্লিখিত অবস্থায় যেহেতু প্রকৃত বেচাকেনা হয়নি, বরং শুধু বিক্রয়ের অঙ্গীকার হয়েছিলো। আর সেলের সময় প্রাকৃতিক বিপদের কারণে বিক্রয়ের অঙ্গীকার পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। এজন্য সে আমদানিকারককে অবহিত করবে যে, এ সমস্যার কারণে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা যাচ্ছে না। অতএব এই অঙ্গীকারকে বাতিল করা হোক। এমতাবস্থায় রপ্তানিকারকেরও কোনো গুনাহ হবে না।

১৪. রপ্তানিকারক যদি নিজ ওয়াদা পূরণ না করে

প্রশ্ন : যদি রপ্তানিকারক ১৫ হাজার তুলোর গাঁইট সাপ্লাই করার ওয়াদা করে এবং তার মূল্যও নির্ধারণ হয়ে যায়। এমনকি ওয়াদা অনুযায়ী ১০ হাজার গাঁইট তুলো সাপ্লাইও করে দেয়। এরপর বাজারে তুলোর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এখন রপ্তানিকারক ভেবে দেখলো যে, আমি যদি আগের মূল্য অনুযায়ী তুলো সাপ্লাই করি, তাহলে মূল্য বৃদ্ধির দরুণ যে অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়া যেত সেটি আর পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে সেই রপ্তানিকারক অবশিষ্ট পাঁচ হাজার গাঁইট তুলো সাপ্লাই স্থগিত করে দেয়। এমতাবস্থায় সরকার তুলো এক্সপোর্ট-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই সুযোগে রপ্তানিকারক সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি আমদানিকারককে জানিয়ে বলে যে, সরকারি এই নিষেধাজ্ঞার কারণে বাকি পাঁচ হাজার গাঁইট এখন পাঠানো সম্ভব নয়। তারপর রপ্তানিকারক বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী পাঁচ হাজার গাঁইট তুলো বাজারে বিক্রয় করে অধিক মুনাফা লাভ করে। যদি সে তা আগের চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানি করতো, তাহলে অত মুনাফা পেতো না। এখন জানার বিষয় হলো, রপ্তানিকারকের এমন বাহানা শরিয়তে ঠিক আছে কি না?

উত্তর : রপ্তানিকারক যদি নিষেধাজ্ঞা জারি করার আগেই তুলো সাপ্লাই করতে পারে, কিন্তু তারপরও মূল্য বৃদ্ধির দরুণ জেনে-শুনেই সাপ্লাই স্থগিত করে দেয়, তাহলে এমতাবস্থায় চুক্তির বিপরীত করার কারণে সে গুনাহগার হবে।

১৫. ব্যাংক যদি পার্টনারশিপে সম্মত না হয়

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে, ডকুমেন্টস-এর ডিসকাউন্টিং শরিয়তে কোনো ভাবেই জায়েজ নেই। তাই রপ্তানি করার জন্য ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্টনারশিপ চুক্তি করে নেবে। কিন্তু সমস্যা হলো, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা পার্টনারশিপ বা মুদারাবা করতে সম্মত হয় না। কারণ, ব্যাংক আমাদের ওপর আস্থা রাখে না, আর আস্থা না রাখার দরুণ সে এভাবে লেনদেন করতে প্রস্তুত নয়। তাহলে করণীয় কী?

উত্তর : এক্সপোর্ট তথা রপ্তানি বিষয়ক লেনদেন পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাতে

পণ্য, মূল্য, এমনকি মুনাফাও মোটামুটি নির্ধারিত থাকে। তাই পার্টনারশিপ চুক্তি করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকার কথা না। তবে তার উদ্দেশ্য খারাপ হলে সেটি ভিন্ন কথা। তবে এ ক্ষেত্রে এটি করা যেতে পারে যে, রপ্তানিকারকেরা ব্যাংকের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে যে, আমরা ব্যাংকের সঙ্গে পার্টনারশিপ ছাড়া অন্যকোনো পদ্ধতিতে লেনদেন করবো না, তাহলে ব্যাংক নিজ গরজেই এই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়ার বিধান ও চার ইমামের মাজহাবের তাহকিক

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়ার বিধান ও চার ইমামের মাজহাবের তাহকিক' এ প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অনুরোধে প্রথমে ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিনি এই প্রবন্ধটিকে উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করে দেন।

—আবদুল্লাহ মায়মান

আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়ার বিধান ও চার ইমামের মাজহাবের তাহকিক

প্রশ্ন : ১. আমেরিকার অনেক স্থানে জুমার আগে ইংরেজি ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে ওলামায়ে দেওবন্দ আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়াকে নাজায়েজ বলেন। কিন্তু এখানে কিছু আরব আলেম তা জায়েজ হওয়ার পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেন। যখন এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়; তখন তারা বলে থাকে, যদিও হানাফি মাজহাবে আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু অন্যান্য মাজহাব অনুযায়ী তা জায়েজ। তাই আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন হলো, চার ইমামের মাঝে কোনো ইমাম কি আরবি ছাড়া স্থানীয় অন্য কোনো ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়াকে জায়েজ বলে ফতোয়া প্রদান করেন?

প্রশ্ন : ২. আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চল এমনও রয়েছে; যেখানে এমন কোনো মসজিদ নেই যাতে, জুমার খুতবা আরবি ভাষায় দেওয়া হয়। অর্থাৎ, সেখানকার সকল মসজিদেই ইংরেজি ভাষায় খুতবা দেওয়া হয়। তাই বাধ্য হয়ে সে সকল মসজিদে যেতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এমন মসজিদে জুমার নামাজ পড়া বৈধ হবে কি না? ইংরেজি খুতবার পর জুমার নামাজ সহিহ হবে কি না?

এ প্রশ্নটি এই কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের যে সকল মহান ব্যক্তি এ বিষয়ে

কোনো পুস্তক বা ফতোয়া লিখেছেন, তাঁরা সবাই এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, যেভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় কেরাত পড়া জায়েজ হওয়ার অভিমত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন; ঠিক তেমনিভাবে আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়া বৈধ হওয়ার অভিমতও তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।১

এ থেকে বোঝা যায়, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সর্বশেষ অভিমত অনুযায়ী আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কেরাত পড়ার মাধ্যমে নামাজ সহিহ হবে না। (অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের অভিমতও তাই।) সুতরাং আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়া কীভাবে বৈধ হবে? যখন খুতবা সহিহ হলো না, তখন তো নামাজও সহিহ না হওয়া উচিত। কারণ, খুতবা ছাড়া জুমা জায়েজ নেই। এ মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে চাই।

উত্তর : এমন দাবি করা ভুল যে, হানাফি মাজহাব ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ বলেছেন। এ ক্ষেত্রে সত্য হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. ছাড়া অন্যান্য ইমামগণ এ ব্যাপারে আরও কঠোর। মালিকি, শাফিয়ি এবং হাম্বালি মাজহাবের সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, আরবি ভাষায় পারদর্শী থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন কোনো ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ নেই। অনারবি ভাষায় খুতবা দিয়ে জুমার নামাজ আদায় সহিহও হবে না। এমনকি মালিকি মাজহাবের অনুসারীরা এমনও বলেন, জুমায় অংশগ্রহণকারী মুসল্লিদের মাঝে যদি এমন কোনো ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকে, যিনি আরবি ভাষায় পারদর্শী, তাহলে সবার থেকে জুমার নামাজ রহিত হয়ে যাবে। জুমার স্থানে জোহরের নামাজ পড়তে হবে। তবে শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবে এতটুকু সুযোগ আছে যে, যদি জুমার মজলিসে আরবি ভাষায়[২৬]

খুতবা দিতে সক্ষম এমন কোনো ব্যক্তি না থাকে কিংবা শিখতে পারে এতটুকু সময়ও না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ এবং গ্রহণযোগ্য। এ অবস্থায় সবার জুমার নামাজ সহিহ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিন মাজহাবের কিতাবগুলো থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো।

---

[২৬] এমদাদুল আহকাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭১২, জাওয়াহিরুল ফিকহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫২।

মালিকি মাজহাব

আল্লামা দাসুকি রহ. লেখেন—

(قَوْلُهُ وَكَوْنُهَا عَرَبِيَّةً) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْجَمَاعَةُ عَجَمًا لَا يَعْرِفُونَ الْعَرَبِيَّةَ فَلَوْ كَانَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُ الْإِتْيَانَ بِالْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً لَمْ يَلْزَمْهُمْ جُمُعَةٌ

'খুতবা আরবি ভাষায় হওয়া শর্ত। চাই সে মজলিসে কোনো আরবি আরবি জানে এমন ব্যক্তি না থাকুক। হাঁ তাদের মাঝে যদি এমন কোনো ব্যক্তি না থাকে যে, আরবিতে খুতবা দিতে পারে, তাহলে তাদের ওপর জুমা-ই ওয়াজিব হবে না।[২৭]

আল্লামা উলাইস মালিকি রহ. বলেন—

(وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) وَكَوْنُهُمَا عَرَبِيَّتَيْنِ وَالْجَهْرُ بِهِمَا. وَلَوْ كَانَ الْجَمَاعَةُ عَجَمًا لَا يَعْرِفُونَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ صُمًّا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِمْ من يُحْسِنُهُمَا عَرَبِيَّتَيْنِ فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بُكْمًا فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ فَالْقُدْرَةُ عَلَى الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ

'জুমার নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নামাজের আগে দুটি খুতবা হওয়া শর্ত। উভয় খুতবা আরবিতে হওয়া এবং উঁচু আওয়াজে হওয়া ওয়াজিব। চাই সেই মজলিসে আরবি জানে এমন ব্যক্তি না থাকুক বা সবাই বধির হোক। হাঁ তবে যদি সেই মজলিসে এমন কোনো ব্যক্তি না থাকে যে উভয় খুতবা আরবিতে দিতে পারে, তাহলে এমন ব্যক্তিদের ওপর জুমার নামাজই ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে সবাই যদি বোবা হয়, তাহলেও জুমার নামাজ ওয়াজিব হবে না। সুতরাং উভয় খুতবা আরবিতে হওয়া জুমার নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত। এই ব্যাখ্যা মালিকি মাজহাবের প্রায় সকল গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।'[২৮]

উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মালিকি মাজহাব অনুযায়ী সর্বাবস্থায় আরবিতে খুতবা হওয়া জরুরি। এমন কি আরবিতে

---

[২৭] শরহুল কাবিরের টিকা, দুসুকি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭৮।

[২৮] জাওহারুল ইকলিল লিল হাত্তাব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৫, আল খিরাশি আলা মুখতাসারিল খলিল, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮, শরহুজ জুরকানি আলা মুখতাসারিল খলিল : ২৫৬।

খুতবা দিতে সক্ষম না হলে তখনো অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ নেই। বরং জুমার স্থানে জোহর নামাজ আদায় করেবে।

শাফিয়ি মাজহাব

আল্লামা রমলি শাফিয়ি রহ. লিখেছেন—

(وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا) أَيْ الْخُطْبَةُ (عَرَبِيَّةً) لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِأَنَّهَا ذِكْرٌ مَفْرُوضٌ فَاشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ،

'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণের অনুসরণ করার নিমিত্তে খুতবা আরবি ভাষায় হওয়া শর্ত। তাছাড়া এটি ফরজ জিকির। তাই তার জন্যে আরবি হওয়া শর্ত। যেমন : নামাযের তাকবিরে তাহরিমা আরবি হওয়া শর্ত।'[২৯]

আর আল্লামা শিরওয়ানি রহ. লিখেছেন—

(ويشترط كونها) اى الأركان دون ماعداها (عربية) للاتباع نعم إن لم يكن فيهم من يحسنها ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم وإن أمكن تعلمها وجب على كل منهم ، فان مضت مدة إمكان تعلم واحد منهم ولم يتعلموا عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر

'খুতবার রোকনগুলো আরবি ভাষায় হওয়া শর্ত। যাতে পূর্বসূরিদের অনুসরণ হয়। হাঁ! তবে যদি উপস্থিত মজলিসে কেউ আরবি ভাষায় খুতবা দিতে না পারে এবং সময় স্বল্পতার দরুণ আরবি খুতবা শেখাও সম্ভব না হয়, তাহলে উপস্থিতদের মাঝে কেউ নিজ ভাষায় খুতবা দিতে পারবে। আর যদি খুতবা শেখা সম্ভব হয়, তাহলে সবার ওপর খুতবা শিখে নেওয়া ওয়াজিব। এমনকি যদি এতটুকু সময় পার হয়ে যায় যে সময়ের মধ্যে কোন একজন খুতবা শিখে নিতে পারে কিন্তু কেউই শিখলো না তাহলে সবাই গুনাহগার হবে, তাদের জুমা শুদ্ধ হবে না। বরং তারা সবাই জোহরের নামাজ আদায় করবে। এই ব্যাখ্যা শাফিয়ি মাজহাবের অন্যান্য গ্রন্থাদিতে ও রয়েছে।'[৩০]

---

[২৯] নিহায়াতুল মোহতাজ ইলা শরহিল মিনহাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৪।

[৩০] হাওয়াশিশ শিরওয়ানি আলা তোহফাতিল মোহতাজ বি শারহিল মিনহাজ, খণ্ড :

আল্লামা বুহুতি রহ. লিখেছেন—

(وَلَا تَصِحُّ الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهَا بِالْعَرَبِيَّةِ (كَقِرَاءَةٍ) فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَقَدَّمَ (وَتَصِحُّ) الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ (مَعَ الْعَجْزِ) عَنْهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْوَعْظُ وَالتَّذْكِيرُ وَحَمْدُ اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخِلَافِ لَفْظِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ دَلِيلُ النُّبُوَّةِ وَعَلَامَةُ الرِّسَالَةِ وَلَا يَحْصُلُ بِالْعَجَمِيَّةِ (غَيْرَ الْقِرَاءَةِ) فَلَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا) أَيْ الْقِرَاءَةِ (وَجَبَ بَدَلُهَا ذِكْرٌ) قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ.

‘আরবি ভাষায় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া শুদ্ধ নয়। যেমন : নামাজে অন্যকোনো ভাষায় কেরাত পড়া জায়েজ নেই। হ্যাঁ! তবে যদি আরবি ভাষায় খুতবা দিতে সক্ষম না হয়, তাহলে অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া সহিহ আছে। কারণ, খুতবা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওয়াজ, নসিহত, আল্লাহর হামদ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা। তবে কুরআন শরিফের ক্ষেত্রে এর বিপরীত। কারণ, তা নবুয়তের প্রমাণ এবং রেসালাতের আলামত। যা কখনো অনারবি ভাষায় অর্জিত হবে না। তাই নামাজে কেরাত আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় জায়েজ নেই। এ জন্যই কেউ যদি আরবি ভাষায় কেরাত পড়তে সক্ষম না হয়, তাহলে (নামাজের সঙ্গে তুলনা করে) তার জন্য কেরাতের স্থানে জিকির ওয়াজিব হয়।’[৩১]_[৩২]

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, তিন ইমামের মাজহাব অনুযায়ী আরবি খুতবা দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া শুধু নাজায়েজই নয়; বরং এমন খুতবার কোনো গ্রহণযোগ্যতাই নেই। আর এমন খুতবার পরে

২, পৃষ্ঠা : ৪৫।বি. দ্র. জাদুল মোহতাজ বি শরহিল মিনহাজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৭-৩২৮, ইয়ানাতুত্তালিবিন আলা হাল্লি আলফাজি ফাতহিল মুইন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮-৬৯, আল গায়াতুল কুসওয়াহ ফি দিরায়াতিল ফতওয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪০।

[৩১] কাশশাফুল কিনা আন মাতনিল ইকনা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭।

[৩২] এই মাসআলাটি ইবনুল মুফলিহ রচিত গ্রন্থ কিতাবুল ফুরু-এ (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৩-১১৪) বর্ণিত আছে।—সম্পাদক

জুমা শুদ্ধ হবে না। তবে শাফিয়ি ও হাম্বালিগণ এ কথা বলেন যে, যদি ওই মজলিসে আরবিতে খুতবা দিতে সক্ষম এমন কোনো ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকে এবং আরবি শেখারও সময় না পায়, তাহলে অন্য ভাষায় খুতবা প্রদান করলে জুমার শর্ত পূরণ করেছে বলে গণ্য হবে এবং সেই খুতবার মাধ্যমে আদায়কৃত জুমা জায়েজ বলে গৃহীত হবে। এমন অভিমতই পোষণ করেন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবের বিশ্লেষণ

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাব বোঝার আগে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝে নিতে হবে। আর তা হলো, সাধারণভাবে মানুষ মনে করে, ইমাম আবু হানিফা রহ. যেমনিভাবে শুরু যুগে নামাজের কিরাত ভিন্ন ভাষায় পড়াকে জায়েজ মনে করতেন, তেমনিভাবে জুমার খুতবার বেলায়ও সেটিকে জায়েজ মনে করতেন। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ. ফারসি ভাষায় কেরাত পড়া জায়েজ হওয়ার যে অভিমত দিয়েছেন, তা থেকে পরবর্তীকালে রুজু (প্রত্যাহার) করেছেন। এমনিভাবে অন্য কোনো ভাষায় খুতবা প্রদানের যে অভিমত দিয়েছিলেন তা থেকেও মত প্রত্যাহার করেছেন। তবে বাস্তব কথা হলো এখানে মূলত দুটি মাসআলা পৃথক পৃথক। আর উভয় মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন।

এর মাঝে একটি মাসআলা হলো, নামাজে পবিত্র কুরআনের কেরাত আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় গ্রহণযোগ্য কি না? এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর প্রাথমিক অভিমত ছিলো যদি কোনো ব্যক্তি আরবি ভাষায় দখল থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন কোনো ভাষায় কেরাত পড়ে, তাহলে তা মাকরুহ হবে। তবে এর মাধ্যমে নামাজের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। অপরদিকে ইমাম আবু ইউসুফ রহ., ইমাম মুহাম্মাদ রহ.সহ অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদ বলেন, এমতাবস্থায় নামাজই হবে না। পরবর্তীকালে ইমাম আবু হানিফা রহ. নিজের অভিমত ছেড়ে ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর ও অধিকাংশ ফকিহের অভিমত গ্রহণ করেন। সুতরাং এখন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত হলো, যদি আরবি ভাষায় সক্ষম হয়, তাহলে অনারবি ভাষায় কেরাত পড়লে নামাজই হবে না। এ থেকে পরিষ্কার হলো, এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও

মুহাম্মাদ এবং অধিকাংশ ফকিহের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। এখন এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নামাজে ভিন্ন কোনো ভাষায় কেরাত পড়ার সুযোগ নেই। তারপরও যদি অন্য ভাষায় কেরাত পড়ে, তাহলে নামাজই হবে না।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, নামাজ ছাড়া অন্য কোনো জিকির যেমন তাকবিরে তাহরিমা, রুকু সেজদার তাসবিহ, তাশাহ্হুদ এবং জুমার খুতবা আরবি ছাড়া অন্যকোনো ভাষায় জায়েজ আছে কি না।

এই মাসআলাতেও ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মাঝে মতপার্থক্য ছিলো। ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত ছিলো, আরবি ভাষায় বলতে সক্ষম হলে এ জাতীয় আজকার আরবিতে বলা শর্ত। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি আরবি ভাষায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অন্য ভাষায় এই আজকার আদায় করে, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত ছিলো, আরবি ভাষায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোনো ভাষায় এই আজকার আদায় করা যদিও মাকরুহ, তারপরও যদি কেউ আদায় করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কোনো কোনো আলেম যেমন আল্লামা আইনি রহ.-এর এক উদ্ধৃতি থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. দ্বিতীয় মাসআলার ক্ষেত্রেও ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমত গ্রহণ করেছেন এবং নিজের মত প্রত্যাহার করেছেন। আল্লামা আইনি রহ. লেখেন—

وأما الشروع بالفارسية او القراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله عنه مطلقا وَقَالَا لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَصَحَّ رُجُوعُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - إلَى قَوْلِهِمَا.

'ফারসি ভাষায় নামাজ শুরু করা (অর্থাৎ, ফারসিতে তাকবিরে তাহরিমা বলা) অথবা ফারসি ভাষায় নামাজের কেরাত পড়া ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাছে শর্তহীনভাবে জায়েজ। আর সাহেবাইন রহ. বলেন, অপারগতা ছাড়া জায়েজ নেই। বাকি তিন ইমামের অভিমত এমনই এবং এরই ওপর ফতোয়া। আর ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।[৩৩]

[৩৩] শরহুল আইনি আলাল কানজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২।

এই উদ্ধৃতিতে আল্লামা আইনি রহ. উভয় মাসআলা তথা ফারসি ভাষায় তাকবিরে তাহরিমা বলা এবং ফারসি ভাষায় কেরাত পড়াকে একসঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের প্রতি রুজু করেছিলেন। যার বাহ্যিক অবস্থা এটিই যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. উভয় মাসআলায় রুজু করেছেন। এমদাদুল আহকাম, জাওয়াহিরুল ফিকহ ও আহসানুল ফতোয়াতে জুমার খুতবা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমতের দিকে রুজু করেছেন। হতে পারে এ কথা আল্লামা আইনি রহ. এর উদ্ধৃতির ওপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব হলো, আল্লামা আইনি রহ.-এর এ উদ্ধৃতি ওই বিষয়ে সুস্পষ্ট নয়; বরং তাতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, রুজু-এর সম্পর্ক শুধু কেরাতের মাসআলার সঙ্গে। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. উভয় মাসআলায় তার আগের মত থেকে রুজু করেছেন, তাহলে বলা হবে, আল্লামা আইনি রহ.-এর এ ব্যাপারে 'তাসামুহ' হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. শুধু প্রথম মাসআলা অর্থাৎ, ফারসি ভাষায় কেরাত পড়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে রুজু করেছেন। তবে দ্বিতীয় মাসআলা অর্থাৎ, 'জিকির' আদায় করা অথবা জুমার খুতবা অনারবি ভাষায় দেওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. আগের অভিমত থেকে রুজু করেন নি; বরং কতিপয় আলেম এমন দাবিও করেছেন যে, ওই মাসআলায় বরং সাহেবাইন রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত গ্রহণ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, তাকবিরে তাহরিমা, তাশাহহুদ কিংবা জুমার খুতবা অন্য কোনো ভাষায় দিতে চাইলে এখনো তা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লামা আইনি রহ. ছাড়া অন্যান্য হানাফি ফকিহগণ এ কথাগুলো সুস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং আল্লামা আইনি রহ.-এর দাবি খন্ডন করেছেন। আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি রহ. আদ্দুররুল মুখতারে লিখেছেন—

وَجَعْلُ الْعَيْنِيِّ الشُّرُوعَ كَالْقِرَاءَةِ لَا سَلَفَ لَهُ فِيهِ وَلَا سَنَدَ لَهُ يُقَوِّيهِ، بَلْ جَعَلَهُ فِي التَّاتَارْخَانِيَّة كَالتَّلْبِيَةِ يَجُوزُ اتِّفَاقًا، فَظَاهِرُهُ كَالْمَتْنِ رُجُوعُهُمَا إِلَيْهِ لَا هُوَ إِلَيْهِمَا فَاحْفَظْهُ، فَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْقَاصِرِينَ حَتَّى الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي كُلِّ كُتُبِهِ فَتَنَبَّهْ

'আল্লামা আইনি রহ. নামাজের শুরুতে ফারসিতে তাকবিরে তাহরিমা বলাকে আরবিতে কেরাত পড়ার মতো বলেছেন। ইতোপূর্বে

এই মত আর কেউ দেয়নি এবং এমন কোনো সনদও নেই যা তার মতকে শক্তিশালী করে। বরং ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়াতে তাকবিরে তাহরিমাকে তালবিয়ার মতো বলা হয়েছে যা অন্যকোনো ভাষায় পাঠ করা সবার মতে জায়েজ। এ জন্য তার বাহ্যিক চাহিদা হলো, তানবিরুল আবসারের মতনের মতো। অর্থাৎ, এ মাসআলায় সাহেবাইন রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন নি। এ কথাটি খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখা চাই। কারণ, এ মাসআলায় অনেক অল্প শিক্ষিত লোক সন্দেহে পড়ে আছে। এমনকি আল্লামা শুরুনবুলালি রহ.ও তাঁর সব গ্রন্থে এই সন্দেহের শিকার হয়েছেন।'

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শামি রহ. লেখেন—

(قَوْلُهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِيهِ) أَيْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ، وَإِنَّمَا الْمَنْقُولُ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمَا فِي اشْتِرَاطِ الْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الشُّرُوعِ فَالْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِيهَا بِلَا ذِكْرِ رُجُوعٍ أَصْلًا، وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ كَالْكَنْزِ وَغَيْرِهِ كَالصَّرِيحَةِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ الْعَجْزُ قَيْدًا فِي الْقِرَاءَةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَلَا سَنَدَ لَهُ يُقَوِّيهِ) أَيْ لَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ يُقَوِّي مُدَّعَاهُ لِأَنَّ الْإِمَامَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمَا فِي اشْتِرَاطِ الْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ. لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُنَزَّلِ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْظُومِ هَذَا النَّظْمِ الْخَاصِّ، الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا. وَالْأَعْجَمِيُّ إِنَّمَا يُسَمَّى قُرْآنًا مَجَازًا، وَلِذَا يَصِحُّ نَفْيُ اسْمِ الْقُرْآنِ عَنْهُ فَلِقُوَّةِ دَلِيلِ قَوْلِهِمَا رَجَعَ إِلَيْهِ. أَمَّا الشُّرُوعُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَالدَّلِيلُ فِيهِ لِلْإِمَامِ أَقْوَى، وَهُوَ كَوْنُ الْمَطْلُوبِ فِي الشُّرُوعِ الذِّكْرَ وَالتَّعْظِيمَ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ وَأَيِّ لِسَانٍ كَانَ، نَعَمْ لَفْظُ اللهُ أَكْبَرُ وَاجِبٌ لِلْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ لَا فَرْضٌ

'দুররে মুখতারে যা বলা হয়েছে যে, তাতে আল্লামা আইনি রহ.-এর কোনো সমকক্ষ নেই; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, তাঁর আগে কেউ এ কথা বলেন নি। বরং এ কথা বর্ণিত আছে যে, এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. সাহেবাইন রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন

করেছেন। অর্থাৎ, অপারগতা ছাড়া আরবি ভাষায় কেরাত পড়া শর্ত। তবে অনারবি ভাষায় নামাজ শুরু করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ কিতাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন রহ.-এর মাঝে মতপার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে রুজু করার বিষয়টি উল্লেখ নেই। যেমন : তানবিরুল আবসারের মতন ও কানযুদ্দাকায়িকসহ অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি এ ব্যাপারে প্রায় স্পষ্ট যে, তিনি অপারগতার শর্ত শুধু কেরাতের ক্ষেত্রে বলেছেন। আর দুররে মুখতারের গ্রন্থকার আল্লামা আইনি রহ.-এর বক্তব্যের ব্যাপারে যে বলেছেন, তাঁর কথার এমন কোনো সনদ নেই যা তাকে সুদৃঢ় করবে। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, তার দাবির পক্ষে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা তার দাবিকে সুদৃঢ় করবে। কেরাতের মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে এ কারণে ফিরে এসেছেন যে, ফরজ কেরাত হলো কুরআন। আর কুরআন এমন বাণীর নাম যা আরবি ভাষায় বিশেষ পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে, মাসহাফসমূহে লেখা হয়েছে এবং যুগপরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এ জন্য কোনো অনারবি অনুবাদকে রূপক অর্থে কুরআন বলা হয়। সে জন্যই তার থেকে কুরআন শব্দের বিলুপ্তি সহিহ আছে। সুতরাং ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর দলিল মজবুত থাকায় ইমাম আবু হানিফা রহ. তাদের মতের দিকে রুজু করেছিলেন। তবে ফারসি ভাষায় নামাজ শুরু করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দলিল বেশি শক্তিশালী। আর সেই দলিল হলো, নামাজ শুরু করার অর্থ হলো, আল্লাহর জিকির ও তাঁর সম্মান করা, যা যে-কোনো শব্দে বা যে-কোনো ভাষায় আদায় হতে পারে। হাঁ! তবে 'আল্লাহু আকবার' শব্দটি হুবহু বলা এ জন্য ওয়াজিব যে, এর ওপর রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণ সর্বদা আমল করেছেন। তবে তা ফরজ নয়।'[৩৪]

আল্লামা শামি রহ. প্রায় এ বক্তব্যটিই আল বাহরুর রায়েক-এর টীকায় বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। (মিনহাতুল খালিক আলাল বাহরির রায়িক ১/৩০৭)

আল্লামা আবুস সাউদ হানাফি রহ.ও মোল্লা মিসকিন-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ বক্তব্যকে

[৩৪] আদ-দুররুল মুখতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৭-৩৫৮।

সত্যায়ন করেছেন যে, নামাজ শুরু করা ও অন্যান্য জিকিরের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন নি। এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমতই অধিক নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন—

وقول العيني الفتوى على قول الصاحبين إنه لايصح الشروع بالفارسية إذا كان يحسن العربية . فيه نظر . بل المعتمد فيه قول الامام إن الشروع كنظائره مما اتفقوا عليه ولهذا نقل فى الدر عن التَّاتَارْخَانِيَّة إن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز اتفاقا.

'আল্লামা আইনি রহ.-এর এ বক্তব্যে আপত্তি রয়েছে যে, এ মাসআলায় ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমতের ওপর ফতোয়া। অর্থাৎ, যখন কোনো ব্যক্তি আরবিতে তাকবিরে তাহরিমা বলতে সক্ষম, তখন ফারসি ভাষায় তাকবিরে তাহরিমা বলা শুদ্ধ হবে না। বরং বাস্তবে এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর অভিমত গ্রহণযোগ্য। তাকবিরে তাহরিমা এবং এ জাতীয় বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন একমত। তাই দুররে মুখতারে ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফারসিতে তাকবিরে তাহরিমা বলা তালবিয়ার অনুরুপ, সবার মতেই অন্য কোনো ভাষায় তা আদায় করাও জায়েজ আছে।'[৩৫]

তাছাড়া আল্লামা আবদুল হাই লাখনোবি রহ. লিখেছেন—

وذكر العيني فى شرح الكنز ثم الطرابلسي ثم الشرنبلالي رجوعه فى مسئلة التكبير أيضا إلى قولهما ، وهو خلاف ما عليه عامة الكتب من بقاء الخلاف فى مسئلة التكبير والتلبية والبسملة وغيرها ، وهذا المبحث طويل الذيل ، كم زلت فيه الأقدم وتحيرت فيه الأفهام.

'আল্লামা আইনি রহ. কানজের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তারপরে আল্লামা তারাবলুসি তারপরে আল্লামা শুরুম্বুলালি রহ. উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. তাকবিরে তাহরিমার মাসাআলায় ও ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে রুজু করেছিলেন। তবে এ বিষয়টি অন্যান্য গ্রন্থের বিপরীত। সেখানে তাকবিরে তাহরিমা, তালবিয়া ও

[৩৫] ফাতহুল মুঈন আলা শরহিল কানজি লি মোল্লা মিসকিন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮২)।

বিসমিল্লাহ ইত্যাদির মাঝে ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইন রহ.-এর মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়। এই আলোচনা অনেক দীর্ঘ ও জটিল। না জানি এখানে এসে কত মানুষের পদস্খলন হয়েছে এবং কত বিবেকবান এখানে এসে পেরেশানিতে নিপতিত হয়েছে।'

মাওলানা আবদুল হাই লাখনোবি রহ. এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দলিলসমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে : آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان الفارس

ওই গ্রন্থে তিনি লেখেন—

والحق أنه لم يرو رجوعه فى مسئلة الشروع بل هى على الخلاف فإن أجلة الفقهاء منهم صاحب الهداية وشراحها العينى والسغناقي والبابرتي والمحبوبي وغيرهم وصاحب المجمع وشراحه وصاحب البزازية والمحيط والذخيرة وغيرهم ذكروا رجوعه فى مسئلة القراءة فقط واكتفوا فى مسئلة الشروع بحكاية الخلاف.

'বিশুদ্ধ কথা হলো, তাকবিরে তাহরিমার মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে মতের প্রত্যাহার (রুজু) প্রমাণিত নয়। বরং এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. ও সাহেবাইন রহ.-এর মাঝে এখনো মতপার্থক্য বিদ্যমান। তাই অনেক বড়োবড়ো ফকিহ যেমন হেদায়ার গ্রন্থকার এবং এর ব্যাখ্যাকারদের মাঝে আল্লামা আইনি রহ., আল্লামা সিগনাকি রহ., আল্লামা বাবরতি রহ. আল্লামা মাহবুবি রহ. মাজমা গ্রন্থকার ও তার ব্যাখ্যাকারগণ, বাজ্জাজিয়া, মুহিত ও জখিরার গ্রন্থকারসহ সবাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর রুজু (মত প্রত্যাহার) করার কথা শুধু কেরাতের মাসআলায় উল্লেখ করেছেন। আর নামাজ শুরু করার মাসআলায় তাঁরা শুধু মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।'

আল্লামা লাখনোবি রহ. এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, স্বয়ং আল্লামা আইনি রহ.-এর উদ্ধৃতি এ ব্যাপারে পরিষ্কার নয় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. উভয় মাসআলায় ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বরং তাতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, প্রত্যাহারের সম্পর্ক শুধু কেরাতের ক্ষেত্রে। তাই

এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, তাঁরা উভয় মাসআলায় রুজু করার কথা বর্ণনা করে ভুল করেছেন। তাছাড়া তিনি আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর এ কথারও সমর্থন করেন যে, তাতারখানিয়ার এক উদ্ধৃতি থেকে যারা এ দাবি করেছে; তাকবিরে তাহরিমা ও অন্যান্য জিকির-আজকারের মাসআলায় ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. বরং ইমাম আবু হানিফা-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এ কথাও সঠিক নয়। কারণ, তাতারখানিয়াতে ফারসি ভাষায় তাকবিরে তাহরিমা বলাকে সর্ব সম্মতিক্রমে যে গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। এর দ্বারা তাকবিরে তাহরিমা উদ্দেশ্য নয়, বরং জবাই করার সময়ের তাকবির উদ্দেশ্য। এ জন্য প্রকৃত কথা হলো, তাকবিরে তাহরিমা এবং অন্যান্য জিকির যেমন : নামাজ ও খুতবার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতপার্থক্য বহাল আছে। না ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর না ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।[৩৬]

আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি, আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি, আল্লামা আবুস সাউদ ও আল্লামা আবদুল হাই লাখনোবি রহ.-এর বর্ণনাসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. শুধু কেরাতের মাসআলায় ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাকবিরে তাহরিমা ও অন্যান্য জিকিরের ব্যাপারে প্রত্যাবর্তন করেন নি। এ কারণেই হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য মতন যেমন : কানজ, বিকায়াহ, তানবিরুল আবসার ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে তাকবিরে তাহরিমার মাসআলায় এ কথাই লিখিত আছে যে, তাকবিরে তাহরিমা আরবি ছাড়া অন্য যে-কোনো ভাষায় বলা শুদ্ধ।

যেমন : কানজ এর বর্ণনায় এসছে—

ولو شرع بالتسبيح أو بالتهليل أو بالفارسية صح كما لو قرء بها عاجزا.

'যদি তাসবিহ (سبحان الله) অথবা তাহলিল (لا اله الا الله) কিংবা ফারসি ভাষায় নামাজ শুরু করে, তাহলে তা জায়েজ হবে। যেমনিভাবে অক্ষম হলে অন্য ভাষায় কেরাত পড়া জায়েজ।'[৩৭]

---

[৩৬] আকামুন নাফায়িস : ৭৩।

[৩৭] বাহরুর রায়েক, শরহু কানজুদ্দাকায়েক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০৭।

বিকায়ার ভাষ্য হলো—

فإن أبدل التكبير بالله أجل وأعظم والرحمن أكبر أو لا اله إلا الله أو بالفارسية أو قرأبها بعذر أو ذبح وسمى بها جاز.

'যদি আল্লাহু আকবার-এর পরিবর্তে আল্লাহু আজাল্ল বা আল্লাহু আজম, আর রহমানু আকবার কিংবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অথবা ফারসি ভাষায় এ জাতীয় কিছু বলে অথবা কোনো ওজরবসত ফারসিতে কেরাত পড়ে অথবা এগুলোর মাধ্যমে জবাই করে, তাহলে তা জায়েজ হবে।[৩৮]

তানবিরুল আবসারের ভাষ্য হলো—

وصح شروعه بتسبيح وتهليل كما صح لو شرع بغير عربية أو آمن أو لبى أو سلم أو سمى عند ذبح أو قرأبها عاجزا.

'আর তাসবিহ তথা সুবহানাল্লাহ, তাহলিল তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে নামাজ শুরু করা শুদ্ধ। যেমনিভাবে শুদ্ধ আছে আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় শুরু করা অথবা আমিন বলা কিংবা তালবিয়া বলা, বা সালাম করা অথবা জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ বলা অথবা অক্ষমতার সময় অন্য ভাষায় কেরাত পড়া।'[৩৯]

উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতি সমূহে কেরাতের মাসআলায় ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ফারসি ভাষায় কেরাত পড়ার সুযোগ আছে কেবল অক্ষমতার সময়। তবে তাকবিরে তাহরিমা ও অন্যান্য জিকির আজকারের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমতকে শর্তহীনভাবে সহিহ হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়েছে। এতে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষ থেকে মত প্রত্যাহার করার কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া আল্লামা ফখরুদ্দিন জায়লায়ি রহ. ও তাকবিরে তাহরিমার মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত প্রত্যাহার করার কথা উল্লেখ করেননি। কেরাতের মাসআলায় মত প্রত্যাহার করার কথা বর্ণনা করেছেন।[৪০]

এর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে আল্লামা ইবনু আবিদিনসহ অন্যান্যদের মতের স্বপক্ষে

---

[৩৮] বিকায়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৫।

[৩৯] তানবিরুল আবসার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৮।

[৪০] তাবয়িনুল হাকায়িক লিজ-জায়লায়ি শরহু কানজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১০।

সমর্থন পাওয়া যায়। আর এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত প্রত্যাহার শুধু কেরাতের মাসআলায় প্রমাণিত। তাকবিরে তাহরিমা ও অন্যান্য জিকির-আজকারের ব্যাপারে তিনি নিজ অভিমত থেকে ফিরে আসেন নি। বরং এখনো তাঁর মাজহাব এটিই যে, অনারবি ভাষায় এ জাতীয় জিকির-আজকার আদায় করা জায়েজ আছে।

অপরদিকে এ কথাও পরিষ্কার যে, জুমার নামাজের খুতবা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাছে নামাজে কেরাত পাঠ করার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তাকবিরে তাহরিমা বা অন্যান্য জিকির-আজকারের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাই ফুকাহায়ে কেরাম খুতবার আলোচনা অন্যান্য আজকারের সঙ্গে করেছেন। যেমন : আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. তাকবিরে তাহরিমার মাসআলা বর্ণনা করার পর বলেন—

وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد.

'খুতবা, দুয়ায়ে কুনুত ও তাশাহহুদের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মাঝে মতপার্থক্য আছে। (ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাছে অনারবি ভাষায় এগুলো পড়া গ্রহণযোগ্য। আর ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।'[৪১]

তাছাড়া আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফি রহ.ও তাকবিরে তাহরিমার মাসআলা আলোচনা করার পর লিখেছেন—

وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلوة.

'খুতবা ও নামাজের অন্যান্য জিকির-আজকারের ক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য বিদ্যমান।[৪২]

আল্লামা জায়লায়ি রহ.ও তাকবিরে তাহরিমার মাসআলা আলোচনা করার পর লেখেন—

وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد.

'একই মতপার্থক্য খুতবা, দুয়ায়ে কুনুত ও তাশাহহুদের মাঝে।'[৪৩]

---

[৪১] আল বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০৭।

[৪২] আদ-দুররুল মুখতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৭।

[৪৩] তাবয়িনুল হাকায়েক লিজ-জায়লায়ি শরহু কানজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১০।

তাছাড়া ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়াতেও কেরাতের মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত প্রত্যাহার করার কথা নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৪] কিন্তু খুতবার ব্যাপারে তিনি লিখেছেন—

ولو خطب بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمة الله على كل حال.

'যদি ফারসি ভাষায় খুতবা দেওয়া হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাছে সর্বাবস্থায় জায়েজ।'[৪৫]

তাছাড়া ফারসি ভাষায় তাকবিরে তাহরিমা বলার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মাঝে মতপার্থক্য উল্লেখ করার পর তিনিও লিখেছেন—

والتشهد والخطبة على هذا الاختلاف.

'এই মতবিরোধ খুতবা ও তাশাহহুদের ব্যাপারেও বিদ্যমান।[৪৬]

আর মাওলানা আবদুল হাই লাখনোবি রহ. লিখেছেন—

وفي الهداية وجامع المضمرات والمجتبى وغيرها أن الخطبة على الاختلاف يعني أنه يجوز عند أبي حنيفة بغير العربية للقادر والعاجز كليهما وعندهما لاحدهما.

'হেদায়া, জামিউল মুজমারাত ও মুজতাবাসহ আরও কিছু গ্রন্থে আছে যে, খুতবার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ আছে—চাই সে ব্যক্তি আরবিতে খুতবা দিতে সক্ষম হোক বা না হোক। আর ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে শুধু ওই ব্যক্তির জন্য আরবি ছাড়া ভিন্ন ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ যে আরবি ভাষায় খুতবা দিতে সক্ষম নয়।'[৪৭]

উল্লিখিত সকল আলোচনা-পর্যালোচনা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, জুমার

---

[৪৪] ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৫৭।

[৪৫] ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০।

[৪৬] ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪০।

[৪৭] আকামুন নাফায়েস : ৯১।

খুতবার ব্যাপারে এখনো ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত হলো অনারবি ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়া জায়েজ। এই অভিমত ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রত্যাহার করেন নি এবং হানাফি মাজহাবের মুহাক্কিক ফকিহগণ এর ওপরই ফতোয়া প্রদান করেছেন।

তবে এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাছে আরবি ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমার খুতবা প্রদান করলে সহিহ হবে। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, এর দ্বারা শুধু ওয়াজিব হওয়ার হুকুমটি রহিত হয়ে যাবে। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে এ হিসেবে ওই অনারবি খুতবা গ্রহণযোগ্য হবে যে, জুমা সহিহ হওয়ার শর্ত পূর্ণ হবে এবং এই খুতবা দিয়ে জুমার নামাজ সহিহ হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে বৈধ। বরং বাস্তব হলো, নামাজ এবং এ সম্পর্কীয় যেসব জিকির-আজকারের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন যে, এগুলো আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় গ্রহণযোগ্য হবে। এগুলোর ব্যাপারে এ কথাও পরিষ্কার যে, এ জাতীয় জিকির-আজকার আরবি ছাড়া ভিন্ন ভাষায় আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি অর্থাৎ, নাজায়েজ। সুতরাং যেখানেই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষ থেকে অনারবি ভাষায় এই জিকির-আজকার-কে সহিহ ও গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে; সেখানে পরিষ্কার করে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, অনারবি ভাষায় এ জিকিরগুলো আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি।

যেমন দুররুল মুখতারে এসেছে—

(وَصَحَّ شُرُوعُهُ) أَيْضًا مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ (بِتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ) كَمَا صَحَّ لَوْ شَرَعَ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ.

'সুবহানাল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মাধ্যমে নামাজ শুরু করলে মাকরুহে তাহরিমির সঙ্গে নামাজ আদায় হবে। যেমনিভাবে আরবি ছাড়া ভিন্ন ভাষায় নামাজ শুরু করলে মাকরুহে তাহরিমির সঙ্গে আদায় হয়ে যায়।'[৪৮]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. লিখেছেন—

فَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ وَالذَّخِيرَةِ وَالنِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ

[৪৮] আদ-দুররুল মুখতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৬-৩৫৭।

أَنَّهُ يُكْرَهُ الِافْتِتَاحُ بِغَيْرِ اللهُ أَكْبَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْمُرَادُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ؛ ... فَعَلَى هَذَا يَضْعُفُ مَا صَحَّحَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ.

'তুহফা, জখিরা ও নিহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী আল্লাহু আকবার ছাড়া অন্য কোনো শব্দে নামাজ শুরু করা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাছে মাকরুহ। এখানে মাকরুহ দ্বারা মাকরুহে তাহরিমি উদ্দেশ্য। তাই আল্লামা সারাখসি রহ.-এর এই অভিমত যে, বিশুদ্ধ অভিমতের ভিত্তিতে এই আমল মাকরুহ নয়—এ কথাটি খুবই দুর্বল।'

আর ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

ولو كبر بالفارسية بأن قال: «خدا بزرگ است» جاز عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن العربية إلا أنه إذا كان يحسن العربية لا بد من الكراهة.

'যদি ফারসি ভাষায় তাকবিরে তাহরিমা এভাবে বলে যে, «خدا بزرگ است» তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে নামাজ হয়ে যাবে, চাই সে ভালোভাবে আরবি জানুক বা না জানুক। তবে যদি ভালোভাবে আরবিতে বলার সক্ষমতা সত্ত্বেও ফারসি ভাষায় বলে, তাহলে অবশ্যই তা মাকরুহ হবে।'[৪৯]

এর মাধ্যমে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়ার ব্যাপারে ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়ার যে ভাষ্য ইতোপূর্বে গিয়েছে, সেখানে 'জায়েজ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অনারবি ভাষায় খুতবা দিলে তা মাকরুহের সঙ্গে আদায় হবে। এ উদ্দেশ্য নয় যে, তা নিঃশর্তভাবে জায়েজ।

মাওলানা আবদুল হাই লাখনোবি রহ. লিখেছেন—

والظاهر أن الصحة في هذه المسائل عند أبي حنيفة لا تنتفي الكراهة وقد صرحوا به في مسئلة التكبير.

'পরিষ্কার কথা হলো, এ জাতীয় মাসআলায় (ফারসি ভাষায়

[৪৯] ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪০।

জিকিরগুলো আদায় করা সত্ত্বেও নামাজ) ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে সহিহ হয়ে যাওয়া মাকরুহ হওয়াকে রহিত করে না। তাকবিরের মাসআলায় ফিকহশাস্ত্রবিদগণ এর পরিষ্কার বিবরণও দিয়েছেন।'

আর মাকরুহকে যখন শর্তহীনভাবে বলা হয়, তখন-এর দ্বারা মাকরুহে তাহরিমি উদ্দেশ্য হয়। তাই ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবের সারকথা হলো, এ জাতীয় জিকিরগুলো আরবি ছাড়া ভিন্ন ভাষায় আদায় করা মাকরুহে তাহরিমি অর্থাৎ, নাজায়েজ। এখন যদি কেউ এই নাজায়েজ কাজে লিপ্ত হয়ে অনারবি ভাষায় এ জিকিরগুলো আদায় করে ফেলে, তাহলে তা এ বিবেচনায় শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হবে যে, যদি তা ফরজ জিকির হয়, তাহলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তবে আল্লাহু আকবার শব্দটি বলা যেহেতু ওয়াজিব, তাই ওয়াজিব বর্জন করার ফলে নামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি সেই জিকিরগুলো ওয়াজিব জিকির হয়, যেমন : তাশাহহুদ, দুয়ায়ে কুনুত ইত্যাদি, তাহলে এগুলো আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় আদায় করার দ্বারা ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে; যদিও এর কারণে সুন্নত বর্জনের গুনাহ হবে। সুতরাং জুমার খুতবার ব্যাপারেও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অবস্থান হলো, আরবি ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়া মাকরুহে তাহরিমি অর্থাৎ, নাজায়েজ। তাই মানুষকে এ থেকে বারণ করতে হবে। তবে যদি কেউ এই মাকরুহে তাহরিমিতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এই কাজটি মাকরুহ হওয়া সত্ত্বেও জুমা সহিহ হওয়ার শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে এই খুতবার মাধ্যমে আদায়কৃত জুমা সহিহ বলে গণ্য হবে। যেমনটি মাওলানা আবদুল হাই লাখনোবি রহ. লিখেছেন—

وقد سئلت مرة بعد مرة عن هذه المسئلة ، فأجبت بأنه يجوز عنده مطلقا ، لكن لايخلو عن الكراهة، فعارضنى بعض الاعزة، بأن الخطبة إنما هى لإفهام الحاضرين وتعليم السامعين وهو مفقود فى العربية فى الديار العجمية بالنسبة إلى أكثر الحاضرين . فينبغى أن يجوز مطلقا من غير كراهة، فقلت : الكراهة إنما هى لمخالفة السنة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خطبوا دائما بالعربية . ... وبالجملة فالإحتياج إلى الخطبة بغير العربية لتفهيم أصحاب العجمية كان موجودا فى قرون الثلثة، فلم يرو ذلك من أحد فى تلك الأزمنة وهذا أدل دليل على الكراهة .... وهو لايخلوا إما أن يكون لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع يمنع منه أو لعدم

التنبيه له أو للتكاسل عنه أو لكراهته وعدم مشروعيته، والأولان منتفيان، لأنا قد ذكرنا أن الحاجة فى تلك الأزمنة أيضا إليه كانت موجودة .... ولم يكن مانع يمنع عنه بالكلية، لأنهم كانوا مقتدرين على الألسنة العجمية، وكذا الثالث والرابع أيضا مفقودان، لأنه بعيد فى الأمور الشرعية من النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بل مثله لايظن به لعلماء الشريعة، فكيف بهم، وإذا انتفت الوجوه الخمسة تعينت الكراهة .... فإن قلت فمامعنى قولهم يجوز كذا وكذا قلت : نفس الجواز أمر آخر والجواز بلاكراهة أمر آخر، وأحدهما لايستلزم ثانيهما... وتحقيقه أن فى الخطبة جهتين. الأولى : كونها شرطا لصلاة الجمعة والثانية : كونها فى نفسها عبادة، ولكل منهما وصف على حدة، فمعنى قولهم يجوز الخطبة بالفارسية إنها تكفى لتأدية الشرط وصحة صلاة الجمعة وهو لايستلزم أن يخلو من البدعية والكراهة من حيث الجهة الثانية.

'এ মাসআলার ব্যাপারে আমাকে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে (যে, আরবি ভাষা ছাড়া ভিন্ন কোনো ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়া কি জায়েজ?) আমি জবাব দিয়েছি, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে শর্তহীনভাবে জায়েজ। তবে মাকরুহ থেকে মুক্ত নয়। কোনো কোনো বন্ধু এর ওপর এই প্রশ্ন করেছেন, খুতবার উদ্দেশ্য হলো উপস্থিত শ্রোতাদেরকে বুঝানো এবং শ্রোতাদেরকে শিক্ষা দেওয়া। এখন যদি অনারব দেশে আরবি ভাষায় খুতবা দেওয়া হয়, তাহলে আদৌ খুতবার এই উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। তাই ওইসব দেশে অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরুহ হওয়া ছাড়াই জায়েজ হওয়া উচিত। তখন আমি বল্লাম, মাকরুহ হওয়ার কারণ, হলো সুন্নতের পরিপন্থি হওয়া। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ সর্বদা আরবি ভাষায় খুতবা দিতেন। মোটকথা! ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে অনারবি লোকদেরকে বুঝানোর জন্য অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়ার প্রয়োজন ছিলো। তা সত্ত্বেও এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, ওই যুগে অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া হয়েছে। মাকরুহ হওয়ার জন্য এটি একটি শক্তিশালী দলিল। ওই যুগে অনারবি ভাষায় খুতবা না দেওয়ার কারণ; হয়তো তা প্রয়োজনই ছিলো না বা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিলো অথবা এ দিকে

কেউ ভ্রূক্ষেপই করেনি। কিংবা মানুষ তাতে অলসতা প্রকাশ করেছে অথবা এমনটি করা মাকরুহ এবং শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছিলো না। প্রথম দুটি সম্ভাবনা এ জন্য হতে পারে না যে, আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি, ওই যুগেও অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়ার প্রয়োজন বিদ্যমান ছিলো। আর তাতে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতাও বিদ্যমান ছিলো না, যা তাতে বাঁধা সৃষ্টি করবে। কারণ, তারা অনারবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এমনিভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ সম্ভাবনাও অসম্ভব। কারণ, শরয়ি বিবেচনায় এ বিষয়টি অনেক দূরের যে, বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণের দীনি বিষয়ে কোনো খেয়াল না থাকা। অথবা তারা তাতে অলসতা করেছেন। এমন ধারণা সাধারণ আলেমদের শানেও করা যায় না। আর তাদের ব্যাপারে তো করার প্রশ্নই আসে না। এখন যেহেতু এ সব সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেলো তাই তাদের অনারবি ভাষায় খুতবা না দেওয়ার কারণ মাকরুহ হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।'

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যদি অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরুহ হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্য 'জায়েজ'-এর কি অর্থ হবে? আমার জবাব হলো, সাধারণভাবে 'জায়েজ' হওয়া এক বিষয়, আর মাকরুহ ছাড়া জায়েজ হওয়া ভিন্ন বিষয়। এর মধ্য থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিষয়টিও মেনে নেওয়া আবশ্যক নয়। এ বিষয়টির বিশ্লেষণ হলো, খুতবার মাঝে দুটি দিক রয়েছে—

১. খুতবা জুমার নামাজের জন্য শর্ত।

২. তা সরাসরি ইবাদত।

এ উভয় দিকের গুণাবলি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং হানাফি ফকিহগণ যখন বলেন, ফারসি ভাষায় খুতবা জায়েজ। তখন তার উদ্দেশ্য হলো, এমন খুতবা যা দ্বারা নামাযের শর্ত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তা দ্বারা জুমার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে এর দ্বারা এ কথা আবশ্যক হয় না যে, অপরদিক থেকে এই ধরনের আমল বিদয়াত ও মাকরুহ হওয়া থেকেও মুক্ত হবে।[৫০]

মাওলানা আবদুল হাই লাখনোবি রহ.-এর এই উদ্ধৃতির মধ্যে মাসআলার সকল

[৫০] আকামুন নাফায়িস : ৯১-৯৪।

দিক খুব সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। আর এর মাধ্যমে এ কথাও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা দেওয়া গ্রহণযোগ্য হবার যে কথা বলেছেন তার অর্থ হলো, এর মাধ্যমে শুধু জুমার শর্ত পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এমনটি করা এবং তা নিজের নিয়মিত আমলে পরিণত করা জায়েজ।

সারকথা

উপরে বর্ণিত পুরো আলোচনার সারমর্ম এই যে—

১. ইমাম মালিক রহ.-এর কাছে অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই এবং এমন খুতবার পর জুমা আদায় করাও জায়েজ নেই। ঘটনাক্রমে যদি অনারবি ভাষায় খুতবা দিয়েই ফেলে, তাহলে পুনরায় আরবিতে খুতবা দিয়ে জুমা আদায় করবে। আর যদি কেউ আরবিতে খুতবা দিতে সক্ষম না হয়, তাহলে ওইদিনের জোহর আদায় করবে।

২. ইমাম শাফিয়ি রহ., ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মজলিসে এমন কোনো ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে যে আরবিতে খুতবা দিতে সক্ষম ততক্ষণ পর্যন্ত অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ নেই এবং শরিয়তে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতাও নেই। তাই এমন খুতবার পর জুমার নামাজ আদায় করা শুদ্ধ হবে না।

৩. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর কাছে অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ নেই। তার মতে অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরুহে তাহরিমি। তবে যদি কোনো ব্যক্তি এই মাকরুহে তাহরিমি কাজটি করে ফেলে এবং অনারবি ভাষায় খুতবা দিয়ে ফেলে, তাহলে এর মাধ্যমে জুমা সহিহ হবে। এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আবু ইয়ুসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেননি। বরং তাঁর এই অভিমত এখনো বহাল রয়েছে। এবং হানাফি ফকিহগণ একেই ফতোয়াযোগ্য বলে অভিমত দিয়েছেন।

সুতরাং যারা ইংরেজিতে খুতবা প্রদান করে তাদের এই আমল চার ইমামের মধ্যে

থেকে কারও মতেই জায়েজ নেই। অন্যান্য ইমামগণের অভিমতের দাবি হল, অনারবি ভাষায় খুতবার মাধ্যমে আদায়কৃত জুমা শুদ্ধ হবে না। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, এমন খুতবা মাকরুহের সঙ্গে আদায় হয়ে যাবে এবং তারপর আদায়কৃত জুমা শুদ্ধ হবে। অবশ্য এই মাকরুহ তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা মসজিদের ইমাম এবং কমিটির পক্ষ থেকে আরবিতে খুতবা দেওয়ার ব্যবস্থা করার সক্ষমতা রাখে অথবা আরবিতে খুতবা দেওয়া হয় এমন জামাতে শরিক হতে সক্ষম কিন্তু তারপরও অনারবি ভাষায় খুতবা প্রদান করে অথবা এমন জামাতে শরিক হয় তবে যদি শ্রোতাদের কোনো অধিকার না থাকে এবং ইমাম আরবিতে খুতবা প্রদান করতে অমত পোষণ করে বা এমন কোনো স্থানও পাওয়া যায় না, যেখানে আরবিতে খুতবা দিয়ে নামাজ আদায় করা যায়, তাহলে এমতাবস্থায় অনারবি ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরুহ হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে সর্বাবস্থায় জুমা আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় জুমা আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং তারপর জোহর আদায়েরও কোনো প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

ফতোয়া প্রদানে

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

দারুল ইফতা, দারুল উলুম করাচি,
১৬ রবিউল আউয়াল ১৪১৮ হিজরি

উপর্যুক্ত ফতোয়াকে যারা সঠিক বলেছেন

উত্তর সঠিক হয়েছে।— সাহবান মাহমুদ।
ফতোয়া বিভাগ : দারুল উলুম করাচি।

উত্তর সঠিক হয়েছে।— বান্দা আবদুর রউফ সাখরভি
ফতোয়া বিভাগ : দারুল উলুম করাচি। ২১. ৪. ১৪১৮ হি.

উত্তর সঠিক হয়েছে।— অধম মাহমুদ আশরাফ
২. ৪. ১৪১৮ হি.

জাকাতের আধুনিক মাসায়েল

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'জাকাতের আধুনিক মাসায়েল' এ প্রবন্ধটি মূলত শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর জাকাত বিষয়ে প্রদত্ত একটি সামসময়িক বয়ানের অনুবাদ। এই বক্তব্য তিনি বয়ানটি তিনি বাহাদুরাবাদ আলমগির মসজিদে দিয়েছিলেন।

—আবদুল্লাহ মায়মান

জাকাতের আধুনিক মাসায়েল

প্রাক্‌কথন

সম্মানিত উপস্থিতি, আজকের এই সেমিনার ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ 'জাকাত' বিষয়কে কেন্দ্র করে। পবিত্র রমজানুল মুবারকের কয়েকদিন আগে এই সেমিনারের আয়োজন এ জন্য করা হয়েছে যে, যেন সাধারণ মানুষ জাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত এবং এর প্রয়োজনীয় বিধিবিধান জেনে যথাযথ প্রক্রিয়ায় জাকাত প্রদান করতে পারে। কেননা, এ দেশের মানুষ সাধারণত রমজানুল মোবারকে জাকাত প্রদান করে থাকে।

জাকাত না দেওয়ার পরিণতি

আমি কুরআন শরিফ হতে আপনাদের সামনে দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। উক্ত আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ ওই সকল লোকের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, যারা নিজেদের সম্পদের জাকাত আদায়ে টাল-বাহানা করে। তাদেরকে অত্যন্ত শক্ত ভাষায় মহান আল্লাহ্ ধমক দিয়েছেন : যেসব লোক নিজেদের কাছে স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না (হে রাসুল) আপনি তাদেরকে এক কঠিন শাস্তির সংবাদ দিয়ে দেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদ ও স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর

রাস্তায় খরচ করে না, তাদের ওপর শরিয়ত কর্তৃক যে নির্দেশ আরোপিত হয়েছে তা আদায় করে না, আপনি তাদেরকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিন যে, তারা যেন ভয়াবহ শাস্তির অপেক্ষা করে। এরপর দ্বিতীয় আয়াতে শাস্তির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে যে, এই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন ওই দিন হতে হবে যেদিন এই স্বর্ণ-রৌপ্য আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর সেই ব্যক্তির কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠের ওপর দাগ লাগানো হবে এবং তাকে সম্বোধন করে বলা হবে—

﴿هذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ . التوبة﴾

'এই হলো সেই ধন ভান্ডার; যা তোমরা জমা করে রেখে ছিলে। সুতরাং আজ তোমরা এর স্বাদ আস্বাদন করো।'[৫১]

(মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমকে এই করুণ পরিণতি থেকে হেফাজত করুন।)

এ আয়াতে ওই সকল লোকের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা অর্থ-সম্পদ জমা করে রাখে। তবে মহান আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করে না। এই সতর্কবাণী শুধু এই আয়াতে নয়, আরও অনেক আয়াতে এ রকম কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। সুরায়ে হুমাজায় বর্ণিত হয়েছে—

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ . الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ . يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ . نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ . الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾

'বহু দুঃখ আছে সে ব্যক্তির, যে পেছনে অন্যের বদনাম করে (এবং) মুখের ওপর নিন্দা করতে অভ্যস্ত। যে অর্থ সঞ্চয় করে ও তা বারবার গুণে গুণে দেখে। সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবী করে রাখবে। কখনো নয়। তাকে তো এমন স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, যা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জিনিস কী? তা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'[৫২]

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রতিপাদ্য হলো ওই ব্যক্তির জন্য কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে যে মানুষের দোষত্রুটির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সম্পদ জমা করে

[৫১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৩৫।

[৫২] সুরা হুমাজা, আয়াত : ১-৭।

রাখে এবং তা গণনা করে (প্রত্যহ গণনা করে, আজ আমার কি পরিমাণ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মতৃপ্তিতে ডুবে থাকে) আর সে মনে করে এই সম্পদ আমাকে চিরজীবী করে রাখবে। কখনো নয়! (স্মরণ রেখো! যে সম্পদ সে গণনা করে রেখে দেয়, আর তার জিম্মায় যে দায়িত্ব ছিলো তা আদায় করে না, এর কারণে) তাকে প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আপনি কি জানেন চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কি জিনিস? (যাতে তাকে নিক্ষেপ করা হবে? এটি এমন আগুন যা আল্লাহ কর্তৃক প্রজ্বলিত। (তা কোনো মানুষ কর্তৃক প্রজ্বলিত আগুন নয় যে, পানি, মাটি বা ফায়ার ব্রিগেডের মাধ্যমে নিভিয়ে ফেলা যাবে। বরং তা আল্লাহ কর্তৃক প্রজ্বলিত) যা মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (অর্থাৎ, মানুষের হৃদয় জ্বালিয়ে দেবে।) এমন কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি ওই সকল লোকদের জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা জাকাত আদায়ে টালবাহানা করে। মহান আল্লাহ সকল মুসলিমকে এ থেকে হেফাজত করুন।

এই সম্পদ কোত্থেকে আসে?

জাকাত না দেওয়ার উপর এমন কঠোর সতর্কবাণী কেন উচ্চারণ করা হয়েছে? তার মূল কারণ হলো, যে সম্পদ তুমি দুনিয়াতে উপার্জন করছো, চাই ব্যাবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, কৃষিকাজ বা অন্য যে-কোনোভাবে হোক; একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে এই সম্পদ কোত্থেকে এসেছে? তোমাদের কি এমন ক্ষমতা আছে যে, নিজের বাহুবলে সম্পদ উপার্জন করবে? এটি হলো মহান আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনা। তিনি সেই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন।

কে পাঠান ক্রেতা-গ্রাহক?

তুমি হয়তো মনে করো, তুমি নিজ ক্ষমতা বলে সম্পদ উপার্জন করেছো। আর ভাবো, আমি দোকান খুলেছি। তাই ক্রেতা-গ্রাহক দোকানে আসছে। কেনাবেচা হচ্ছে। ফলে আমার সম্পদ জমা হচ্ছে। অথচ এ বিষয়টি তুমি কখনো লক্ষ করোনি যে, আমার দোকানে কে গ্রাহক পাঠিয়েছেন? যদি তুমি দোকান খুলে বসে থাকতে; আর কোনো ক্রেতা তোমার দোকানে না আসতো, তাহলে কি কোনো কেনাবেচা তোমার দোকানে হতো? কোনো অর্থ আমদানি হতো? তিনি

কে, যিনি তোমার দোকানে ক্রেতা পাঠান? আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই এমন বানিয়েছেন যে, একের প্রয়োজন অন্যের মাধ্যমে পূরণ করেন। একজনের অন্তরে জাগিয়ে দেন, তুমি দোকান খুলে বসো। আর অন্য জনের অন্তরে জানিয়ে দেন, তুমি সেই দোকান থেকে খরিদ করে নিয়ে এসো।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার এক বড়ো ভাই ছিলেন, মুহাম্মাদ জাকি কায়ফি রহ.। (আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন।) 'ইদারায়ে ইসলামিয়াত' নামে লাহোরে তাঁর একটি ধর্মীয় লাইব্রেরি ছিলো। আজো সেই লাইব্রেরি আছে। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, ব্যাবসা-বাণিজ্যেও মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতের কারিশমা প্রদর্শন করে থাকেন। একদা আমি সকালবেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হই। তখন পুরো শহরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তাঘাট সব তলিয়ে গিয়েছিলো। আমার অন্তরে ধারণা হলো, আজ বৃষ্টির দিন। মানুষ ঘর থেকে বের হতে ভয় পাবে। রাস্তায় কাদা জমে আছে। এমতাবস্থায় কে কিতাব ক্রয় করতে আসবে? তাছাড়া কিতাব তো আর পার্থিব কোনো বস্তু নয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যখন পার্থিব সকল বিষয় পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়ে যায় তখন ভাবে এখন এক দুটি ধর্মীয় কিতাব নিয়ে যাওয়া যাক। এগুলোর মাধ্যমে তো আর ক্ষুধা নিবারণ হয় না। কারণ, তাতে পার্থিব বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই। অতএব, দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণের প্রশ্নই আসে না।

আজকাল ধর্মীয় কিতাবকে অতিরিক্ত মনে করা হয়। তাই দেখা যায় একদল লোক অবসর সময় পেলে—যখন আর কোনো কাজ থাকে না—তখন কিতাবটা নিয়ে একটু বসে। সুতরাং এমন মুষলধারে বৃষ্টির সময় কে আর ধর্মীয় কিতাব ক্রয় করতে আসবে? তাই সিদ্ধান্ত নিলাম আজ আর দোকানে যাবো না। কিন্তু আমার এই ভাই ছিলেন থানবি রহ.-এর মতো ব্যক্তির সাহচর্য প্রাপ্ত। তাই তিনি পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, ঠিক আছে। কোনো ব্যক্তি কিতাব ক্রয় করতে আসুক বা না আসুক। কিন্তু মহান আল্লাহ যেহেতু এভাবে আমার রিজিকের ব্যবস্থা রেখেছেন, তাই আমার কাজ হলো বাজারে গিয়ে দোকান খুলে বসে থাকা। গ্রাহক পাঠানো আমার কাজ নয়। এটি অন্য কারও কাজ। তাই আমি আমার কাজে অলসতা করবো না। সুতরাং ঝড়, বৃষ্টি বা তুফান যাই আসুক না কেন আমাকে দোকান খুলতেই

হবে। অনেক কিছু ভেবে অবশেষে ছাতা নিয়ে পানি ভেঙে দোকানে চলে এলাম। দোকানে বসে ভাবলাম, আজ তো কোনো কাস্টমার আসবে না। তাই অলসভাবে বসে থেকে লাভ কি? এ কথা চিন্তা করে কুরআন তেলাওয়াতে বসে গেলাম। তেলাওয়াত শুরু করা মাত্রই দেখতে পেলাম, মানুষ ছাতা মাথায় পানি ভেঙে কিতাব ক্রয়ের জন্য ছুটে আসছে। আমি এই ভেবে পেরেশান হলাম যে, এমন কি প্রয়োজন দেখা দিলো যার ফলে এই প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করে মানুষ কিতাব ক্রয়ের জন্য ছুটে আসছে। যেসব কিতাব ক্রয়ের জন্য আসছে, এগুলো এখন ক্রয় না করলেও চলতো। কিন্তু এরপরো মানুষ অনবরত আসছিলো। ফলে দেখা গেল অন্যান্য দিন যা বেচাকেনা হতো আজো তাই বেচাকেনা হয়েছে। তখন আমার অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল হলো যে, প্রকৃত অর্থে ক্রেতারা নিজ থেকে ছুটে আসে নি। অন্য কেউ তাদের পাঠাচ্ছেন। আর তা এ জন্য যে, মহান আল্লাহ এই ক্রেতাদেরকে আমার রিজিকের মাধ্যম বানিয়েছেন।

কাজের বণ্টন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে

বাস্তবে এটি হলো আল্লাহ প্রদত্ত শৃঙ্খলাবিধান। তিনি ক্রেতার অন্তরে এ কথা জাগিয়ে দেন যে, তুমি অমুকের পণ্য ক্রয় করতে যাও। কোনো ব্যক্তি কি এমন কোনো কনফারেন্স করেছিলো যার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, এতজন লোক কাপড় খরিদ করবে। এতজন জুতো ক্রয় করবে। এতজন চাল ক্রয় করবে। আর এতজন বাসনপত্র ক্রয় করবে? এমনিভাবে মানুষের প্রয়োজন মিটবে। পৃথিবীতে আদৌ এমন কোনো কনফারেন্স হয়নি। বরং মহান আল্লাহ কারও অন্তরে ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি কাপড় কেনো। আর কারও অন্তরে ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন, তুমি জুতো কেনো। কারও অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন তুমি রুটি কেনো। কারও অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন তুমি গোশত কেনো। এতে ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এমন কোনো প্রয়োজন নেই যা বাজার থেকে সমাধা করা যায় না। অপরদিকে ক্রেতাদের অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন, তোমরা বাজারে গিয়ে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করে এসো। এভাবে বিক্রেতাদের রিজিকের সরবরাহে তোমরা সহযোগী হও। এটিই হলো আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলাবিধান। এভাবে তিনি মানুষের রিজিকের ব্যবস্থা করেন।

জমি থেকে উৎপন্নকারী কে?

ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ বা চাকরি-বাকরির সবগুলোরই প্রকৃত দাতা একমাত্র মহান আল্লাহ। কৃষিকাজের প্রতি লক্ষ্য করুন! কৃষিকাজে মানুষের কাজ হলো, মাটি নরম করা। বীজ বপন করা ও পানি সেচের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সেই বীজ থেকে চারা গজানোর কাজটি কে করেন? যে বীজটি ছিলো একেবারেই অস্তিত্বহীন, কে তাকে বিশাল মহীরুহে পরিণত করেন? যে বীজটি ছিলো একেবারেই হালকা-পাতলা। কীভাবে সেটি আজ শক্ত মাটি চিরে গজিয়ে ওঠে? সেই চারাটিকে যদি একজন অবুঝ শিশুও স্পর্শ করে, তাহলেও সেটি নিমেষেই ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ এক সময় সেই চারাটি মওসুমের সব ধরনের ঝড়-তুফানের সঙ্গে যুদ্ধ করে সকল বাধা উপেক্ষা করে বেড়ে ওঠে। ঝড়-বৃষ্টি, ঠান্ডা-গরম ও রৌদ্রের উত্তাপসহ কোনো প্রতিকূল অবস্থাই তার পথ রুদ্ধ করতে পারে না। এক সময় সেটি শক্ত হয়ে যায় এরপর তাতে ফুল ফোটে। ফল আসে। পর্যায়ক্রমে তা মানুষের উপযোগী হিসেবে গড়ে ওঠে। এরপর সবার ঘরে ঘরে তা পৌঁছে যায়। কে সেই সত্তা যিনি এই কাজটি করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালাই এগুলো করেছেন।

সৃষ্টি করার ক্ষমতা মানুষের নেই

সুতরাং আয়ের মাধ্যম যাই হোক—ব্যাবসা-বাণিজ্য হোক বা চাকরি বাকরি হোক, প্রকৃত অর্থে মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং মানুষ সেই নির্দিষ্ট কাজগুলোই করবে। কিন্তু সেই কাজের তালিকায় সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি করেন, আর তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। সুতরাং তোমাদের কাছে যা আছে সেগুলোর সবই আল্লাহর দান। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

'আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ।'[৫৩]

[৫৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৪।

প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ

মহান আল্লাহ ওই সবকিছু তোমাদের দান করে বলে দিয়েছেন, এখন এগুলোর মালিক তোমরা। যেমনটি সুরায়ে ইয়াসিনে মহান আল্লাহ বলেছেন—

﴿اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ﴾

'তারা কি প্রত্যক্ষ করে না যে, আমি আমার নিজ হাতের তৈরি সামগ্রী দিয়ে তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। এখন তারাই এগুলোর মালিক।'[৫৪]

প্রকৃত মালিক তো মহান আল্লাহ ছিলেন এবং আছেন। তিনি মানুষকে এর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এই সম্পদের প্রকৃত হকদার হলেন মহান আল্লাহ। তাই এই সম্পদ খরচও করতে হবে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী। যদি তাঁর নির্দেশ মতো খরচ করা হয়, তাহলে অবশিষ্ট সম্পদ মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র বলে বিবেচিত হবে। এই সম্পদ মানুষের জন্য মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামত। এবং এগুলো বরকতপূর্ণ সম্পদ। এখন যদি তোমরা সেই সম্পদ থেকে মহান আল্লাহ কর্তৃক ধার্যকৃত পরিমাণ বের না করো, তাহলে সমুদয় সম্পদ তোমাদের জন্য আগুনের অঙ্গার হয়ে যাবে। কেয়ামত দিবসে সেই অঙ্গারের ভয়াবহতা উপলব্ধি হবে, যখন সেই অঙ্গার দিয়ে শরীরে দাগ লাগানো হবে এবং তোমাদের সম্বোধন করে বলা হবে, এগুলোই তোমাদের সেই ধনভান্ডার, যা তোমরা দুনিয়াতে জমা করেছিলে।

শতকরা মাত্র আড়াই টাকা

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, এই সম্পদ আমার দেওয়া। সুতরাং তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা দান করো। আর অবশিষ্ট টাকা তোমার প্রয়োজনে খরচ করো। একটু চিন্তা করে দেখুন! যদি মহান আল্লাহ বলতেন; শতকরা আড়াই টাকা তুমি রাখো, আর সাড়ে সাতানববই টাকা আমার রাস্তায় খরচ করো, তাহলেও সেই নির্দেশ ইনসাফ পরিপন্থি হতো না। কারণ, সমুদয় সম্পদ তাঁরই দেওয়া। আর তাঁর হাতেই এসব সম্পদের মালিকানা। তবে তিনি বান্দার ওপর অনুগ্রহ করে বলেছেন, আমি জানি তোমরা অতিশয় দুর্বল। তোমাদের এই সম্পদের

[৫৪] সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৭১।

প্রয়োজন হবে এবং তোমাদের অন্তরও সেদিকে ধাবিত থাকবে। অতএব, এই সম্পদের সাড়ে সাতানববই ভাগ তোমাদের জন্য আর শুধুমাত্র আড়াই ভাগ আমার জন্য। যখন শতকরা এই আড়াই টাকা আমার রাস্তায় খরচ করবে, তখন বাকিটুকু তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র হয়ে যাবে এবং তাতে বরকত হবে। মহান আল্লাহ সমুদয় সম্পদের মাঝে এই সামান্য অংশের দাবি করে পুরো সম্পদ আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। অবশিষ্ট সম্পদে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই বৈধ পন্থায় খরচ করতে পারি।

জাকাতের গুরুত্ব

জাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বার বার ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

'নামাজ কায়েম করো, জাকাত আদায় করো।'[৫৫]

পবিত্র কুরআনের যেখানেই নামাজের আলোচনা এসেছে সেখানেই জাকাতের কথাও এসেছে। এতেই বুঝা যায় জাকাতের গুরুত্ব কতটুকু। অপরদিকে মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি কতই না ইহসান করেছেন। তিনি আমাদেরকে সম্পদ দিয়ে এর মালিকানাও আমাদের হাতে প্রদান করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ শুধু আমাদের কাছে শতকরা আড়াই টাকা চেয়ে বলেছেন, এটুকু তোমরা আমার জন্য সঠিকভাবে খরচ করো। এতে তোমাদের সামান্যতম সমস্যাও হবে না। না তোমাদের ওপর আসমান ভেঙে পড়বে আর না কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

হিসাব করে জাকাত বের করো

অনেক লোক এমন আছে যারা জাকাত প্রদানে একেবারেই উদাসীন। তারা জাকাত দিতে মোটেও প্রস্তুত নয়। তারা মনে করে সম্পদ তো এমনিতেই আসছে। সুতরাং জাকাত আবার কীসের? আর কিছু মানুষ আছে যারা খানিকটা জাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং জাকাত আদায়ও করে। তবে জাকাত প্রদানের বিশুদ্ধ

---

[৫৫] সুরা বাকারা, আয়াত : ৪৩।

পন্থা তারা অবলম্বন করে না। অথচ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। সেই বিধানের যথাযথ মূল্যায়ন করা সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কানাকড়ি পর্যন্ত হিসাব করে জাকাত আদায় করতে হবে। আবার কিছু মানুষ এমন আছে তারা মনে করে, কে আবার হিসাব করতে আসবে? কে জানবে কী পরিমাণ মাল স্টক আছে? তাই তারা কোনো রকম দায়সারাভাবে অনুমানকরে জাকাত প্রদান করে থাকে। এখন তাদের এই অনুমান নির্ভর দয়াসারাভাবে জাকাত আদায়ে ভুলও হতে পারে এবং ধার্যকৃত পরিমাণের চেয়ে কমও হতে পারে। অথচ সে বিষয়টি নিয়ে তারা মোটেও চিন্তিত নয়। তবে যদি তাদের অনুমাননির্ভর জাকাত প্রদান ধার্যকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কোনো প্রকার জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে না। আর যদি সেই অনুমাননির্ভর জাকাত আদায়ে এক পয়সাও কম হয়; তাহলে স্মরণ রেখো! সেই এক টাকা তোমার কাছে হারাম পন্থায় থাকার কারণে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে! তোমার সমুদয় সম্পদ বরবাদ হয়ে যাবে!

জাকাত না দেওয়া সম্পদ ধ্বংসের কারণ

এক হাদিসে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন সম্পদের সঙ্গে জাকাতের টাকা মিলিত হবে অর্থাৎ, পরিপূর্ণ জাকাত আদায় না করে আংশিক জাকাত আদায় করে বাকিটুকু নিজের কাছে রেখে দেওয়া হবে তখন সেই সম্পদ মানুষের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। তাই মানুষের কর্তব্য হলো, যথাযথভাবে হিসাব করে জাকাত আদায় করা। তাছাড়া কখনো পরিপূর্ণভাবে জাকাত আদায় হবে না। আল্লাহর শোকর! এখনো এমন অনেক মানুষ আছে, যারা অবশ্যই জাকাত প্রদান করে। তবে কিছুটা শিথিলতাও প্রদর্শন করে এবং সঠিকভাবে জাকাতের হিসাব বের করে না। ফলে জাকাতের কিছু অংশ নিজের সম্পদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে (সম্পদ) ধ্বংসের কারণ হয়।

জাকাত আদায়ের জাগতিক উপকারিতা

জাকাতের টাকা পৃথক করার সময় নিয়ত করবে এটি মহান আল্লাহর হুকুম। তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করাও একটি ইবাদত। জাকাত আদায়ের কারণে আমার কোনো

উপকার হোক বা না হোক মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য। বাস্তব অর্থে জাকাতের মূল উদ্দেশ্যই হলো এটি। তবে এতে মহান আল্লাহর এহসান ও অনুগ্রহ হলো, এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ বিভিন্নভাবে তাকে উপকৃত করেন। তার সম্পদে বরকত দান করেন। যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾

'মহান আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন, আর দানকে বর্ধিত করেন।'[৫৬]

এক হাদিসে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোনো বান্দা জাকাত প্রদান করে তখন ফেরেশতারা তার জন্য এই দুআ করেন—

اللَّهُمَّ أعط مُنْفِقًا خَلَفا وأعط ممسكا تَلَفًا.

'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায় খরচ করে তার সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দাও। হে আল্লাহ! যে সম্পদ জমা করে রাখে এবং জাকাত প্রদান করে না, তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও।' [৫৭]

এ জন্যই বলা হয়—

ما نقصت صدقة من مال.

'কোনো দান সদকা কোনো সম্পদকে ক্ষয় করে না।'[৫৮]

এ কারণেই অনেক সময় এমন হয় যে, একদিকে মুসলিমগণ যথাযথভাবে জাকাত প্রদান করছে। আর অপর দিকে তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে পরিমাণ জাকাত দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি আসছে। আবার অনেক সময় এমন হয়, জাকাত প্রদানের কারণে যদিও বাহ্যিক সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু অপরদিক দিয়ে সম্পদে এই পরিমাণ বরকত হচ্ছে যে, অল্প মালে অনেক বেশি উপকার হচ্ছে।

সম্পদে বরকতহীনতা

আজকের পৃথিবী হিসাবের পৃথিবী। বরকতের অর্থ মানুষ বোঝে না। বরকত হলো, অল্প জিনিসে ফায়দা বেশি হওয়া। যেমন : আজ আপনি অনেক পয়সা উপার্জন করেছেন। কিন্তু বাড়ি এসে দেখলেন সন্তান অসুস্থ। তাই তাকে নিয়ে ডাক্তারের

[৫৬] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৬।
[৫৭] বুখারি ১৪৪২, মুসলিম ১০১০।
[৫৮] মুসলিম ২৫৮৮।

কাছে গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিলো, সে অনুযায়ী ওষুধপত্র ক্রয় করতে গিয়ে আপনার সব টাকা খরচ হয়ে গেলো। এসবের অর্থ হলো, আপনার উপার্জনে বরকত হয়নি। অথবা আপনি অনেক টাকা উপার্জন করে বাড়ি আসছিলেন। পথিমধ্যে ছিনতাইকারী পিস্তল ঠেকিয়ে সব টাকা ছিনিয়ে নিলো। এর অর্থ হলো, টাকা কামাই করেছেন কিন্তু তাতে বরকত হয়নি। কিংবা আপনি অনেক টাকা উপার্জন করেছেন বলে খুব মজা করে খাবার খেলেন। পরক্ষণেই দেখা গেলো আপনার পেটে সমস্যা। এসব হলো বরকত না হওয়ার আলামত। বরকতের অর্থ হলো, আপনি উপার্জন করেছেন একেবারে অল্পসল্প। তবে এই অল্পের মাঝে মহান আল্লাহ্ বরকত দিয়ে বিরাট কাজ সমাধা করে দিলেন। এরই নাম বরকত। এই বরকত মহান আল্লাহ্ ওই ব্যক্তিকে নসিব করেন, যে মহান আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী চলে এবং মহান আল্লাহর নির্দেশের যথাযথ অনুসরণ করে। সুতরাং আমাদের উচিত, সম্পদের জাকাত দিয়ে দেওয়া এবং তা এমনভাবে দেওয়া, যেভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করে জাকাত দেওয়া। শুধু অনুমান করে না দেওয়া।

জাকাতের নেসাব

এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা হলো, মহান আল্লাহ্ জাকাতের একটি নির্দিষ্ট নেসাব ধার্য করেছেন। যদি কেউ সেই নেসাব থেকে কম মালের মালিক হয়, তাহলে তার উপর জাকাত ফরজ নয়। আর যদি কেউ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাহলে জাকাত ফরজ। সেই নেসাব হলো, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য (বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ) অথবা সমমূল্যের নগদ অর্থ, অলংকার, ব্যাবসার পণ্য ইত্যাদি। যে ব্যক্তির কাছে এই পরিমাণ সম্পদ থাকবে তাকে বলা হবে সাহেবে নেসাব তথা নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক।

প্রতি টাকায় বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি নয়

কারও কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ জমা হলে, তাতে জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরি। অর্থাৎ, সে বছরের শেষ পর্যন্ত নেসাবের মালিক থাকে, তাহলে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে আজকাল একটি

ভুল প্রথা প্রচলিত আছে যে, নেসাবের প্রতিটি টাকায় পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হতে হবে। তখন জাকাত ওয়াজিব হবে। মূলত এ ধারণা সঠিক নয়। বরং বছরের শুরুতে যদি কোনো এক ব্যক্তি নেসাবের মালিক হয়। তারপর পরবর্তী বছরের একই দিনে সেই ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে তাহলে সে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বলে গণ্য হবে। বছরের মাঝে তার সম্পদ কম বেশি হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য নয়। উদাহরণ-স্বরূপ কোনো এক রমজানের প্রথম তারিখে কেউ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে পরবর্তী রমজানের প্রথম তারিখে যদি তার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে শতকরা আড়াই টাকা হারে জাকাত প্রদান করতে হবে। চাই সেই টাকার কিছু অংশ জাকাত আদায়ের নির্দিষ্ট তারিখের এক দিন আগে হস্তগত হোক না কেন।

জাকাতের প্রদানের তারিখে যে পরিমাণ টাকা থাকবে সেই পরিমাণ অর্থের জাকাত দিতে হবে

মনে করুন, এক ব্যক্তির কাছে রমজানের প্রথম তারিখে এক লাখ টাকা ছিলো। পরবর্তী বছর প্রথম রমজানের দুদিন আগে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা তার হস্তগত হয়ে ক্যাশ দাঁড়ায় দেড়লাখ টাকায়। এখন তাকে অবশ্যই দেড়লাখ টাকার জাকাত আদায় করতে হবে। এমনটি বলার আদৌ অবকাশ নেই যে, পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এইমাত্র হস্তগত হয়েছে। তাতে পূর্ণ বছর অতিবাহিত হয়নি। তাই তার ওপর জাকাত আসবে না। এমন বিশ্বাস রাখার কোনো সুযোগ নেই। বরং জাকাত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার পর থেকে যে দিন এক বছর পূর্ণ হবে এবং সেই দিন তার কাছে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে সে পরিমাণ সম্পদের জাকাত দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব। যেমন : প্রথম বছর এক লাখ টাকার মালিক ছিলো। পরবর্তী রমজানে দেড়লাখ টাকার মালিক হয়েছে। এখন তাকে পুরো দেড়লাখ টাকার জাকাত দিতে হবে। আর যদি সেই বছর টাকার সংখ্যা কমে পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়ায়, তাহলে শুধু পঞ্চাশ হাজারেরই জাকাত দিতে হবে। বছরের মাঝে যে অর্থ খরচ হয়েছে তার জাকাত আসবে না। মূলত মহান আল্লাহ বান্দার জন্য সহজ করণার্থে এই সহজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন যে, হে বান্দা তুমি বছরের মাঝে যা খেয়েছো বা খরচ করেছো এর কোনো হিসাব তোমার দেওয়া লাগবে না।

এমনিভাবে বছরের মাঝে যে টাকা তোমার হস্তগত হয়েছে এর জন্য ভিন্নভাবে কোনো প্রকার হিসাব রাখার প্রয়োজন নেই যে, কত তারিখে এসেছে? কখন বছর পূর্ণ হবে? বরং জাকাত প্রদানের তারিখে যে পরিমাণ সম্পদ তোমার কাছে বিদ্যমান থাকবে; তার জাকাত আদায় করো। এই হলো বছর অতিবাহিত হওয়ার মর্ম।

জাকাতযোগ্য সম্পদ কী কী?

এটি আল্লাহ তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি সব ধরনের সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ করেননি। অন্যথায় সম্পদ তো অনেক ধরনের আছে। সব ধরনের সম্পদের ওপর জাকাত ফরজ করলে, বিষয়টি বানদার জন্য খুব জটিল ও কঠিন হয়ে যেতো। যে সকল সম্পদের ওপরও জাকাত ওয়াজিব হয় তা মূলত দুই প্রকার—

১. নগদ অর্থ। চাই তা কাগুজে নোট হোক বা ধাতব মুদ্রা হোক।

২. স্বর্ণ-রৌপ্য। চাই তা অলংকারের আকারে হোক অথবা মুদ্রার আকারে হোক।

অনেক মানুষ মনে করে, মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারে জাকাত নেই। এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। সঠিক কথা হলো, মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারও জাকাতযোগ্য সম্পদ। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর অলংকার, চাই পলাটিনামের মতো মূল্যবান ধাতব হোক না কেন। তার ওপরও জাকাত ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে হীরা জহরতেও জাকাত ওয়াজিব নয়। হাঁ! তবে যদি এগুলো ব্যবসায়িকপণ্য হয়, তাহলে জাকাত ওয়াজিব হবে।

জাকাতের সম্পদে যুক্তির কোনো অবকাশ নেই

এখানে একটি বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, জাকাত একটি ইবাদত। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর একটি ফরজ বিধান। আজকাল অনেককে দেখা যায়, জাকাত বিষয়ে নিজস্ব বুদ্ধি ও যুক্তি দেয়। তাদের আপত্তি হলো, তার ওপর কেন জাকাত ওয়াজিব? অমুক জিনিসের ওপর কেন জাকাত ওয়াজিব নয়? সাবধান! মনে রাখতে হবে, জাকাত দেওয়া একটি ইবাদত। আর

ইবাদতের অর্থ হলো আমার বুঝে আসুক বা না আসুক এটি মহান আল্লাহর নির্দেশ। আমাকে অবশ্যই সেটি মানতে হবে। যেমন : কেউ বললো, স্বর্ণ-রৌপ্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব, তাহলে হীরা জহরতের ওপর কেন জাকাত ওয়াজিব নয়? প্লাটিনামের ওপর কেন জাকাত নেই? বিষয়টি এমন হলো, কেউ প্রশ্ন করলো, সফর অবস্থায় জোহর, আসর এবং এশার নামাজ কসর করতে হয়। অর্থাৎ, চার রাকাতের স্থানে দুই রাকাত পড়তে হয়, তাহলে মাগরিব নামাজে কসর পড়তে সমস্যা কোথায়? অথবা কেউ বললো, এক ব্যক্তি বিমানে প্রথম শ্রেণিতে সফর করে। তার তো কোনো কষ্ট নেই। এরপরো কসর পড়ার সুযোগ রয়েছে। অথচ আমাকে করাচি শহরে বাসে চড়ে অত্যন্ত কষ্ট পোহাতে হয়। এরপরো আমার নামাজে কসর নেই কেন? এ সকল প্রশ্নের একই জবাব। আর তা এই যে, এটি হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি নির্দেশ, যা অবশ্যই পালন করতে হবে। ইবাদতের অর্থই হলো, মহান আল্লাহর দেওয়া সকল বিধিবিধান মান্য করা। অন্যথায় সেটি ইবাদত বলেই গণ্য হবে না।

ইবাদত করা আল্লাহর নির্দেশ

কোনো ব্যক্তি আপত্তি করলো, শুধুমাত্র ৯ই জিলহজে হজ ফরজ হওয়ার কারণ কি? আমার জন্য তো সহজ ছিলো, আজই গিয়ে হজ করে আসা। আরাফার ময়দানে একদিনের স্থানে তিন দিন থাকবো। এখন যদি একদিনের পরিবর্তে তিন দিনও বসে থাকে, তারপরো হজ আদায় হবে না। কারণ, মহান আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে হয়নি। অথবা কেউ বললো, হজের তিনদিন কংকর নিক্ষেপের সময় খুব ভিড় হয়। তাই চতুর্থ দিন একসঙ্গে সবকটি পাথর নিক্ষেপ করে ফেলবো; তাহলে কি সেই কংকর নিক্ষেপ সঠিক হবে? অবশ্যই এ কাজ সঠিক হবে না। কারণ, এটি একটি ইবাদত। আর এ ক্ষেত্রে জরুরি হলো, ইবাদতের যে নিয়ম শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত, ঠিক সেভাবেই তা করতে হবে। এমনটি হলেই কেবল সেই ইবাদত সঠিক বলে গণ্য হবে। অন্যথায় সেটি সঠিক হবে না।

সুতরাং এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের ওপর জাকাত আসে। কিন্তু হীরা জহরতের ওপর জাকাত আসে না কেন? এটি ইবাদতের দর্শনের বিপরীত। মোটকথা, মহান আল্লাহ স্বর্ণ-রুপার ওপর জাকাত ফরজ করেছেন। এখন চাই তা ব্যবহৃত হোক। আবার নগদ অর্থের ওপরও জাকাত ফরজ করেছেন।

ব্যবসায়ী পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি

যে সকল জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ হয়, তার মাঝে আরেকটি হলো ব্যবসায়িকপণ্য। যেমন কোনো দোকানে বিক্রয়ের জন্য যে পণ্য রাখা হয়। মোটকথা! স্টককৃত যাবতীয় পণ্যের জাকাত আদায় করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, জাকাত আদায় করতে গিয়ে পণ্যের মূল্য কোনটা ধরা হবে? সাধারণভাবে পণ্যের মাঝে তিনটি মূল্য থাকে—

১. খুচরা মূল্য

২. পাইকারী মূল্য

৩. পুরো স্টক একত্রে বিক্রয়মূল্য।

এই তিন প্রকারের তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, পুরো স্টক বিক্রয়মূল্য হিসাব করে জাকাত আদায় করা যেতে পারে। সে অনুপাতে পুরো পণ্যের হিসাব করে শতকরা আড়াই টাকা হারে জাকাত প্রদান করবে। তবে সতর্কতা হলো, পাইকারি মূল্য হিসাবে আদায় করা।

ব্যবসায়িক পণ্যের পরিচয়

ব্যবসায়িকপণ্য হিসেবে ওই সকল বস্তু গণ্য হবে যেগুলো মানুষ বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কিনে থাকে। সুতরাং কেউ যদি ব্যাবসার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট, জমি, বাড়ি, গাড়ি বা এ জাতীয় কিছু কিনে, তাহলে এ সবগুলোই ব্যবসায়িকপণ্য হিসেবে গণ্য হবে। তখন এগুলোর জাকাত দেওয়া ফরজ হবে। এজন্য যদি কেউ ব্যাবসার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট বা এ জাতীয় কিছু কিনে, শুরুতেই সে এই নিয়ত করে যদি পরবর্তীকালে লাভ পাওয়া যায়, তাহলে বিক্রয় করে ফেলবো। এমতাবস্থায় সেই ফ্ল্যাটের মূল্যের ওপর জাকাত আসবে। তবে যদি ফ্ল্যাট এ উদ্দেশ্যে কিনে যে, সুযোগ হলে বাড়ি করবো বা ভাড়া দেবো অথবা বিক্রয় করে দেবো। অর্থাৎ, সুনির্দিষ্টভাবে কোনো নিয়ত করেনি। সবগুলোরই সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। ফ্ল্যাটের ওপর শুধু ওই সময় জাকাত ওয়াজিব হবে যখন ক্রয় করার সময় পুনরায় বিক্রয় করার উদ্দেশ্য থাকে। এমনকি ফ্ল্যাট ক্রয় করার সময় যদি এই নিয়ত থাকে যে, আমি তাতে বাড়ি করে বসবাস করবো। তারপর নিয়ত পরিবর্তন করে ব্যাবসার নিয়ত করলেও জাকাত ওয়াজিব

হবে না। শুধু নিয়ত পরিবর্তনের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। হ্যাঁ! যখন ফ্ল্যাট বিক্রয় করার পর মূল্য হাতে চলে আসবে, তখন সেই মূল্যের ওপর জাকাত আসবে। মূল্য হস্তগত হওয়ার আগে জাকাত আসবে না।

মোটকথা! যে সকল পণ্য ক্রয়ের সময়ই ব্যাবসার নিয়ত থাকে সেটিই ব্যবসায়িকপণ্য হিসেবে গণ্য হবে। এবং সেই পণ্যের ওপর শতকরা আড়াই টাকা হারে জাকাত আসবে।

কোন দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে?

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, জাকাত আদায়ের জন্য যেই দিন পণ্যের মূল্য হিসাব করে জাকাতের টাকা পৃথক করা হবে সেই দিনের বাজার মূল্য ধরা হবে। যেমন : কেউ একটি ফ্ল্যাট এক লাখ টাকায় কিনলো। বর্তমানে সেই ফ্ল্যাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে বাজার মূল্য দাঁড়িয়েছে দশ লাখ টাকা। এই দশ লাখ টাকা মূল্য ধরে জাকাত আদায় করতে হবে। এক লাখ টাকার হিসাব করে জাকাত আদায় করলে সেই জাকাত আদায় হবে না।

কোম্পানির শেয়ারে জাকাতের বিধান

কোম্পানির শেয়ারও ব্যাবসার পণ্য হিসেবে গণ্য। শেয়ার দুই ধরনের—একটি হলো, কোম্পানির শেয়ার এজন্য কেনা যে, তার মাধ্যমে মুনাফা অর্জিত হবে। কোম্পানি শেয়ারের কারণে বার্ষিক মুনাফা দেবে। অপরটি হলো ক্যাপিটাল গেইন করার উদ্দেশ্যে শেয়ার কেনা। অর্থাৎ, এই নিয়তে শেয়ার কেনা যে, বাজারে যখন মূল্য বৃদ্ধি পাবে তখন তা বিক্রয় করে মুনাফা হাসিল করবে। ওই শেয়ারের ক্ষেত্রে বাজার দর হিসাব করে জাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন : কেউ পঞ্চাশ টাকা দরে শেয়ার ক্রয় করলো। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো যখন তার মূল্য বৃদ্ধি পাবে, তখন বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করবে। তারপর যখন জাকাতের হিসাব করা হবে, সেদিন যদি শেয়ারের বাজার মূল্য ষাট টাকা হয়; তাহলে ষাট টাকা শেয়ারের মূল্য ধরেই শতকরা আড়াই টাকা হারে জাকাত প্রদান করতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি প্রথম প্রকার তথা কোম্পানি থেকে বার্ষিক মুনাফা লাভের জন্য শেয়ার কিনে থাকেন এবং এতে শেয়ার বিক্রয় করার কোনো উদ্দেশ্য না থাকে,

তাহলে আপনার এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, আপনি দেখবেন, যে কোম্পানি থেকে আপনি শেয়ার কিনেছেন বর্তমানে তার মূলধন তথা কোম্পানির বিল্ডিং, মেশিনারিজ, কার, নগদ ক্যাশ, ব্যবসায়ী পণ্য, কাঁচামাল ইত্যাদি কি পরিমাণ আছে? এ বিষয়গুলো অবশ্যই জেনে নেবেন। যেমন : ধরা যাক কোম্পানির শতকরা ৬০% নগদ ক্যাশ ব্যবসায়ী আসবাবপত্র, কাঁচামাল এবং প্রস্তুতকৃত পণ্যের বিপরীতে আছে। আর শতকরা ৪০% বিল্ডিং, মেশিনারিজ, কার ইত্যাদির বিপরীতে আছে। এমতাবস্থায় আপনাকে ওই শেয়ারগুলোর বাজার দর ধরে শতকরা ৬০% ভাগের বিপরীতে জাকাত আদায় করতে হবে। কারণ, বাকি ৪০% জাকাতযোগ্য নয়। তাই সেই অংশের জাকাত দিতে হবে না। যেমন : শেয়ারের বাজার মূল্য ছিলো ৬০ টাকা। আর কোম্পানির ৬০% ছিলো জাকাতযোগ্য। ৪০% জাকাত অযোগ্য। এখন শেয়ারের পুরো মূল্য অর্থাৎ, ৬০ টাকার বিপরীতের ৩৬ টাকার জাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি কোনো কোম্পানির মূল সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না যায়, তাহলে সতর্কতামূলক পুরো শেয়ারের বাজার দর হিসাব করে জাকাত দেবে।

শেয়ার ছাড়া যে অর্থনৈতিক ফাংশন আছে যেমন বন্ড, সার্টিফিকেট ইত্যাদি, এগুলোর সবই নগদ টাকার হুকুমে। অর্থাৎ, এগুলোর মূল মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। (অর্থাৎ, পুরো মূল্যের জাকাত দিতে হবে।)

কারখানার সম্পদে জাকাতের বিধান

যদি কোনো ব্যক্তি কারখানার মালিক হয়, তাহলে সেই কারখানায় প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রীর মূল্যের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যে সমস্ত মাল প্রস্তুতের বিভিন্ন স্তরে বা কাঁচামাল হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে তার উপরেও জাকাত ওয়াজিব। তবে কারখানার মেশিন, বিল্ডিং, গাড়ি ইত্যাদির ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না।

এমনিভাবে কেউ যদি কোনো শরিকানা কারবারে টাকা বিনিয়োগ করে, তাহলে সেই কারবারে তার মালিকানাধীন অংশের বাজার মূল্য ধরে জাকাত আদায় করতে হবে।

সারকথা হলো, নগদ অর্থ যাতে ব্যাংক ব্যালেন্স এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টসও অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর ওপর জাকাত ওয়াজিব। আর ব্যাবসার আসবাবপত্র যাতে প্রস্তুতকৃত পণ্য, কাঁচামাল এবং প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন মাল এ সবই ব্যবসায়িকপণ্য

হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি মানুষ যেসব জিনিস বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে কিনে সেগুলোও ব্যবসায়িকপণ্য হিসেবে গণ্য। জাকাত বের করার সময় এ সবগুলোকেই জাকাতযোগ্য সম্পদে অন্তর্ভুক্ত করে জাকাত আদায় করতে হবে।

ঋণের যে টাকার প্রাপ্তি নিশ্চিত তার জাকাতের বিধান

অনেক সময় টাকা অন্যের কাছে ঋণ থাকে। তবে এ নিশ্চয়তা থাকে যে, এ টাকা সে পাবে। যেমন কেউ কাউকে ঋণ দিয়েছে অথবা বাকিতে পণ্য বিক্রয় করেছে। এ জাতীয় টাকার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হলো, জাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে যখন হিসাব করে সমগ্র সম্পদ থেকে জাকাতের টাকা বের করবে তখন এগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। এমনটি করা উত্তম। যদিও শরিয়ত এ ক্ষেত্রে সুযোগ দিয়েছে যে, এ জাতীয় অর্থের জাকাত উসুল হওয়ার আগ পর্যন্ত আদায় করা ওয়াজিব নয়। হাঁ যখন এ টাকা হস্তগত হবে তখন বিগত সব বছরের জাকাত আদায় করে দিতে হবে। যেমন : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে এক লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে। পাঁচ বছর পর সে ঋণের টাকা ফেরত পেলো। যদিও এ এক লাখ টাকার জাকাত বিগত পাঁচ বছর আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব ছিলো না। কিন্তু হস্তগত হওয়ার পর বিগত পাঁচ বছরের জাকাত আদায় করতে হবে। তবে যেহেতু বিগত পাঁচ বছরের জাকাত একসঙ্গে আদায় করা কষ্টকর, তাই প্রতি বছর হিসাব করে জাকাত আদায় করে দেওয়া যেতে পারে। এজন্য উত্তম হলো যখন জাকাতের হিসাব করবে, তখন ঋণের টাকাও মোট সম্পদের সঙ্গে হিসাব করে নেবে।

জাকাতের হিসাব থেকে ঋণ বাদ দেওয়া

জাকাতের হিসাব করার সময় একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, জাকাত দাতার ঋণ আছে কি না? যদি ঋণ থাকে, তাহলে জাকাতের মাল থেকে ঋণ পরিমাণ বাদ দিতে হবে। তারপর যে টাকা অবশিষ্ট থাকবে এর ওপর শতকরা আড়াই টাকা হারে জাকাত আদায় করবে। জাকাতের হিসাবের ক্ষেত্রে উত্তম হলো, যে পরিমাণ টাকা জাকাত আসবে তা মূল সম্পদ থেকে বের করে পৃথকভাবে সংরক্ষণ করে রাখবে। এরপর সময় সুযোগ বিবেচনা করে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে থাকবে। মোটকথা এটি জাকাতের হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি।

ঋণ দুই প্রকার

ঋণের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ঋণ দু প্রকার ১. সাধারণ ঋণ। যা মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে বা অস্বাভাবিক অবস্থায় নিতে বাধ্য হয়। ২. বড়ো কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যবসায়িক প্রকল্প খোলার জন্য যে ঋণ নেওয়া হয়। যেমন কল-কারখানা নির্মাণ, মেশিনারিজ ক্রয় বা ব্যবসায়িকপণ্য আমদানি করার জন্য যে ঋণ নেওয়া হয় অথবা এমনও হতে পারে যে, একজন শিল্পপতির প্রথমে দুটি ফ্যাক্টরি ছিলো। কিন্তু এখন সে আরও একটি ফ্যাক্টরি চালু করতে চাচ্ছে। আর তার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে।

এখন কথা হলো, দ্বিতীয় প্রকারের যে ঋণ আছে, তা যদি সামগ্রিক সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তো তাদের ওপর এক পয়সাও জাকাত আসবে না বরং সে নিজে এখন জাকাত খাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে। কারণ, তার কাছে যে পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তার চেয়েও বেশি সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে। বাহ্যত এখন সে ফকির-মিসকিন-রূপান্তরিত হয়েছে। তাই এ জাতীয় ঋণ বাদ দেওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত পার্থক্য করেছে।

ব্যবসায়িক ঋণ কখন বাদ দেওয়া হবে?

ঋণের প্রথম যে প্রকার আছে, তা জাকাতের সামগ্রিক হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে। তা বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের হিসাব করে জাকাত আদায় করতে হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার ঋণের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি ব্যাবসার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে, আর সেই ঋণ এমন জিনিস কেনার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে; যা জাকাত যোগ্য। যেমন : ঋণের টাকা দিয়ে কাঁচামাল কিনলো অথবা ব্যবসায়িক পণ্য কিনলো, তাহলে সেই ঋণের অংশকে জাকাতযোগ্য সকল সম্পদের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে। তবে যদি ঋণের সেই অর্থ এমন মাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা জাকাত অযোগ্য, তাহলে সেই ঋণকে জাকাতযোগ্য সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া যাবে না।

ঋণের উদাহরণ

মনে করুন, এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। সে এই টাকায় একটি মেশিন বাহির থেকে আমদানি করেছে। যেহেতু এই মেশিন

জাকাতযোগ্য সম্পদ নয়, তাই এই মেশিনের মূল্য জাকাতযোগ্য সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে না। তবে যদি ঋণের সেই অর্থ দিয়ে কাঁচামাল খরিদ করে আর কাঁচামাল যেহেতু জাকাতযোগ্য সম্পদ তাই এই ঋণ সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হবে। কারণ, ঋণের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া হলেও কাঁচামাল তো আগে থেকেই সামগ্রিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

সারমর্ম হলো, স্বাভাবিক ঋণের পুরোটাই জাকাতযোগ্য সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ যাবে। আর যে ঋণ উৎপাদনের কাজের জন্য নেওয়া হয়েছে সে ক্ষেত্রে যদি ঋণ দিয়ে জাকাত-অযোগ্য সামগ্রী কেনা হয়, তাহলে ঋণের অর্থ জাকাতের হিসাব থেকে বাদ যাবে না। আর যদি জাকাত যোগ্য সামগ্রী কেনা হয়, তাহলে ওই ঋণ হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে। এ হলো জাকাত বের করার ব্যাপারে শরিয়তের বিধান।

উপযুক্ত ব্যক্তিকে জাকাত দিতে হবে

অপরদিকে জাকাত আদায়ের ব্যাপারেও শরিয়তের বিধিবিধান রয়েছে। আমার সম্মানিত পিতা মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. বলেন, মহান আল্লাহ বলেননি, তোমরা জাকাত বের করো। তিনি এমনও বলেননি, তোমরা জাকাতের অর্থ নিক্ষেপ করো। বরং তিনি বলেছেন, 'তোমরা জাকাত আদায় করো'। অর্থাৎ, এমন খাতে জাকাত দাও যা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে প্রকৃত হকদাররাই জাকাতের অর্থ পায়। অনেক লোক হিসাব করে জাকাতের অর্থ আদায় করে। তবে প্রকৃত হকদারের কাছে জাকাতের অর্থ পৌঁছলো কি না সে ব্যাপারে উদাসীন থাকে। হিসাব করে জাকাতের অর্থ একজনের কাছে দিয়ে দেয়। কিন্তু যাচাই করে দেখে না যে, সে প্রকৃত হকদারকে জাকাত দিয়েছে কি না? বর্তমানকালে অনেক প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যারা জাকাত উসুল করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা প্রায় সময়ই এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে না যে, জাকাতের অর্থ জাকাতের উপযুক্ত খাতে ব্যয় হচ্ছে কি না? সে জন্যেই মহান আল্লাহ বলেছেন, জাকাত আদায় করো। অর্থাৎ, জাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে জাকাত দাও।

জাকাতের প্রকৃত হকদার

কারা জাকাতের প্রকৃত হকদার এ ব্যাপারে শরিয়ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যে, যারা নেসাবের মালিক নয়, তারাই জাকাতের প্রকৃত হকদার। এমনকি যে ব্যক্তির মালিকানায় প্রয়োজনতিরিক্ত আসবাবপত্র সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্য সমপরিমাণ মূল্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়; এমন ব্যক্তিকেও জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না। জাকাতের প্রকৃত হকদার এমন ব্যক্তি যার কাছে সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ মূল্য কিংবা এই পরিমাণ মূল্যের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাব নেই।

হকদারকে জাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দিতে হবে

এ ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, জাকাতের হকদারকে জাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, হকদার যেনো তাতে পূর্ণ মালিকানা পায় ও স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এ জন্যই কোনো বিল্ডিং নির্মাণ কাজে জাকাতের অর্থ খরচ করা যায় না এবং কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন ভাতাও দেওয়া যায় না। যদি এমনটি করার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে লোকেরা নিজেরাই জাকাতের অর্থ খেয়ে সাবাড় করে ফেলতো। কারণ, নির্মাণ কাজের খরচ প্রচুর। লক্ষ লক্ষ টাকা তাতে ব্যয় হয় প্রবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতনও বেশি হয়ে থাকে। তাই শরিয়ত এ ক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছে যে, নেসাবের মালিক নয় এমন ব্যক্তিকে জাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দাও। মূলত জাকাতের টাকার প্রকৃত হকদার গরিব, মিসকিন ও অসহায় দুর্বল ব্যক্তিরা। তাই জাকাতের অর্থ তাদের হাতেই পৌঁছা জরুরি। যখন তোমরা তাদেরকে মালিক বানিয়ে দেবে তখন তোমাদের জাকাত আদায় হবে।

আত্মীয় স্বজনদের মাঝে কাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে?

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান তথা জাকাত দেওয়ার নির্দেশটি মানবজাতির অন্তরে একটি উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসার জন্ম দেয় যে, আমার কাছে জাকাতের এই পরিমাণ অর্থ বিদ্যমান আছে। এগুলোকে জাকাতের সঠিক খাতে ব্যয় করতে হবে। তাই সে জাকাতের হকদারকে খোঁজ করে। তালিকা তৈরি করে এবং তাদের কাছে জাকাতের অর্থ পৌঁছে দেয়। মূলত এটি মানুষের দায়িত্ব যে, নিজ মহল্লা,

পাড়া-প্রতিবেশি, প্রিয়জন, আপনজন, বন্ধু-বান্ধব ও যাদের সঙ্গে চলাফেরা করে তাদের খোঁজ করে, এদের মধ্যে যারা জাকাতের হকদার তাদের কাছে জাকাতের অর্থ পৌঁছে দেয়। এদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম হলো, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া। এতে দ্বিগুণ সওয়াব হবে। জাকাত দেওয়ার সওয়াব তো আছেই, পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য রয়েছে আরেক দফা সওয়াব। সকল আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া যায়; তবে শুধু দুই শ্রেণীর আত্মীয় এমন আছে যাদেরকে জাকাত দেওয়া যায় না। ১. জন্মসূত্রের সম্পর্ক। সুতরাং পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে জাকাত দিতে পারবে না। ২. বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্ক। সুতরাং স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে না। তাছাড়া অন্যান্য সকল আত্মীয়স্বজনকে জাকাত দিতে পারবে। যেমন ভাই-বোন, চাচা-চাচী, খালা-ফুফু এবং মামাকে জাকাত দেওয়া যাবে। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে জরুরি হলো, এ সকল আত্মীয়স্বজন জাকাতের হকদার কি না এবং নেসাবের মালিক কি না তা অবশ্যই জেনে নিতে হবে।

বিধবা ও এতিমদের জাকাত দেওয়ার বিধান

অনেকে মনে করে, কোনো নারী বিধবা হলেই জাকাত দেওয়া যায়। অথচ এ ক্ষেত্রেও শর্ত হলো, সে জাকাতের হকদার হওয়া ও নেসাবের মালিক না হওয়া। বিধবা যদি জাকাতের হকদার হয়, তাহলে তাকে জাকাত দেওয়া খুবই ভালো কথা। হাঁ কোনো নারী বিধবা, কিন্তু সে জাকাতের হকদার নয়, তাহলে সে শুধু বিধবা হওয়ার কারণে জাকাতের হকদার বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে এতিমদেরকে জাকাত দেওয়া এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা খুবই ভালো কাজ। তবে এ বিষয়টি অবশ্যই জেনেশুনে জাকাত দিতে হবে যে, তারা জাকাতের হকদার কি না? অতএব যদি কোনো এতিম এমন হয় যে, সে জাকাতের হকদার নয়, বরং নেসাবের মালিক, তাহলে তাকে এতিম হওয়া সত্ত্বেও জাকাত দেওয়া যাবে না। এ জাতীয় বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে জাকাত আদায় করা জরুরি।

ব্যাংক কর্তৃক জাকাত কর্তনের বিধান

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে সরকারি তত্ত্বাবধানে জাকাত উসুলের প্রথা জারি হয়েছে। সেই লক্ষ্যে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার জাকাত উসুল

করছে। কোম্পানিগুলোও জাকাতের টাকা কর্তন করে সরকারকে দিয়ে দিচ্ছে। এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার ইচ্ছে করছি। যে-কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জাকাতের অর্থ কর্তন করার দ্বারা জাকাত আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার জাকাত আদায়ের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে সতর্কতামূলক কাটার সময়ের আগেই এমন নিয়ত করে নেবে যে, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমার সম্পদ থেকে যে পরিমাণ জাকাতের অর্থ কর্তন করতে চাচ্ছে, আমি নিজেই তা আদায় করে দিচ্ছি। এমনটি করা হলে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় জাকাত আদায় করতে হবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ এমন ধারণা করে যে, আমাদের পুরো সম্পদের ওপর এখনো পূর্ণ এক বছর অতিক্রম করেনি। অথচ এসব প্রতিষ্ঠান পুরো সম্পদের জাকাত কর্তন করে নিচ্ছে। এ বিষয়ে আগেই বলে এসেছি যে, প্রত্যেক অর্থের ওপর বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি নয়। বরং আপনি যদি নেসাবের মালিক হন, তাহলে বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন আগেও যদি আপনার কোনো অর্থ হস্তগত হয়; আর এর জাকাতের অর্থ কর্তন করে তবুও সেটি সহিহ বলে গণ্য হবে। কারণ, এর উপরেও জাকাত ওয়াজিব ছিলো।

কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারের জাকাত কর্তন

কোম্পানির শেয়ারের ক্ষেত্রে একটি মাসআলা হলো, কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারকে বার্ষিক মুনাফা দেওয়ার সময় জাকাতের অর্থ কর্তন করে রাখে। তবে কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার থেকে জাকাতের যে অর্থ কর্তন করে তা শেয়ারের 'ফেইস ভ্যালুর' ওপর ভিত্তি করে কর্তন করে। অথচ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী 'মার্কেট ভ্যালুর' ওপর জাকাত ওয়াজিব হয়। তাই 'ফেইস ভ্যালুর' ওপর কর্তিত জাকাতের অর্থ আদায় হয়ে গেলেও 'মার্কেট ভ্যালুর' সঙ্গে যে পার্থক্য রয়েছে তা পরবর্তীকালে সামঞ্জস্য করে আদায় করে নিতে হবে। যেমন এক শেয়ারের 'ফেইস ভ্যালু' ৫০ টাকা। অথচ তার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে ৬০ টাকা। আর কোম্পানি তো ফেইস ভ্যালু তথা ৫০ টাকার জাকাত কর্তন করেছে। সুতরাং আরও ১০ টাকার জাকাত নিজের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। কোম্পানির শেয়ার এবং এন.আই.টি ইউনিট এই উভয় প্রকারে জাকাতের বিধান উল্লিখিত পদ্ধতিতে হবে। এরপর যেখানেই ফেইস ভ্যালুর হিসাবে জাকাত আদায় করা হবে; সেখানেই মার্কেট ভ্যালুর হিসাব করে অতিরিক্ত অংশের জাকাত নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দিতে হবে।

কোনটি হবে জাকাত আদায়ের তারিখ?

জাকাত আদায়ের সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নেই যে, অমুক তারিখে বা অমুক সময়ে জাকাত আদায় করতে হবে। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জাকাত আদায়ের স্বতন্ত্র তারিখ হতে পারে। জাকাত আদায়ের তারিখের ব্যাপারে শরিয়তের বিধান হলো, যে তারিখে ওই ব্যক্তি প্রথমবার নেসাবের মালিক হবে, যেমন : এক ব্যক্তি মুহাররমের ১ম তারিখে প্রথমবার নেসাবের মালিক হয়েছে। তখন তার জাকাত আদায়ের তারিখ হলো মুহাররমের ১ম তারিখ। এখন থেকে পরের বছরগুলোতে মুহাররমের ১ তারিখে নিজ সম্পদের জাকাতের হিসাব করে আদায় করতে হবে। তবে অধিকাংশ সময় দেখা যায় এ তারিখটি মানুষের স্মরণ থাকে না যে, আমি কোন তারিখে নেসাবের মালিক হয়েছি? সুতরাং এই অপারগতার কারণে এমন একটি তারিখ নির্দিষ্ট করতে হবে; যে তারিখে হিসাব করা তার জন্য সহজ হয়। তারপর থেকে সব সময় সেই তারিখ বিবেচনা করে জাকাত আদায় করবে। তবে সতর্কতামূলক কিছু বেশি অর্থ আদায় করে দেওয়া উচিত, যাতে করে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়।

জাকাত আদায়ের জন্য কি রমজান নির্দিষ্ট?

আজকাল সাধারণত মানুষ রমজান মাসে জাকাত আদায় করে থাকে। কারণ হলো, হাদিস শরিফে এসেছে; রমজান মাসে এক ফরজে সত্তর ফরজের সওয়াব[৫৯]। সুতরাং জাকাত যেহেতু একটি ফরজ ইবাদত, তাই তা রমজান মাসে আদায় করলে সত্তর ফরজের সওয়াব পাওয়া যাবে। অবশ্যই এ কথা স্বস্থানে ঠিক আছে এবং এই আগ্রহ থাকা প্রশংসনীয়। কিন্তু কারও যদি নেসাবের মালিক হওয়ার তারিখ জানা থাকে; তাহলে শুধু এই ফজিলত লাভের আসায় রমজানের কোনো তারিখ নির্ধারণ করা যাবে না। হাঁ এই ফজিলত লাভ করার জন্য এমনটি করা যেতে পারে যে, অল্প অল্প করে জাকাত আদায় করতে থাকবে। অবশিষ্ট অর্থ রমজান মাসে গিয়ে পূর্ণ করবে। হাঁ তারিখ যদি স্মরণ না থাকে, তাহলে রমজান মাসের কোনো তারিখ নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। তবে সতর্কতামূলক একটু বেশি অর্থ আদায় করা উচিত, যাতে করে তারিখ আগ-পিছ হওয়ার কারণে যে পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাও পূর্ণ হয়ে যায়। একবার যখন তারিখ নির্দিষ্ট

---

[৫৯] হাদিসটি খুবই দুর্বল।

হয়ে যাবে; এরপর থেকে প্রতি বছর ওই তারিখে দেখবে যে, আমার কী পরিমাণ সম্পদ আছে? নগদ অর্থ কত আছে? যদি স্বর্ণ-রৌপ্য থাকে, তাহলে বাজার যাঁচাই করে নেবে। শেয়ার থাকলে তার মার্কেট ভ্যালু জেনে নেবে। মাল স্টক থাকলে তার মূল্য জেনে নেবে। এভাবে সমুদয় সম্পদের হিসাব করে প্রতি বছর ওই একই তারিখে জাকাত আদায় করবে। সেই তারিখের আগ-পিছ করা আদৌ উচিত হবে না।

মোটকথা, এই হলো জাকাতের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

আলোচনার পর উপস্থিত শ্রোতাদের পক্ষ থেকে লিখিত আকারে বেশকিছু প্রশ্ন করা হয়। শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) সেসব প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

চাঁদের তারিখ নির্দিষ্ট করা

প্রশ্ন : জাকাতের হিসাবের জন্য কি ইংরেজি তারিখ নির্দিষ্ট করতে হবে, নাকি চন্দ্র মাসের তারিখ নির্দিষ্ট করা জরুরি?

উত্তর : চন্দ্র মাস অনুযায়ীই তারিখ নির্দিষ্ট করা জরুরি। ইংরেজি তারিখ নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়।

অলংকারের জাকাত কার দায়িত্বে?

প্রশ্ন : অনেক মহিলা নিজের স্বামীকে তার অলংকারের জাকাত আদায় করতে বলে। কারণ, তাদের কাছেতো জাকাত আদায়ের কোনো অর্থ নেই। জানার বিষয় হলো, এ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর অলংকারের জাকাত আদায় করে দেয়; তাহলে কি জাকাত আদায় হবে?

উত্তর : এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক তার ওপর জাকাত ফরজ। আর সে নিজেই এর

দায়িত্বশীল। যেভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নামাজের জন্য নিজে দায়িত্বশীল ঠিক সেভাবে জাকাতের ক্ষেত্রেও যার ওপর জাকাত ফরজ সে নিজে এর দায়িত্বশীল। অতএব যেভাবে স্বামীর দায়িত্বে স্ত্রীর নামাজের দায়িত্ব বর্তায় না, সেভাবে স্ত্রীর জাকাতও কখনো স্বামীর দায়িত্বে বর্তাবে না। যদি স্ত্রী নেসাবের মালিক হয়, তাহলে জাকাত আদায়ের দায়িত্ব তারই। স্ত্রীর এ দাবি করা যে, আমার কাছে জাকাত আদায়ের অর্থ নেই, এটি কোনো যৌক্তিক দাবি না। কারণ, অর্থ যদি নাই থেকে থাকে, তাহলে জাকাত ওয়াজিব হলো কোত্থেকে? আর স্ত্রীর কাছে যদি শুধু অলংকার থাকে এবং সে জন্য তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হয় তাছাড়া নগদ কোনো অর্থ তার হাতে না থাকে; তাহলে সে অলংকার বিক্রয় করে জাকাত আদায় করবে। তবে স্বামী খুশি মনে তার জাকাত আদায় করে দিলে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্ত্রীর দায়িত্বে ওই অলংকারের জাকাত ওয়াজিব হয় যে অলংকার তার মালিকানায় আছে। যদি সেটি স্বামীর মালিকানাধীন থাকে; চাই সেই অলংকার স্ত্রী পরিধান করুক, তাহলে স্বামীর দায়িত্ব এর জাকাত আদায় করা। স্ত্রীর দায়িত্ব নয়।

জাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি

প্রশ্ন : অনেক বিত্তবানের অবস্থা হলো, নিজের এলাকায় অসংখ্য গরিব-অসহায় থাকা সত্ত্বেও কোনো সংস্থার কাছে জাকাতের অর্থ দিয়ে দেয়। তারপর সেই সংস্থার লোকেরা হিলা-বাহানা করে বিভিন্ন কবরস্থান, বিয়ে-শাদি ইত্যাদির মাঝে সেই টাকা খরচ করে থাকে। এতে করে দেখা যায় গরিব-অসহায় যারা তাদের ভাগ্যে আর জাকাতের অর্থ জোটে না। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে জাকাত আদায় সহিহ হবে কি না?

উত্তর : ইতোপূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যে দরিদ্র ব্যক্তি-নেসাবের মালিক নয়; এমন ব্যক্তিকে জাকাতের অর্থ দিয়ে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি। যদি এমন কোনো খাতে জাকাতের অর্থ খরচ করা হয় যেখানে মালিক বানানোর অর্থ পাওয়া যায় না, যেমন : বিল্ডিং নির্মাণ করা, কিংবা কবরস্থান কিনে ওয়াকফ করে দেওয়া বা মসজিদ নির্মাণ করা। এ জাতীয় কোনো খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

আর বর্তমান সমাজে মালিক বানানোর নামে হিলা-বাহানার যে প্রথা জারি হয়েছে অর্থাৎ, কোনো দরিদ্রকে জাকাতের অর্থ দিয়ে বলা হয় যে, তুমি এই টাকাগুলো অমুক কাজে খরচ করে দাও। অথচ সেই দরিদ্র নিজেও জানে যে, এর দ্বারা আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। বাস্তব অর্থে জাকাতের এই অর্থে আমার ন্যূনতম ইচ্ছাধিকারও নেই। এটি নিঃসন্দেহে একটি বাহানা মাত্র। এমনটি করার দ্বারা জাকাতের অর্থে কোনো প্রকার পরিবর্তন হবে না। (অর্থাৎ, জাকাত আদায় হবে না।)

প্রচার প্রসারের কাজে জাকাতের অর্থ ব্যয়

প্রশ্ন : আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠান এমন আছে; যারা জাকাত বা এ জাতীয় অন্য কোনো অনুদান সংগ্রহ করার জন্য প্রচার-প্রসার করে থাকে। আর সেই প্রচার-প্রসারের কাজে খরচ করা হয় জাকাতের অর্থ। এখন প্রশ্ন হলো, এ জাতীয় প্রচার-প্রসারের কাজে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েজ হবে কি না?

উত্তর : প্রচার-প্রসারের কাজে জাকাতের অর্থ খরচ করা জায়েজ নেই।

মাদরাসার ছাত্রদের জাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : জাকাতের সর্বোত্তম খাত হলো, গরিব-মিসকিন। কিন্তু আমাদের এখানে দীনি মাদরাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কারণে আজকাল এ খাতটি প্রায় বিলুপ্তির পথে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ জাকাতের অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। তারপর সেটিকে তারা 'তামলিক'-এর মাধ্যমে মসজিদ ও মাদরাসার নির্মাণ কাজে পর্যন্ত ব্যয় করছে। আর সেসব গরিব-অসহায় যারা পুরো বছর জাকাতের আশায় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-শাদিসহ অন্যান্য কাজ স্থগিত রেখেছিলো তারা বঞ্চিত হচ্ছে!

উত্তর : যে সকল প্রতিষ্ঠানে সহিহ পন্থায় জাকাতের অর্থ খরচ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। সেসব প্রতিষ্ঠানে জাকাতের অর্থ না দেওয়া উচিত। বরং গরিবদের মালিক বানিয়ে জাকাত দেওয়া জরুরি। হাঁ! তবে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে সঠিক পন্থায় জাকাতের অর্থ খরচ করার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে

সেখানে জাকাত দিতে কোনো বাঁধা নেই। কারণ, যেমনিভাবে গরিব ও অসহায় ব্যক্তিরা জাকাতের হকদার তেমনিভাবে যেসব ছাত্র গরিব এবং ইলম শেখার সঙ্গে জড়িত, তারা আরও বেশি হকদার। কারণ, তারা দীনের তালিমের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে দিয়েছে। তাই যেসব প্রতিষ্ঠানে সঠিক পন্থায় জাকাত খরচ করার ব্যবস্থা বিদ্যমান; সেখানে অবশ্যই জাকাত দেওয়া উচিত। হাঁ! তবে যদি নিজের আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশির মাঝে জাকাতের হকদার থাকে, তাহলে তারা অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবে। তাদেরকে দেওয়ার পর ওইসব প্রতিষ্ঠানে দেওয়া উচিত।

নির্ধারিত তারিখে নেসাবের চেয়ে সম্পদ কম হলে

প্রশ্ন : যদি জাকাত আদায়ের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট থাকে। আর বছর শেষে ওই তারিখ আসার পর দেখা গেলো, তার সম্পদ নেসাবের চেয়ে কম। তাহলে কি জাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর : জাকাতের হিসাব করার যে তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে যদি সেই তারিখে নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে, তাহলে জাকাত ওয়াজিব হবে না।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হওয়ার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : প্রয়োজনের অতিরিক্তি সম্পদ হবার ব্যাখ্যা কি? কারণ, প্রয়োজনের ধরন-প্রক্রিয়া ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

উত্তর : প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ হওয়ার অর্থ হলো, ঘরের খাবার-দাবার, ব্যবহারের জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র—এ সবই প্রয়োজনের মাঝে শামিল। তবে অনেক সময় ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনের ধরন-প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কারও কাছে খুব বেশি মেহমান আসা-যাওয়া করে। ফলে মেহমানের জন্য অনেক বিছানাপত্রসহ আরও কিছু জিনিসের প্রয়োজন থাকে। আবার অনেক লোক এমনও আছে যাদের কাছে মেহমান তেমন আসে না, তাদেরও যদি এত পরিমাণ সামানপত্র থাকে, তাহলে সেটি হবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। কারণ, দেখা যায়; সেগুলো

কোনো সময় ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। মোটকথা, এটি জেনে রাখুন যে, যেসব জিনিসের কখনো ব্যবহারের পালা আসে না সেসব জিনিসকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে করা হবে।

টেলিভিশন প্রয়োজনের অতিরিক্ত

প্রশ্ন : টেলিভিশন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : নিঃসন্দেহে টেলিভিশন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ।

নির্মাণকাজে জাকাতের অর্থ খরচ করার বিধান

প্রশ্ন : হাসপাতাল বা মাদরাসা ভবন নির্মাণে জাকাতের অর্থ খরচ করতে চাইলে এর বিধান কী হবে?

উত্তর : প্রকৃত অর্থে নির্মাণ কাজে জাকাতের অর্থ খরচ করার কোনো সুযোগ নেই। আজকাল হিলা-বাহানার যে প্রচলন সমাজে প্রচলিত আছে, তা মোটেই শরিয়ত-সম্মত নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের জানা আছে, এতে 'তামলিক' (মালিক বানিয়ে দেওয়া)-এর লেশমাত্র নেই। এমন হিলা-বাহানা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এমনটি হতে পারে যে, যাদের জন্য এই নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে, তাদেরকে এর মালিকানা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। আর যেহেতু তারা জানে যে, এই অর্থ আমাদের জন্যই এবং আমাদের খাতেই ব্যয় হবে; এই ভেবে যদি তারা স্বেচ্ছায় খুশি মনে নির্মাণ কাজের জন্য টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে এমনটি করার সুযোগ রয়েছে।

জাকাতের অর্থ দিয়ে খাবার খাওয়ানো

প্রশ্ন : জাকাতের অর্থ দিয়ে খাবার রান্না করে গরিব অসহায়দেরকে খাওয়ালে জাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : জাকাতের অর্থ দিয়ে খাবার রান্না করে প্রকৃত হকদারদেরকে সেই খাবারের মালিক বানিয়ে দিলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

জাকাতের অর্থ দিয়ে কিতাব কিনে দেওয়া

প্রশ্ন : কিতাব প্রচার-প্রসারে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে কি না?

উত্তর : কিতাব প্রচার-প্রসারে জাকাতের অর্থ ব্যয় করার কোনো সুযোগ নেই। তবে যদি সেসব কিতাব কিনে জাকাতের হকদারদেরকে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ

প্রশ্ন : এমন কোনো ব্যবসায়িকপণ্য যার নির্ধারিত মূল্য নিশ্চিতভাবে জানা নেই এবং সেই পণ্যটি বাজারে খুব ব্যাপকহারে বেচাকেনাও হয় না। এমনকি সেই পণ্যটি খুব তাড়াতাড়ি বেচাকেনা হবার সম্ভাবনাও নেই। এমন পণ্যের মূল্য কীভাবে নির্দিষ্ট করা হবে?

উত্তর : ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে অভিজ্ঞতার আলোকে। অত্যন্ত নীতি ও ইনসাফ এবং সাবধানতার সঙ্গে তার একটি আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সে অনুযায়ী হিসাব করে জাকাত আদায় করবে।

জাকাত হিসেবে ব্যবসায়িকপণ্য দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : আমাদের কাছে একটি ব্যবসায়িকপণ্য আছে। যা এখনো বিক্রয় হয়নি। এমন কোনো পণ্য কি আমরা জাকাত হিসেবে দিতে পারবো?

উত্তর : হ্যাঁ জাকাত হিসেবে ওই পণ্য দেওয়া যাবে। সুতরাং ব্যবসায়িকপণ্যের জাকাতের ক্ষেত্রে এটি জরুরি নয় যে, জাকাত হিসেবে নগদ টাকা দিতে হবে। বরং যে পণ্যের জাকাত দিচ্ছে; সেই পণ্য দিয়েও জাকাত আদায় করা যাবে। তবে সেই পণ্যটি যদি সাধারণভাবে ব্যবহার না হয় এবং গরিব অসহায়দের কোনো উপকারে না আসে, তাহলে উচিত হলো ইনসাফের সঙ্গে সেই পণ্যের আনুমানিক একটি মূল্য ধরে সে অনুপাতে নগদ টাকা দিয়ে জাকাত আদায় করা।

আমদানিকৃত পণ্যে জাকাতের বিধান

প্রশ্ন : দেশের বাইরে থেকে ব্যাবসার উদ্দেশ্যে পণ্য কেনা হয়েছে। কিন্তু এখনো সেই পণ্য ক্রেতার নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এ জাতীয় পণ্যের জাকাত কোন হিসাবের ভিত্তিতে দেওয়া হবে?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যদি ওই পণ্য ক্রেতার মালিকানায় এসে যায়। তবে এখনো সেই পণ্য ক্রেতার হস্তগত না হয়, তাহলে ওই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। তবে যদি সেই পণ্য ক্রেতার মালিকানায় না আসে, তাহলে যতো টাকা দিয়ে পণ্যটি কিনেছে শুধুমাত্র ওই টাকার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন ধরা যাক কোনো ব্যক্তি একটি পণ্য আমদানি করলো। আর সেই পণ্য তার মালিকানায় চলে এলো, যদিও বর্তমানে পণ্যটি চালানরত অবস্থায় রয়েছে, হস্তগত হয়নি। এমতাবস্থায় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে জাকাত আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি সেই পণ্য এখনো মালিকানায় না আসে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, চুক্তিটি এখনো সম্পন্ন হয়নি। এমতাবস্থায় পণ্যটি ক্রয় করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, সেই পরিমাণ অর্থের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং ওই পণ্যে কোনো জাকাত আসবে না।

ইংরেজি তারিখ থেকে আরবি তারিখে ফেরার পদ্ধতি

প্রশ্ন : কেউ শুরু থেকেই ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী জাকাত দিয়ে আসছিলো। এখন সে আরবি চন্দ্র তারিখ অনুযায়ী জাকাত দিতে চাইলে কী করতে হবে?

উত্তর : সামনে জাকাত দেওয়ার জন্য চন্দ্র মাসের তারিখ নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী জাকাত আদায় করতে হবে। আর বিগত বছরগুলোতে ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী জাকাত আদায় করতে গিয়ে চন্দ্র মাসের সঙ্গে সামান্য যে ব্যবধান ছিলো, তার হিসাব বের করে জাকাত আদায় করতে হবে অর্থাৎ, প্রতি বছর ২.৬০-এর হিসাবে অতিরিক্ত অংশের জাকাত আদায় করে দিতে হবে।

খাঁটি স্বর্ণের ওপর জাকাত

প্রশ্ন : স্বর্ণের অলংকারে খাদ এবং নাগিনার মূল্যও ওজন অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখন জানার বিষয় হলো, খাদ, নাগিনাসহ পুরো সোনার ওজনের ওপরই

কি জাকাত ওয়াজিব হবে? নাকি খাঁদ ও নাগিনার ওজন ও মূল্য পৃথকভাবে ধরা হবে?

উত্তর : খাঁটি স্বর্ণের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। খাদ ও নাগিনার ওপর জাকাত আসবে না।

মুজাহিদদের জাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যে সকল মুজাহিদ ইসলামের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদরত অবস্থায় রয়েছেন তাদেরকে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ! অবশ্যই তাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে। কারণ, জাকাতের খাতসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য খাত হলো মুজাহিদ।

অল্প অল্প করে জাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো কোনো ব্যবসায়ী জাকাতের অর্থ একসঙ্গে আদায় করে না। বরং অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে জাকাত আদায় করে। উল্লেখ্য যে, পূর্ণ জাকাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত ওই টাকা নিজের ব্যাবসার মাঝে লাগানো থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, এভাবে জাকাত প্রদান করলে জাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : অল্প অল্প করে জাকাত আদায় করা জায়েজ। তবে চেষ্টা করে যত দ্রুত সম্ভব জাকাত আদায় করে দেওয়া উত্তম।

একাধিক গাড়ির জাকাত

প্রশ্ন : যদি কারও কাছে একাধিক গাড়ি থাকে, তাহলে তার জাকাত দিতে হবে কি না?

উত্তর : একাধিক গাড়ি যদি নিজের ব্যবহারের জন্যই থাকে, তাহলে তার ওপর জাকাত আসবে না। তবে যদি কোনো গাড়ি বিক্রয় করার নিয়তে কিনে থাকে, তাহলে জাকাত ওয়াজিব হবে।

ভাড়া বাড়ির জাকাত

প্রশ্ন : ভাড়া দেওয়া বাড়ির ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : ভাড়া দেওয়া বাড়ির ওপর জাকাত ওয়াজিব নয়। তবে ভাড়ার যে অর্থ উসুল হয়, তা নগদ ক্যাশের সঙ্গে মিলিত হয়ে বছর শেষে নেসাবের মালিক হলে জাকাত ওয়াজিব হবে।

ঋণ প্রার্থীকে জাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ঋণ চায়, আর এ সম্ভাবনা থাকে যে, সে ঋণ নিয়ে ফেরত দেবে না, তাহলে ওই ব্যক্তিকে ঋণের কথা বলে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে কি না? এভাবে জাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : হাঁ এভাবে টাকা দিলেও জাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, শুরুতেই জাকাতের অর্থ আদায়ের সময়েই জাকাতের নিয়ত করতে হবে। সঙ্গে এই নিয়তও করতে হবে, যদি সে ঋণ ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তার থেকে ফেরত নেবো না। এভাবে হলে জাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ব্যাংক যদি সঠিক খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় না করে

প্রশ্ন : আপনি ইতোপূর্বে বলেছেন, ব্যাংক জাকাতের অর্থ কর্তন করে। তবে আমরা নিশ্চিত নই যে, ব্যাংক সে অর্থ সঠিক খাতে খরচ করে কি না? এখন যদি ব্যাংক সঠিক খাতে জাকাতের অর্থ খরচ না করে, তাহলে আমাদের জাকাত আদায় হবে কি না? এভাবে জাকাত কর্তন করা হলে কি আমরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবো?

উত্তর : ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারকর্তৃক জাকাতের অর্থ কর্তন করা মাত্রই জাকাত আদায় হয়ে যায়। এখন সরকারের ওপর দায়িত্ব হলো সেই অর্থ সঠিক খাতে ব্যয় করা। যদি তারা সঠিক খাতে ব্যয় করে, তাহলে তারা দায়িত্বমুক্ত হবে। অন্যথায় গুনাহগার হবে। কিন্তু আপনার জাকাত অবশ্যই আদায় হয়ে যাবে।

জাকাত আদায়ের তারিখ পরিবর্তনের বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি জাকাত আদায়ের তারিখ পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে কি সে পরিবর্তন করতে পারবে?

উত্তর : ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জাকাত আদায়ের তারিখ হলো যে তারিখে সে নেসাবের মালিক হয়েছে। আর তারিখ যখন একবার নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তখন সেটিকে আর পরিবর্তন করা ঠিক হবে না।

নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ঋণ হিসেবে কোম্পানি থেকে নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলন করে তাহলে কি সেটি ঋণ বলে গণ্য হবে?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নেয়, তাহলে এই টাকা নিজের জাকাতযোগ্য সামগ্রিক সম্পদ থেকে বাদ যাবে না। কারণ, বাহ্যত এটি ঋণ মনে হলেও কার্যত সেটি তারই টাকা।

জাকাত আদায়ের জন্য নিয়ত করা জরুরি

প্রশ্ন : আমি আমার এক কর্মচারীর বিয়ে উপলক্ষে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে তাকে বল্লাম, এ থেকে ১০ হাজার টাকা তোমার জন্য। আর বাকি ১৫ হাজার টাকা ঋণস্বরূপ দিলাম যা তোমাকে ফেরত দিতে হবে। এই ১৫ হাজার টাকা যদিও জাকাতেরই ছিলো; তবে মনে মনে নিয়ত করেছি যে, সে যখন ১৫ হাজার ফিরিয়ে দেবে, তখন সেই টাকা অন্যকে দিয়ে দিবো। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমার এই ধরনের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে কিনা?

উত্তর : হাঁ যদি প্রথম থেকেই আপনি এই নিয়ত করে থাকেন যে, ১০ হাজার হলো, জাকাত হিসেবে আর বাকি ১৫ হাজার ঋণ হিসেবে, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আপনার ১০ হাজার টাকা জাকাত হিসেবে আদায় হয়ে যাবে। আর বাকি ১৫ হাজারের জাকাত আদায় হবে না। তবে যখন ফেরত দেবে তখন পুনরায় যদি জাকাতের নিয়তে আদায় করে দেওয়া হয়, তাহলে আদায় হয়ে যাবে।

কর্মচারীকে জাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : নিজের কর্মচারীকে কি জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে? তার ক্ষেত্রেও কি নেসাবের মালিক না হওয়া জরুরি?

উত্তর : কর্মচারী হোক বা না হোক, যাকে জাকাতের অর্থ দেওয়া হবে সে অবশ্যই নেসাবের মালিক না হওয়া জরুরি। নেসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকেই জাকাত দেওয়া যাবে না চাই সে কর্মচারীই হোক না কেন? (হাঁ সে যদি নেসাবের মালিক না হয়, তাহলে জাকাত দেওয়া যাবে।) উল্লেখ্য যে, কর্মাচারীকে জাকাতের দেওয়া টাকা তার বেতন থেকে কেটে রাখা জায়েজ হবে না। এমনকি তারা যদি কোনো সময় বেতন বৃদ্ধির আবেদন করে, তাহলে তাদেরকে এ কথা বলে বিরত রাখা যাবে না যে, আমি তো তোমাদেরকে জাকাতের টাকা দিচ্ছি। মোটকথা জাকাতের কোনো প্রভাব কর্মচারীর বেতনের ওপর পড়তে পারবে না।

ছাত্রদেরকে বেতন বাবদ জাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো কোনো মাদরাসায় ছাত্রদের খোরাকি বাবদ প্রতি মাসে পাঁচশত টাকা জাকাত ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ফি এবং খোরাকি বাবদ সেই টাকা তার থেকে উসুল করে নেয়। এভাবে কি জাকাত আদায় হবে?

উত্তর : হাঁ এ পদ্ধতিতে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। এমন পদ্ধতি গ্রহণ করার মাঝে কোনো সমস্যা নেই।

শেয়ারের বার্ষিক মুনাফায় জাকাত

প্রশ্ন : শেয়ারের ওপর প্রাপ্ত বার্ষিক মুনাফায় জাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : জাকাত আদায়ের তারিখে নিজের কাছে থাকা সমুদয় টাকার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। এখন সেই টাকা যে-কোনো উপায়েই তার হস্তগত হোক না কেন। চাই তা শেয়ারের বার্ষিক মুনাফা থেকে হোক কিংবা হাদিয়া বা ব্যাবসার মাধ্যমে হোক। প্রাপ্ত সব টাকার ওপর জাকাত ওয়াজিব।

শেয়ারের মূল্য কোনটি গ্রহণযোগ্য?

প্রশ্ন : যদি কেউ এই নিয়তে শেয়ার কিনে যে, বাজার দর চড়া হলে শেয়ার বিক্রয় করে দেবে। কিন্তু বাজার দরে ধ্বস নামায় সে আর তা বিক্রয় করেনি। এমতাবস্থায় জাকাত আদায়ের তারিখ চলে এসেছে। এখন সে কি শেয়ারের ক্রয়মূল্য অনুযায়ী জাকাত আদায় করবে নাকি বাজার দর অনুযায়ী জাকাত আদায় করবে?

উত্তর : বর্তমান বাজারে শেয়ারের যে মূল্য আছে সে অনুযায়ী জাকাত প্রদান করবে। চাই বাজার দর কমে যাক বা চড়া হোক।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানপত্র থাকা সত্ত্বেও জাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কারও বাড়িতে বাহ্যত প্রয়োজন এমন সামানপত্র থাকে, যেমন টিভি বা ভিসিআর ইত্যাদি। তবে তার কাছে চিকিৎসা, ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা ও বিয়ে-শাদীর প্রয়োজন পূরণ করার মতো কোনো টাকা নেই; ফলে কার্যত সে বড়ো অসহায়; কিন্তু শরম-লজ্জার কারণে মানুষের কাছে হাতও পাততে পারে না, তাহলে এমন ব্যক্তিকে কি জাকাত দেওয়া যাবে?

উত্তর : বাস্তবেই যদি ওই ব্যক্তির এ জাতীয় জরুরি কাজ সম্পাদনের জন্য টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে সর্বপ্রথম ঘরের টিভি, ভিসিআর এগুলো বিক্রয় করে প্রয়োজন পূরণ করবে। এ জাতীয় প্রয়োজন অতিরিক্ত সামানপত্র বিক্রয় করার পর যদি সে জাকাতের হকদার হয়, তাহলে তাকে জাকাতের অর্থ দেওয়ার অবকাশ রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় জেনে নেওয়া উচিত যে, যার মালিকানায় টিভি বা ভিসিআর আছে তাকে জাকাত দেওয়া না গেলেও তার স্ত্রী, সন্তানদের মধ্যে যারা নেসাবের মালিক নয় তাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে।

অসুস্থ ব্যক্তিকে জাকাত হিসেবে ঔষধ দেওয়া

প্রশ্ন : এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে খুবই গরিব ও অসহায়। আবার সে সাইয়েদ বংশেরও নয়। এমন ব্যক্তিকে ডাক্তার জাকাত হিসেবে ওষুধ দিতে পারবে কি?

উত্তর : হাঁ এমন ব্যক্তিকে ডাক্তার সাহেব জাকাত হিসেবে ওষুধ দিতে পারবেন।

কিশোরীদের অলংকারে জাকাতের বিধান

প্রশ্ন : অনেক সময় পিতা-মাতা ছোট মেয়েদেরকে বিয়ের আগে অলংকার বানিয়ে দেয়। এইসব মেয়ের আয়েরও কোনো মাধ্যম নেই। তবে এই কিশোরীরা ওই অলংকারের মালিক। এখন সেই কিশোরীরা কীভাবে জাকাত আদায় করবে?

উত্তর : যদি কিশোরীরা নাবালেগ হয়। আর পিতা-মাতা তাদেরকে এভাবে অলংকারের মালিক বানিয়েছে যে, না তাদের থেকে এগুলো নেওয়া হবে। আর না এগুলো অন্য কাউকে দেওয়া হবে। তাহলে এ অবস্থায় এই অলংকারের কোনো জাকাত আসবে না। কারণ, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নাবালেগের ওপর জাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যদি মেয়ে বালেগা হয় আর পিতা-মাতা তাকে অলংকারের মালিক বানিয়ে দেয়, তাহলে স্বয়ং এই মেয়ের ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি তার আয়ের কোনো উৎস না থাকে তাহলে পিতা-মাতাকে তার অনুমতি সাপেক্ষে এর জাকাত আদায় করে দিতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অলংকার বিক্রয় করে জাকাত আদায় করতে হবে।

অলংকার বিক্রয় করে জাকাত আদায় করবে কি?

প্রশ্ন : এভাবে যদি প্রতি বছর অলংকার বিক্রয় করে জাকাত আদায় করে, তাহলে তো এমন সময় আসবে যে, আর অলংকারই থাকবে না।

উত্তর : সব অলংকারতো শেষ হবে না বরং এক সময় সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য-এর (কিংবা সাড়ে সাত তোলা সোনার) চেয়ে একটু কম অবশ্যই হয়ে যাবে। আর যখন কম হয়ে যাবে তখন তো আর জাকাতই ওয়াজিব হবে না।

নির্দিষ্ট তারিখে জাকাতের হিসাব জরুরি

প্রশ্ন : বিয়ে-শাদি উপলক্ষ্যে যে উপহার উপঢৌকন পেয়েছে সবগুলো মিলিয়ে দেখা গেলো, নেসাব পরিমাণ হয়ে গেছে। এখন যদি পরবর্তী বছর পর্যন্ত সেই নেসাবের মালিক থাকে, তাহলে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব। এক পর্যায়ে দেখা গেল, পরবর্তী বছর সেই তারিখটি চলে এসেছে কিন্তু এখনো রমজান আসতে আরও পাঁচ মাস বাকি। এখন কি সে রমজান আসলে এক বছর পাঁচ মাসের জাকাত আদায় করবে; না সে অন্যকোনো পন্থা অবলম্বন করবে?

উত্তর : সে এমন কোনো পন্থাও অবলম্বন করতে পারে যে, যে তারিখে বছর পূর্ণ হয়েছে সে তারিখে জাকাতের হিসাব করবে। এরপর সময়-সুযোগ মতো আদায় করতে থাকবে। হ্যাঁ যদি রমজান পর্যন্ত কোনো উপযুক্ত খাত না পায়, তাহলে অবশিষ্ট জাকাত রমজানে আদায় করবে। কিন্তু যদি তাৎক্ষণিক কোনো খাত পাওয়া যায়। আর তার তীব্র প্রয়োজন থাকে, তাহলে উচিত হবে না জাকাতকে রমজান পর্যন্ত বিলম্ব করা।মহান আল্লাহ চাইলে যে-কোনো সময় প্রকৃত হকদারকে জাকাত দেওয়ার দ্বারা অধিক সওয়াবের আশা করা যায়।

পজিশনের টাকায় জাকাতের হুকুম

প্রশ্ন : কেউ পজিশনের ভিত্তিতে কোন জায়গা কিনলো। এরপর সেটিকে ভাড়ায় দিয়ে দিলো। এর জাকাত কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : পজিশনের ভিত্তিতে কোনো জায়গা কেনা যায় না। বরং ভাড়া নেওয়া যেতে পারে। শরিয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম হলো : পজিশন কোনো জাকাতযোগ্য সম্পদ নয়। বরং যে স্থান ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তার যে ভাড়া আসছে সেটি যখন নগদ অর্থের আকারে জমা হয়ে তার ওপর বছর অতিক্রান্ত হবে তখন তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে। আসলে মালিকের ওপর ওয়াজিব হলো : ওই পজিশনের টাকা ভাড়াগ্রহীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া। চাইলে সে ভাড়া বাড়িয়ে দিতে পারে। (যাতে পজিশনের টাকা নিতে না হয়।)

বাণিজ্যিক সুনামের ভিত্তিতে বিক্রিত বিল্ডিংয়ে জাকাত

প্রশ্ন : যদি কারও কাছে এমন কোনো বিল্ডিং থাকে, যাকে গুডউইল বা ব্যবসায়িক সুনামের ভিত্তিতে বিক্রয় করে দেয়, তাহলে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : বিল্ডিং গুডউইল-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা হোক বা অন্য যে-কোনো পন্থায় বিক্রয় করা হোক। যখনই তার হাতে নগদ অর্থ আসবে তাতে অন্যান্য নগদ অর্থের মতোই বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, বছর শেষে নির্দিষ্ট তারিখ আসার পর যে পরিমাণ অর্থ তার হাতে বিদ্যমান থাকবে তার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে।

যে ঋণ ফিরে পাওয়ার আশা নেই তার বিধান

প্রশ্ন : কেউ যদি বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে আর ক্রেতা সেই টাকা পরিশোধে টালবাহানা করে, তাহলে এর বিধান কি? এ ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা। এক হলো বকেয়া ক্রেতা সবসময় বলে, আমি টাকা পরিশোধ করে দেবো। কিন্তু সে পরিশোধ করে না। আর দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, বকেয়া ক্রেতা পরিষ্কার বলে দেয়, আমি টাকা পরিশোধ করতে পারবো না। অথবা সবসময় অনুপস্থিত থাকে কিংবা বকেয়া ক্রেতা মারা যায়, তাহলে এমতাবস্থায় জাকাতের বিধান কী?

উত্তর : কারও জিম্মায় যদি কোনো ঋণ থাকে, আর সে তা দিতে অস্বীকার করে অথবা উধাও হয়ে যায় কিংবা কোনো ঠিকানা পাওয়া না যায় যে, সে কোথায় গিয়েছে? মোটকথা বাহ্যত টাকা ফিরে পাওয়ার আর কোনো আশা না থাকে, তাহলে এই টাকার ওপর জাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি কেউ বলে, আমি তার ঋণ পরিশোধ করে দেবো, তাহলে বাহ্যত ধরে নেওয়া হবে যে, সে এই কথাটা ভালো নিয়তে বলেছে। যদিও সে সময়মতো তা পরিশোধ করতে না পারে। কিন্তু সুযোগ হলে বাস্তবেই আদায় করে দেবে, তাহলে এমতাবস্থায় জাকাত ওয়াজিব হবে। অবশ্য উক্ত টাকার জাকাত তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করতে হবে এমনটি জরুরি নয়। ঋণের টাকা উসুল হওয়ার পর বিগত সেসব বছরের জাকাতও আদায় করতে হবে যেসব বছরের জাকাত আদায় হয়নি।

তিন তালাকের শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'তিন তালাকের শরয়ি বিধান' এ প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর সাড়া-জাগানো গ্রন্থ 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধটির প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে আরবি থেকে উর্দুতে তরজমা করে দেওয়া হয়েছে।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

একই সঙ্গে তিন তালাকের বিধান

দুটি মাসআলা

যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই মজলিসে অথবা একই শব্দে তিন তালাক দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে শরিয়তের দুটি মাসআলা রয়েছে। প্রথম মাসআলা হলো, একই মজলিসে অথবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া জায়েজ কি না? আর দ্বিতীয় মাসআলা হলো, এভাবে প্রদানকৃত তিন তালাককে এক তালাক ধরা হবে, নাকি তিন তালাক ধরা হবে?

১. একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া জায়েজ কি না?

ইসলামি শরিয়তে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া জায়েজ কি না? এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ হলো, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মালিক রহ.-এর অভিমত হলো, এভাবে তালাক দেওয়া হারাম ও বেদাত। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ.-এরও অনুরূপ একটি অভিমত রয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে ওমর রা., আলি রা., আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা., আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, এভাবে তালাক দেওয়া হারাম নয়। তবে মুস্তাহাব হলো, পবিত্রতার এক পিরিয়ডে তিন তালাক না দেওয়া।[৬০]

ইমাম আবু সাউর ও ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর মাজহাবও অনুরূপ। ইমাম আহমাদ রহ. থেকেও অনুরূপ একটি অভিমত রয়েছে; যে অভিমতটি ইমাম খিরাকি রহ. গ্রহণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে হাসান বিন আলি রা. ও আবদুর রহমান ইবন আউফ রা. থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাআবি এর এমন অভিমতও এমনি।[৬১]

ইমাম শাফিয়ি রহ. উয়াইমির আজলানি রা.-এর ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। যেমনটি সহিহ বুখারি শরিফেও বর্ণিত হয়েছে—

فَلَمَّا فَرَغَا (يعنى من اللعان) قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا.

'যখন স্বামী স্ত্রী লিয়ান করলো, তখন উয়াইমির আজলানি রা. আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসুল, যদি এখনো আমি তাকে নিজের কাছে রাখি, তাহলে মানুষ বলবে আমি তার ওপর মিথ্যার অপবাদ দিয়েছি। এ সময় তিনি তাকে তিন তালাক দেন।'[৬২]

মুসনাদে আহমাদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا هِيَ الطَّلَاقُ. هِيَ الطَّلَاقُ. هِيَ الطَّلَاقُ.

'যদি লিয়ানের পরেও তাকে নিজের বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ রাখি, তাহলে তো আমি তার ওপর জুলুম করেছি। সুতরাং সে তালাক, সে তালাক, সে তালাক।'[৬৩]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দ শুনে তাকে কোনো প্রকার তিরস্কার করেননি যে, তুমি এক মজলিসে কেন তিন তালাক দিলে? সুতরাং রাসুলে আরাবির চুপ থাকাটা প্রমাণ করে যে, এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়া হারাম নয়।

---

[৬০] আল-মুহাজজাব লিস-সিরাজি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৯।

[৬১] আল মুগনি লি ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১০২।

[৬২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২৫৯।

[৬৩] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২৮৩১।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মালিক রহ. প্রমুখ ইমামগণ নাসায়ি শরিফের একটি রেওয়ায়েত দিয়ে দলিল পেশ করেন, যা মাহমুদ ইবন লাবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে—

أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ : «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো যে, এক ব্যক্তি স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবকে খেলনার বস্তু বানিয়েছো? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছি। ওই সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসুল, তাহলে কি আমি তাকে হত্যা করবো?'[৬৪]

এই বর্ণনার সনদ সহিহ।[৬৫] আর হাফেজ ইবনু হাজার রহ. বলেন, এই বর্ণনার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[৬৬]

উল্লেখ্য, মাহমুদ ইবনু লাবিদ রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কোনো হাদিস শুনেছেন এমনটি প্রমাণিত নয়। যদিও কোনো কোনো মুহাদ্দিস তিনি নবিজিকে দেখেছেন বিধায় তাকে সাহাবি হিসেবে গণ্য করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. মুসনাদে আহমাদে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকৃত কিছু হাদিসও উল্লেখ করেছেন। তবে এগুলোর কোনোটির মাঝেই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন এমন কোনো স্পষ্টকথা পাওয়া যায় না।

অধমের অভিমত হলো, এই বর্ণনাটিকে বেশির থেকে বেশি সাহাবির মুরসাল বলা যাবে। আর মুরসালে সাহাবি দলিল হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে ও ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাঝে ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং বর্ণনাটি সহিহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই।

---

[৬৪] সুনানে নাসাই, হাদিস : ৩৪০১।

[৬৫] যেমন 'আল জাওহারুন নাকি' গ্রন্থে রয়েছে। তাছাড়া ইবনু কাসির রহ. বলেন, এই বর্ণনাটির সনদ ভালো। যেমনটি 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে রয়েছে—সম্পাদক

[৬৬] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩১৫।

হানাফিগণ সাইদ ইবনু মানসুর রহ. এর নিম্নোক্ত বর্ণনার মাধ্যমেও দলিল পেশ করেন—

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ.

'আনাস রা. বলেন, ওমর রা.-এর কাছে যখন এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হতো যে নিজ স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে। তখন ওমর রা. তাকে কোমরের উপরে বেত্রাঘাত করতেন।'[৬৭]

এ ছাড়া একই সময়ে তিন তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে যেসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের আলোকে হানাফি মাসলাকের অভিমত শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয় যে, একই মজলিসে তিন তালাক একত্রে দেওয়া জায়েজ নেই।

উওয়াইমির আজলানি রা.-এর ঘটনার ব্যাখ্যায় আহকামুল কুরআনে ইমাম জাসসাস রহ. তার জবাব দিতে গিয়ে বলেন, ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর ওই বর্ণনা দিয়ে দলিল পেশ করা সঠিক নয়। কারণ, তাঁর মাজহাব হলো, স্বামীর লিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী লিয়ান করার আগেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং মহিলা তো আগেই বায়েন তালাক প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। এখন তো আর তালাক পতিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অতএব, যে তালাক প্রকৃত অর্থে কোনো তালাকই নয় এবং তার ওপর কোনো হুকুমই আসেনি; সেই তালাকের ব্যাপারে কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরস্কার করবেন?

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে হানাফিদের কাছে ওই বর্ণনার জবাব কী হবে? এই প্রশ্নের জবাব এই দেওয়া হয় যে, হতে পারে এই ঘটনা ওই সময়ের যখন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দেওয়া সুন্নত সাব্যস্ত হয়নি এবং এক তুহুর-এর মাঝে তিন তালাক দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। সে জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো তিরস্কার করেননি। অথবা এমনও হতে পারে যে, ওই সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হওয়ার কারণ তালাক

---

[৬৭] শরহু মায়ানিল আসার, হাদিস : ৪৪৮৮। বর্ণনাটি হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ফাতহুল বারি গ্রন্থে (খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা :৩১৫) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ওই হাদিসের সনদটি সহিহ।—সম্পাদক

ছাড়াও অন্য কিছু (তথা লিয়ানও) ছিলো। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তালাক একসঙ্গে দেওয়াকে তিরস্কার করেননি।

২. তিন তালাক কি এক তালাক বলে গণ্য হবে?

দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি একই মজলিসে অথবা একই শব্দের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে, তাহলে কি স্ত্রীর ওপর তিন তালাকই পতিত হবে? এই মাসআলায় তিনটি মাজহাব রয়েছে—

প্রথম মাজহাব

চার ইমামসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, তিন তালাক পতিত হবে এবং-এর মাধ্যমে স্ত্রী মুগাল্লাজা হয়ে যাবে। শরয়ি হলালাহ অবলম্বন করা ছাড়া প্রথম স্বামীর জন্য এই স্ত্রী আর হালাল হবে না। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., আবু হুরায়রা রা., আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা., আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা., আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা., আনাস রা., তাবেইন এবং পরবর্তীকালের অধিকাংশ আলেম এমন অভিমতই পেশ করেছেন।[৬৮]

এছাড়াও ওমর রা., উসমান রা., আলি রা., হাসান বিন আলি রা., ওবাদা বিন সামেত রা. থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মাজহাব

এভাবে তালাক দেওয়ার মাধ্যমে কোনো তালাকই পতিত হবে না। এই মাজহাবটি হলো, শিয়ায়ে জাফরিয়াদের মাজহাব। আর ইমাম নববি রহ. হাজ্জাজ বিন আরতাত, ইবনু মুকাতিল রহ. ও মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রহ. থেকেও এমন অভিমতই বর্ণনা করেছেন।

---

[৬৮] আল মুগনি লি ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১০৪।

তৃতীয় মাজহাব

এই মাজহাবটি মূলত কিছু সংখ্যক আহলে জাহের এবং আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. ও আল্লামা ইবনু কাইয়্যিম রহ.-এর। তাদের মতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তালাক দিলে মাত্র এক তালাকে রাজয়ি পতিত হবে। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ., আতা রহ., তাউস রহ., সাইদ বিন যুবাইর রহ., আবু শায়াসা রহ. ও আমর ইবনু দিনার রহ. থেকেও এমন অভিমত বর্ণনা করেছেন। তবে আতা রহ. ও তাউস রহ.-এর দিকে এই মাজহাবটি সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। কারণ, তাউস রহ.-এর মতটি হুসাইন বিন আলি আল কারাবিসি আদাবুল কাজা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—

أخبرنا على بن عبد الله (وهو ابن المدينى) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن طاؤس أنه قال : من حدثك عن طاؤس أنه كان يروى طلاق الثلاث واحدة كذبه.

'তাউস রহ. নিজের ছেলেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে এ কথা বর্ণনা করবে যে, তাউস তিন তালাককে এক তালাক বলে মনে করে, তাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে।'

আতা সম্পর্কে আল্লামা ইবনু জুরাইজ বলেন—

قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس رضى الله عنه يقول طلاق البكر الثلاث واحدة قال : لا بلغنى ذلك عنه.

'আমি আতা রহ.-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, কুমারীকে তিন তালাক দিলে এক তালাক বলে গণ্য হয়? তিনি বলেন, না আমি এমনটি শুনিনি। তবে তাঁর ব্যাপারে এমন কথা আমার পর্যন্ত পৌঁছেছে।'[৬৯]

আহলে জাহের আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর এই বর্ণনা দিয়ে দলিল পেশ করেন—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : « كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ

[৬৯] আল ইশফাক আলা আহকামিত তালাক-আল্লামা কাউছারি : ৩৩।

وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রা. ও ওমর রা.-এর খেলাফতের প্রথম দুই বছর তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো। তারপর ওমর রা. বলেন, মানুষ এ বিষয়ে খুব বেশি তাড়াহুড়ো শুরু করেছে। অথচ এ বিষয়ে সুযোগ রয়েছে। যদি আমরা এ কাজটি বাস্তবায়ন করি, তাহলে সেটি উত্তম হয়। এরপর ওমর রা. সেটিকে বাস্তবায়ন করেন (বলেন, তিন তালাকের মধ্যে তিন তালাকই বিবেচিত হবে।) এই হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করা হতো।[৭০]

আহলে জাহের এছাড়া মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থের একটি হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেন, যেখানে রুকানা ইবনু আবদে ইয়াজিদ রা.-এর ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : « طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ : فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟» قَالَ : طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ : «فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟» قَالَ : نَعَمْ قَالَ : «فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ» قَالَ : فَرَجَعَهَا

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর আযাদকৃত দাস ইকরামা বলেন, মুত্তালিব-এর ভাই রুকানা ইবনু আবদে ইয়াজিদ রা. নিজ স্ত্রীকে একই মজলিসে তিন তালাক দিলেন। এরপর তিনি কৃত কাজের জন্য খুবই লজ্জিত হলেন এবং পেরেশান হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে তালাক দিয়েছো? তিনি বললেন, আমি তিন তালাক দিয়েছি। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একই মজলিসে তিন তালাক দিয়েছো? তিনি বললেন, হাঁ। নবি করিম সা. বললেন, তাহলে এক তালাকই গণ্য হবে। সুতরাং তুমি যদি তাকে ফিরিয়ে নিতে চাও,

[৭০] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪৭২, ৩৬৭৩।

তাহলে নিতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রুকানা রা. নিজ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন।'[৭১]

আহলে জাহেরদের কাছে এই দুই দলিল ছাড়া আর কোনো দলিল নেই।

তিন তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ইমামের দলিলসমূহ

১. অধিকাংশ আলেমগণের মতের পক্ষে অনেক দলিল রয়েছে। সেসব দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, একই মজলিসে তিন তালাক দেওয়ার দ্বারা তিন তালাকই পতিত হয়। এ থেকে কয়েকটি হাদিস নিচে তুলে ধরা হলো—

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ : «لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ»

'আয়শা রা. বলেন, এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। তারপর ওই মহিলা অন্য এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। এরপর দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই মহিলা কি এখন প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম স্বামীর ন্যায় দ্বিতীয় স্বামীও তার সঙ্গে সহবাস না করবে।'[৭২]

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এই ঘটনা রেফায়ার স্ত্রী ছাড়া অন্য একজন মহিলার ঘটনা। ইবনু হাজার রহ. এর উক্তি অনুযায়ী فطلقها এই শব্দ দিয়ে দলিল পেশ করা হয়েছে। কারণ, এই শব্দটি প্রমাণ করে যে, সে তিন তালাক একসঙ্গে দিয়েছে।[৭৩]

২. ইমাম বুখারি রহ. ওই অধ্যায়ে উওয়াইমির আজলানি রা.-এর লিয়ানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি লিয়ান করার পর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরজ করেন—

---

[৭১] মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৮৭, ফতোয়া ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২।

[৭২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২৬১।

[৭৩] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩২১

كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'হে আল্লাহর রাসুল! এখনো যদি আমি তাকে আমার ঘরে রাখি, তাহলে যেন আমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি। এই বলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের আগেই তিন তালাক দিয়ে দেন।'[৭৪]

আল্লামা কাউসারি রহ. বলেন, কোনো বর্ণনায়ই এ কথা উল্লেখ নেই যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে তিরস্কার করেছেন। এতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, তিন তালাকই পতিত হবে এবং মানুষ এর দ্বারা তিন তালাকই মনে করেছিলো। যদি মানুষের ভুল হতো, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংশোধন করে দিতেন এবং মানুষকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতেন। পুরো উম্মত এই বর্ণনা দিয়ে এটিই বুঝেছে। এমনকি আল্লামা ইবনু হাজম রহ.ও এ অর্থই বুঝেছেন। যেমন তিনি বলেন—

إنما طلقها وهو يقدرأنها امرأته ولو لا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر ذلك عليه.

'তিনি তাকে তালাক দিয়েছেন। কেননা সেই নারী তার স্ত্রী হবার কারণে তিনি তালাক দেওয়ার অধিকার রাখেন। যদি একসঙ্গে তিন তালাক পতিত না হতো, তাহলে আল্লাহর রাসুল সা. বিষয়টিকে ভুল বলে আখ্যা দিতেন।'[৭৫]

৩. ইমাম বায়হাকি রহ. সুনানে কুবরার মাঝে এই রেওয়াতটি উল্লেখ করেছেন—

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ : لِتَهْنِئْكَ الْخِلاَفَةُ، قَالَ : بِقَتْلِ عَلِيٍّ تُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي ثَلاَثًا قَالَ : فَتَلَفَّعَتْ بِثِيَابِهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى قَضَتْ عِدَّتَهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَعَشَرَةِ آلاَفٍ صَدَقَةً، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ قَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ، فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى ثُمَّ قَالَ

---

[৭৪] সহিহ বুখারি ৫৩০৯

[৭৫] আল ইশফাক আলা আহমামিত তালাক : ২৯

: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ : « أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَرَاجَعْتُهَا.

'সুয়াইদ ইবনু গাফালা রা. বলেন, আয়শা খাসয়ামিয়া হাসান ইবনু আলি রা.-এর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। যখন আলি রা. শাহাদাত বরণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনার খেলাফত বরকতময় হোক। তখন হাসান রা. বলেন, আচ্ছা তুমি আলি রা.-এর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করেছো?! যাও, এখনই তোমাকে তিন তালাক। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর থেকে ওই মহিলা পর্দা শুরু করলেন এবং ইদ্দত পালনে বসে গেলেন। যখন ইদ্দত পূর্ণ হলো তখন হাসান রা. তার বাকি থাকা পাওনা মহরসহ আরও দশ হাজার দিরহাম অতিরিক্ত পাঠিয়ে দিলেন। দূত যখন হাসান রা.-এর পক্ষ থেকে এগুলো নিয়ে এলেন, তখন তিনি বললেন, সম্পর্ক ছিন্নকারী প্রিয়জনের পক্ষ থেকে এতো সামান্য উপহার। মহিলার এই ভাষ্য যখন হাসান রা. শুনলেন তখন কেঁদে কেঁদে বললেন, যদি আমি আমার নানাজান থেকে অথবা এভাবে বললেন, যদি আমার পিতা আমার কাছে এ কথা না বলতেন যে, তিনি আমার নানাজান থেকে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে পবিত্রতার তিন পিরিয়ডে তিন তালাক দেবে অথবা অস্পষ্টভাবে তিন তালাক দেবে তার স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করবে, তাহলে আমি আমার স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নিতাম।'[৭৬]

হাফেজ ইবনু রজব হাম্বালি রহ. তার গ্রন্থ بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة এ এই হাদিস উল্লেখ করার পর বলেন, اسناده صحيح [৭৭] আল্লামা হায়সামি রহ. তাবারানি থেকে এই হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন—وفي رجاله ضعف وقد وثقوا 'ওই হাদিসের বর্ণনাকারীদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। তবে কেউ কেউ তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।'[৭৮]

---

[৭৬] সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি, হাদিস : ১৪৯৭১।

[৭৭] আল ইশফাক আলা আহকামিত তালাক : ২৪।

[৭৮] মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৯।

৪. সুনানে নাসায়ির একটি বর্ণনা ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে। তা শুনে রাসুল সা. অনেক রাগান্বিত হলেন। এই বর্ণনাটি আবু বকর ইবনু আরাবি রহ. হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর ওই হাদিসের বিপরীতে পেশ করেন, যার দ্বারা আহলে জাহের দলিল দিয়ে থাকেন। অতএব, তিনি বলেন—

ويعارضه حديث محمود بن لبيد فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه.

'মাহমুদ ইবনু লাবিদ রা.-এর বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর বর্ণনার বিপরীত। এ জন্য যে, তাতে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছিলো অথচ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দেওয়া তালাককে প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং তিনি সেটিকে বহাল রেখেছেন।'

আল্লামা কাউসারি রহ. বলেন, হতে পারে ইবনু আরাবির দৃষ্টিতে সুনানে নাসায়ির বর্ণনাকৃত হাদিস ছাড়া ভিন্ন কোনো হাদিস ছিলো। এজন্য যে, সুনানে নাসায়ির বর্ণনায় তালাক কার্যকরের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বিদ্যমান নেই। আর আবু বকর ইবনুল আরাবি 'হাফিজুল হাদিস' এবং রেওয়ায়েত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। (ফলে অন্য কোন রেওয়ায়েত তাঁর দৃষ্টিতে থাকতেই পারে।) এটিও হতে পারে যে, ইবনুল আরাবি রহ.-এর ধারণা হলো, যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই তালাককে প্রত্যাখ্যান করতেন, তাহলে নিশ্চয় এর উল্লেখ হাদিসে বিদ্যমান থাকতো। তাছাড়া এ ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাগ করাটাও তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে বড়ো দলিল। আর হাদিস দিয়ে যা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য তার জন্যও এটিই যথেষ্ট।

৫. তাবারানিতে আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা. এর নিজ স্ত্রীকে ঋতুস্রাব অবস্থায় তালাক দেওয়ার ঘটনা বর্ণিত আছে। আর শেষে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন—

يا رسولَ الله، أرأيتَ لو طلَّقتُها ثلاثًا، كان لي أن أراجِعَها؟ قال : إذَنْ بَانَتْ مِنْكَ، وكَانَتْ مَعْصِيَة.

‘হে আল্লাহর রাসুল আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম, তাহলে কি আমার জন্য রুজু করার সুযোগ ছিলো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তো সে তোমার থেকে বায়েন (পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন) হয়ে যেতো এবং এর মাধ্যমে গুনাহও হতো।’[৭৯]

আল্লামা হায়সামি রহ. ‘মাজমাউজ জাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে এই হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন—

راوه الطبرانى وفيه على بن سعيد الرازى ، قال الدار قطنى ليس بذالك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات.

‘আল্লামা তাবারানি রহ, এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের মাঝে একজন বর্ণনাকারী হলো আলি ইবনু সাইদ আর রাজি। যার ব্যাপারে দারা কুতনি বলেন, সে তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম তাকে সম্মান করেছেন। শুধুমাত্র তিনি ছাড়া ওই হাদিসের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বেশ মজবুত ও নির্ভরযোগ্য।’[৮০]

এ ব্যাপারে অধমের আরজ হলো, মিজানুল ইতিদাল গ্রন্থে হাফেজ জাহাবি রহ. আলি ইবনু সাইদ আর রাজির অবস্থা এই শব্দে বর্ণনা করেছেন—

حافظ رحال جوال . قال الدارقطني : ليس بذاك . تفرد بأشياء . قلت : سمع جبارة بن المغلس ، وعبد الأعلى بن حماد . روى عنه الطبراني ، والحسن بن رشيق ، والناس . قال ابن يونس : كان يفهم ويحفظ.

‘আলি ইবনু সাঈদ আর রাজি হাফেজে হাদিস এবং অনেক ভ্রমণকারী ছিলেন। ইমাম দারা কুতনি তাঁর ব্যাপারে বলেছেন ‘সে তেমন গ্রহণযোগ্য নয়’ এবং তিনি অনেক বর্ণনার ক্ষেত্রে একাকী বর্ণনাকারী হওয়ার দোষে দুষ্ট। আমি বলি, তিনি জুবারাহ ইবনু মুগাল্লিস ও আবদুল আলা ইবনু হাম্মাদ থেকে হাদিস নিয়েছেন। আর আল্লামা তাবারানি, হাসান ইবনু রশিক এবং আরও অনেক মুহাদ্দিস তার থেকে হাদিস বর্ণনা

[৭৯] মুজামে কাবির-তাবারানি, হাদিস : ১৩৯৯৭।

[৮০] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৬।

করেছেন। ইবনু ইউনুস তার ব্যাপারে বলেন, তিনি খুব ভালোভাবে হাদিস বুঝতেন এবং মুখস্থ করে নিতে পারতেন।'[৮১]

এ থেকে পরিষ্কার বুঝে আসলো, দারা কুতনি ছাড়া আর কেউ তাঁর ব্যাপারে আপত্তি করেননি। আর দারা কুতনিও অত্যন্ত নরম ভাষায় মন্তব্য করেছেন। আর হাফেজ জাহাবি রহ.ও তাতে একমত নয় সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইল বিন ইউনুস তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর হাফেজ জাহাবি রহ. তাকে হাফেজ বলেছেন। সুতরাং এমন মুহাদ্দিসের বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

ওই বর্ণনার সমর্থন ইতোপূর্বে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত ৩৫৪ নাম্বার হাদিস থেকেও পাওয়া যায়। যা নাফের সনদে বর্ণিত হয়েছে—

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.

'যখন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা.-এর কাছে যখন এমন ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হতো যে তার স্ত্রীকে হায়েজ অবস্থায় তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বলতেন, যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে থাকো, তাহলে তুমি তোমার প্রভুর ওই নির্দেশ অমান্য করলে, যে নির্দেশ মহান আল্লাহ তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে করেছেন। এই কারণে স্ত্রীও তোমার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।'[৮২]

এতে প্রতীয়মান হয়, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা. এ কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন।

৬. ইমাম নাসায়ি রহ. একসঙ্গে তিন তালাক দিলে সেই তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে ফাতেমা বিনতু কাইস রা.-এর ঘটনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন। ঘটনার ভাষ্যটি এমন—

إِنَّهُ قَدْ أُرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

---

[৮১] মিজানুল ইতিদাল, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪১, তরজমা নাম্বার ৫৮৫০।

[৮২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪৭১।

'ফাতেমা বিনতু কাইস রা.-এর স্বামী (হাফস ইবনু আমর ইবনু মুগিরা রা.) তাকে তিন তালাক দিয়ে দেন। ফাতেমা বিনতু কাইস রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ভরণপোষণ ওই মহিলা পাবে যাকে তার স্বামী ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে।'[৮৩]

ইমাম দারা কুতনি আবু সালামা রা. থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন—

طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا

'হাফস ইবনু আমর ইবনু মুগিরা নিজের স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছেন।'[৮৪]

এই রেওয়ায়েতও এই কথার ওপর প্রমাণ বহন করে যে, তিনি একসঙ্গে তিন তালাক দিয়েছিলেন। এ জন্যই ইমাম নাসায়ি রহ.-এর এই বর্ণনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা সঠিক হয়েছে।

তবে সহিহ মুসলিমে যে বর্ণনা এসেছে সেটি এই বর্ণনার বিপরীত। তার ভাষ্য হলো, طلقها آخر ثلاث تطليقات। আর কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে طلقها طلقة كانت بقية من طلاقها: । এই দুই রেওয়ায়েত থেকে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, তিনি একসঙ্গে তিন তালাক দেননি। অতএব, ফাতেমা বিনতু কাইস রা.-এর ঘটনা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা দু-কারণে ঠিক নয়। এক এই যে, বর্ণনাটির মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। আর দ্বিতীয় হলো, সহিহ মুসলিম শরিফের রেওয়ায়েত দারা কুতনির রেওয়ায়েতের চেয়ে বেশি অগ্রগণ্য।

৭. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক এবং তাবারানিতে ওবাদা ইবনু সামিতের এই বর্ণনাটি আছে। তিনি বলেন—

طَلَّقَ بَعْضُ آبَائِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفًا فَهَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ؟ , فَقَالَ : إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا , بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ , وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِهِ.

---

[৮৩] সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩৪০৩।

[৮৪] সুনানে দারা কুতনি, হাদিস : ৩৯১৭।

'আমার বাপ-দাদাদের মাঝে কেউ তার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিলো এরপর তাদের সন্তানেরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল সা. আমাদের পিতা আমাদের মাতাকে হাজার তালাক দিয়েছেন। এখন এ থেকে বের হওয়ার কোনো পন্থা আছে কি? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমার পিতার মাঝে আল্লাহর কোনো ভয় নেই। সুতরাং এখন আল্লাহ কেন তাকে পরিত্রাণের রাস্তা বের করে দেবেন? সুন্নতের বিপরীত তালাক দেওয়াতে তার স্ত্রী তিন তালাকের মাধ্যমে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর ৯৯৭ তালাকের গুনাহ তার ঘাড়ে।'[৮৫]

আল্লামা হায়সামি রহ. বলেন, এই বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী হলো, ওবাইদুল্লাহ ইবনু ওলিদ আল অছাফি আল ইজলি। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।[৮৬]

আমার কথা হলো, 'মিজানুল ইতিদাল' গ্রন্থে আল্লামা জাহাবি রহ. তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রহ.-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, يكتب حديثة للمعرفة অর্থাৎ, জানার জন্য তার হাদিস লেখা যেতে পারে। এজন্য আমি তার এই বর্ণনাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করিনি। বরং অন্য বর্ণনাকে মজবুত করার জন্য এনেছি।

৮. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থে সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর সূত্রে জায়েদ ইবনু ওয়াহহাব থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি বর্ণিত আছে—

إنه رفع إلى عمر رجل طلق امرأته الفا وقال : إنما كنت ألعب ، فعلاه عمر رضى الله عنه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاثة.

'এক ব্যক্তিকে ওমর রা.-এর খেদমতে উপস্থিত করা হলো যে তার স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়েছিলো! সে ব্যক্তি বললো, আমি এমনিতেই মজাক করি। ওমর রা. তাকে দোররা মারলেন এবং তাকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার জন্য এই হাজার তালাক থেকে তিন তালাকই যথেষ্ট।'[৮৭]

---

[৮৫] সুনানে দারা কুতনি, হাদিস : ৩৯৪৩।

[৮৬] মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৮।

[৮৭] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯৩, হাদিস : ১১৩৪০।

আল্লামা বায়হাকি রহ. শোবা থেকে আর তিনি সালামাহ ইবনু কুহাইলের সূত্রে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। আর উভয় সনদের বর্ণনাকারী সুনানে আরবায়ার বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৮৮]

৯. ইমাম বায়হাকি রহ. এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন—

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ.

'আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে সহবাসের আগে তিন তালাক দেয় তার ব্যাপারে ওমর রা. বলেন, এভাবে বললে তিন তালাক হয়ে যাবে। এখন আর এই মহিলা তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো স্বামীকে গ্রহণ না করবে। আর এমন ব্যক্তিকে যখন তাঁর কাছে আনা হতো তখন তিনি তাকে শাস্তি দিতেন।'[৮৯]

১০. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে এসেছে—

عن إبراهيم بن محمد عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ قَالَ: «تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلَاثًا، وَتَدَعُ سَائِرَهُ.

'শরিক ইবনু আবু নামিরা বলেন, এক ব্যক্তি আলি রা.-এর খেদমতে এসে আরজ করলো, আমি আমার স্ত্রীকে আরফাজ গাছের পরিমাণ তালাক দিয়েছি। আলি রা. বললেন, আরফাজ গাছ থেকে তিন নিয়ে নাও, আর অবশিষ্টকু ছেড়ে দাও।'[৯০]

ইবরাহিম রহ. বলেন, ওসমান ইবনু আফফান রা. থেকে এমন একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে 'তাকরিবুত তাহজিব' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, شريك بن أَبِي نَمِرٍ صدوق يخطئ, কিন্তু বায়হাকিতে একটি রেওয়ায়েত দুই সনদে বর্ণিত আছে। যা উল্লিখিত বর্ণনার স্বপক্ষে প্রমাণ। সেই বর্ণনার ভাষ্য হলো এই—

---

[৮৮] বায়হাকি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৩৪।

[৮৯] সুনানে কুবরা-বায়হাকি, হাদিস : ১৪৯৫৮।

[৯০] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ১১৩৪১।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

'আলি রা.-এর কাছে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে সহবাসের আগে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, ওই মহিলা তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মহিলা দ্বিতীয় কোনো স্বামীর সঙ্গে বিয়ে না বসবে।'[৯১]

১১. আতা ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত আছে—

جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. قَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا. وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

'এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে এসে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে জানতে চাইলো; যে ব্যক্তি সহবাসের আগে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। তখন আতা রহ. বলেন, আমি বল্লাম কুমারী হলে এক তালাক পতিত হবে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. আমাকে বললেন, তুমি তো গল্পকার। মূল বিষয় হলো, ওই কুমারী এক তালাক দ্বারা বায়েন হয়ে যাবে। আর তিন তালাক দ্বারা (পুরোপুরি) হারাম হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মহিলা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করবে।'[৯২]

১২. আলকামা থেকে বর্ণিত আছে—

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي: قَدْ بَانَتْ مِنِّي، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا» قَالَ: فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللهُ فَظَنَّ أَنَّهُ سَيُرَخِّصُ لَهُ، فَقَالَ: «ثَلَاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ، وَسَائِرُهَا عُدْوَانٌ.

'এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর কাছে এসে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে ৯৯ তালাক দিয়েছি। আমি মানুষকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস

[৯১] সুনানে বায়হাকি, হাদিস : ১৪৯৫৯।

[৯২] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস : ২১০৯।

করেছি, তারা বলেছে, সে আমার থেকে বায়েন (পুরোপুরি পৃথক) হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বললেন, মানুষ তোমার এবং তোমার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ হওয়াতে খুশি আছে। সে ব্যক্তি বললো, আপনার সিদ্ধান্ত কি? মহান আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুক। সে ধারণা করেছে, তিনি তার জন্য সুযোগ বের করে দেবেন। তিনি বললেন, সে তোমার থেকে তিন তালাকের দ্বারা বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আর বাকি তালাকগুলো জুলুম এবং বাড়াবাড়ি।'[৯৩]

১৩. আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা. বলেন—

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ.

'যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। তার ওপর তিন তালাকই পতিত হয়ে যায়। তবে-এর মাধ্যমে সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়।'[৯৪]

১৪. মুয়াবিয়া ইবনু আবি আয়াস আল আনসারি বলেন—

أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ : فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذلِكَ.

'মুয়াবিয়া ইবনু আবি আয়াস আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও আসেম ইবনু ওমর রা.-এর সঙ্গে বসেছিলেন। এমন সময় মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াস তার কাছে এসে বললো, এক গ্রাম্য ব্যক্তি তার বিবিকে সহবাসের আগে তিন তালাক দিয়েছে।মুহতারাম, এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কী? আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. বললেন, এ বিষয়ে আমার কাছে কোনো

[৯৩] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ১১৩৪৪।

[৯৪] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদিস : ১১৩৪৪।

কথা পৌঁছেনি। আপনি এই মাসআলা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ও আবু হুরায়রা রা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন। আমি এইমাত্র এ দুজনকে আয়শা রা.-এর কাছে দেখে এসেছি। আপনি জিজ্ঞেস করে জেনে পরে আমাকেও জানাবেন। তারপর মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াস তাদের কাছে গেলেন এবং এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. আবু হুরায়রা রা.-কে বললেন, আপনি ফতোয়া দিন। আপনার কাছে একটি জটিল মাসআলা এসেছে। আবু হুরায়রা রা. বললেন, এক তালাকের মাধ্যমে মহিলা বায়েন হয়ে যাবে। আর তিন তালাক দ্বারা পুরোপুরি হারাম হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ মহিলা দ্বিতীয় কোনো স্বামী গ্রহণ না করবে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.ও এমনই জবাব দেন।'[৯৫]

এ হাদিস পরিষ্কারভাবে এ কথা জানান দিচ্ছে যে, পাঁচজন সাহাবি তথা আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা., আসেম বিন ওমর রা., আবু হুরায়রা রা., আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং আয়শা রা. এরা সবাই এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে একমত। আবু হুরায়রা রা. ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর মাজহাব একেবারে স্পষ্ট। আর আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. ও আসেম বিন ওমর রা. এ মাসআলাটিকে খুব জটিল মনে করেছিলেন। যদি তাদের কাছে সহবাসকৃত মহিলার তালাকের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ধর্তব্য না হতো তাহলে তারা এই মাসআলাটিকে কঠিন মনে করতেন না। বরং তারা সহবাসহীন মহিলাকে একবাক্যে দেওয়া তিন তালাক পতিত না হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধা ছাড়াই ফতোয়া দিয়ে দিতেন। কিন্তু তারা এ মাসআলাটিকে কঠিন মনে করেছিলেন এজন্য যে, এটি ছিলো সহবাসহীন মহিলার সঙ্গে সম্পৃক্ত মাসআলা। হজরত আয়শা রা.-এর ব্যাপারে এই ঘটনার আগ-পিছ দেখে বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আবু হুরায়রা রা. ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ফতোয়া দেন তিনি নিজেই ওই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। (যদি এই মাসআলা তার রায়ের পরিপন্থি হতো তাহলে তিনি চুপ থাকতেন না।)

মোটকথা ফকিহ সাহাবিদের একটি দল যেমন : হজরত ওমর রা., উসমান রা., আলি রা., আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা., আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা.,

[৯৫] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুত তালাক, হাদিস : ২১১০।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা., ওবাদা ইবনু সামেত রা., আবু হুরায়রা রা., আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা., আসেম ইবনু ওমর রা. এবং আয়শা রা. তাঁরা সবাই তিন তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে একমত যদিও ওই তালাক একই মজলিসে দেওয়া হয়। এ সকল মনীষীদের একমত হওয়াই দলিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

বিপক্ষের দলিলসমূহের জবাব

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিপক্ষের আলেমগণ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। অধিকাংশ আলেম এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। হাফেজ ইবনু হাজার রহ. ফাতহুল বারি গ্রন্থে[৯৬] এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এসব জবাবের মধ্য থেকে আমাদের কাছে দুটি জবাব অধিক পছন্দনীয়।

প্রথম জবাব : হাদিসটি একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর সেটি হলো, তালাক দাতা প্রত্যেকবার নতুন নতুন নিয়তে তালাকের শব্দগুলো আদায় করা। যেমন : নিজের স্ত্রীকে বললো, তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক।

ইসলামের শুরু যুগের মুসলিমরা সহজ সরল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন; তাই তাদের এই দাবিকে মেনে নেওয়া যায় যে, তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা যে তিনবার বলেছে তা মূলত মজবুত ও দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে ছিলো। এরপর হজরত ওমর রা.-এর যুগে যখন মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেলো, ধোঁকা ও প্রতারণা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলো, মনুষ্যত্ববোধ উঠে গেলো, তখন মানুষের দাবিকে মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। তাই ওমর রা. একাধিকবার উচ্চারিত শব্দগুলোকে বাহ্যিক অর্থের ওপর রেখে নিজ রায় ঘোষণা করেন এবং সেভাবেই ফায়সালা কার্যকর করেন। ইমাম কুরতুবি রহ.ও এই জবাব পছন্দ করেছেন। ওমর রা. এর উক্তি—

إن الناس استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه إناة

'মানুষ এমন বিষয়ে দ্রুততা করছে যাতে তাদের জন্য সুযোগ ছিলো।'

উল্লিখিত কথার ওপর ভিত্তি করে ইমাম কুরতুবি রহ. এই জবাবকে শক্তিশালী বলে অভিমত দিয়েছেন। এমনিভাবে ইমাম নববি রহ. বলেন, এটি সবচেয়ে কঠিনতর জবাব।

---

[৯৬] নবম খণ্ড : ৩১৬ থেকে ৩১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় জবাব : আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর হাদিসের মধ্যে যে, 'ثلاثًا' শব্দটি এসেছে তা দিয়ে মূলত 'طلاق البتة' তথা অকাট্য তালাকই উদ্দেশ্য। যেমনটি হাদিসে রুকানার মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আলোচনা সামনে আসবে। আর এই হাদিস হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকেও বর্ণিত আছে এবং এই হাদিসটি যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী।

আর এর সমর্থন এটি দিয়েও হয় যে, ইমাম বুখারি রহ. এ অধ্যায়ে ওই সব আসারে সাহাবাও উল্লেখ করেছেন যাতে 'البتة'-এর উল্লেখ আছে। তাছাড়া এ অধ্যায়ে ওই সকল হাদিসও এনেছেন, যাতে 'তিন তালাকের' স্পষ্ট আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। এর মাধ্যমে ইমাম বুখারি রহ. এর এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, তার কাছে 'তালাকুল বাত্তাতা' (অকাট্য তালাক) ও 'তালাকে সালাসা' (তিন তালাক) এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যদি কোনো ব্যক্তি শুধু 'তালাকুল বাত্তাতা' বলে, তখন সেটিকে তিন তালাক হিসেবেই ধরা হবে। তবে যদি তালাকদাতা এর দ্বারা এক তালাকের নিয়ত করে, তাহলে তালাকদাতার দাবি সত্য মনে করা হবে।

সুতরাং এখন বলা যায় যে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় মূল শব্দ 'আল বাত্তাতা'-ই ছিলো। তবে যেহেতু 'আল বাত্তাতা' শব্দটি তিন তালাকের সমার্থক বলে প্রসিদ্ধ ছিলো; তাই হাদিসের কতক বর্ণনাকারী মূল শব্দ 'আল বাত্তাতা'-এর স্থানে তালাকে সালাসা বা তিন তালাকের কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়েছেন 'আল বাত্তাতা'।

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যখন কোনো ব্যক্তি 'আল বাত্তাতা' শব্দ বলে এক তালাক উদ্দেশ্য নিতো, তখন তার কথাকে মেনে নেওয়া হতো। কিন্তু ওমর রা. নিজ যুগে বাহ্যিক শব্দের ওপর ভিত্তি করে ওই শব্দ দিয়ে দেওয়া তালাকের ওপর তিন তালাকের হুকুম জারি করে দিয়েছেন।[৯৭]

অধমের কাছে এই ব্যাখ্যার সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, ওমর রা.-এর যুগে সকল সাহাবি ওমর রা.-এর সিদ্ধান্তের ওপর একমত পোষণ করেছিলেন। কোনো প্রকার বিরোধিতা তারা করেননি। সুতরাং ওমর রা.-এর সিদ্ধান্ত যদি নিজের পক্ষ থেকে কোনো নতুন সিদ্ধান্ত হতো, (নাউজুবিল্লাহ) অথবা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিদ্ধান্তের বিপরীত হতো, তাহলে একজন

---

[৯৭] ফাতহুল বারি।

সাহাবিও সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন না। অথচ সাহাবায়ে কেরামের পুরো জামাত এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. যিনি এই হাদিসের বর্ণনাকারী এবং হাদিসে রুকানারও বর্ণনাকারী—তারও ফতোয়া হলো : তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। (যেমনটি আগের আলোচনায় গিয়েছে) এমনিভাবে সুনানে আবু দাউদে মুজাহিদ রহ. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর এই হাদিসের সনদকে হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ফাতহুল বারিতে সহিহ বলেছেন।

হাদিসটি হলো, মুজাহিদ রহ. বর্ণনা করেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছি। তিনি তা শুনে চুপ থাকলেন। এমনকি আমি মনে করলাম যে, তিনি তাকে রুজু করার ফতোয়া দেবেন। কিন্তু তিনি বলেন—

ينطلق أحدكم فيركب الحموقة (بفتح الحاء وهي فعولة من الحمق) ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك.

'তোমাদের মাঝে একজন নির্বুদ্ধিতার ওপর আরোহণ করেছে। অথচ (নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে) এখন এসে বলছে, হে ইবনু আব্বাস, হে ইবনু আব্বাস, অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য কোনো রাস্তা অবশ্যই বের করে দেবেন। আর তুমি যেহেতু তালাকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় পাওনি, তাই আমি তোমার জন্য সমাধানের কোনো পথও পাচ্ছি না। তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানি করেছো এবং তোমার স্ত্রীও তোমার থেকে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।'

সুতরাং ইবনু আব্বাস রা.-এর ব্যাপারে এমন ধারণা মোটেও ঠিক হবে না যে, তার সামনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ফায়সালা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি তার বিপরীত ফতোয়া প্রদান করেছেন। যদি ইবনু আব্বাস রা. এমন করে থাকেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে তাঁর সামনে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ আছে। হাদিস বর্ণনাকারী নিজের রেওয়ায়েতের ব্যাপারে অন্যদের থেকে ভালো জানেন।

ইবনু তাইমিয়া রহ. 'হাদিসে রুকানা' দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। এই হাদিসটি

মুসনাদে আহমাদ ও মুসনাদে আবু ইয়ালায় উল্লেখ রয়েছে এবং আবু ইয়ালা হাদিসটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। তার ভাষ্য হলো—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ.

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রুকানা ইবনু আবদে ইয়াজিদ স্বীয় স্ত্রীকে একই মজলিসে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটি এক তালাক; তুমি চাইলে রুজু করতে পারো। এরপর তিনি রুজু করে নিলেন।'[৯৮]

এই হাদিসের জবাব হলো, রুকানার তালাক সংক্রান্ত যে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তাতে ইজতিরাব তথা গোলযোগ পাওয়া গিয়েছে। এর একটি বর্ণনা অপর বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন : মুসনাদে আহমাদ-এর রেওয়ায়েত যা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তাতে স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ আছে যে, রুকানা নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। আবার এই রেওয়ায়েত সুনানে আবু দাউদে রুকানা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আল বাত্তাতা' শব্দের মাধ্যমে তালাক দিয়েছিলেন। এই ইজতিরাব-এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারি রহ, হাদিসটিকে মালুল বা ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। আল্লামা ইবনু আবদুল বার রহ. তার তামহিদ কিতাবে হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।[৯৯]

আর মুসনাদে আহমাদে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে যে বর্ণনাটি রয়েছে, তাকে ইমাম জাস্‌সাস রহ. ও আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. এ কারণে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন, যেহেতু এই বর্ণনাটি 'সিকাহ' অর্থাৎ, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিপরীত যারা আল বাত্তাতা শব্দের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনু হাজার রহ.ও আত তালখিসুল হাবির গ্রন্থে এই রেওয়ায়াতটিকে মালুল বলেছেন।

আর ইমাম আবু দাউদ রহ. সুনানে আবু দাউদে এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, রুকানা রা. আল বাত্তাতা শব্দের মাধ্যমে তালাক দিয়েছিলেন। এ কারণে যে, তিনি এই বর্ণনাটিকে রুকানার আহলে বাইতের (পরিবারের) সনদে বর্ণনা

---

[৯৮] মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩৮৭, শুয়াইব আরনাউত বলেন, এর সনদ দুর্বল।

[৯৯] তালখিসুল হাবির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১৩, হাদিস : ১৬০৩।

করেছেন। আর কোনো ব্যক্তির নিজ পরিবারের লোকেরা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যের তুলনায় অধিক জ্ঞাত থাকে।

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ফাতহুল বারি গ্রন্থে[১০০] বলেন, কতক বর্ণনাকারী 'আল বাত্তাতা' শব্দকে তিন তালাক ধরে নিয়ে ثلاثا طلقها বলে দিয়েছেন। এই ভাষ্যের আলোকে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর হাদিস দিয়ে দলিল স্থগিত হয়ে যায়।

অধমের আলোচনার সারমর্ম হলো, রুকানা রা. নিজ স্ত্রীকে "أنت طالق البتة" শব্দের মাধ্যমে তালাক দিয়েছেন। আর তাতে শুধু এক তালাকের নিয়ত করেছেন। তারপর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই নিয়তকে সত্যায়ন করেছেন এবং তাকে পুনরায় বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। আর হাদিসের فارتجعها إن شئت দিয়েও এটিই উদ্দেশ্য। কিন্তু কতক বর্ণনাকারী 'আল বাত্তাতা' শব্দ দিয়ে তিন তালাক উদ্দেশ্য মনে করে ثلاثا طلقها এই শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, যদি এ কথা ধরেও নেওয়া হয় যে, বিষয়টি তার বিপরীত যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, রুকানা রা. তো তিন তালাক পৃথক পৃথক শব্দ দ্বারা দিয়েছেন। তবে কোনো কোনো বর্ণনাকারী তাকে 'আল বাত্তাতা' শব্দ দিয়ে রেওয়ায়েত করেছেন। এরপরও এখানে লক্ষণীয় হলো, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক তালাককে ওই সময় গ্রহণ করেছেন যখন রুকানা রা. এ কথার ওপর শপথ করেছেন যে, আমি শুধু এক তালাকের নিয়ত করেছি। যেমনিভাবে আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনু মাজাহ ও দারেমির বর্ণনাতেও রয়েছে—

فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'রুকানা রা. এই ঘটনা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ আমি শুধু এক তালাকের নিয়ত করেছি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[১০০] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩১৬।

তাকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহর শপথ তুমি কি এর দ্বারা এক তালাকেরই নিয়ত করেছিলে? রুকানা রা. জবাবে বলেন, আল্লাহর শপথ আমি এক তালাকেরই নিয়ত করেছি। তখন রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলেন।'[১০১]

আলোচ্য রেওয়ায়েতে দেখুন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে তার থেকে দুইবার শপথ নিলেন যে, এর দ্বারা তার এক তালাকেরই নিয়ত ছিলো। আর এ কথা আমরা পেছনে বলে এসেছি যে, নবি যুগে কোনো ব্যক্তি যদি তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করার পর; এ কথা বলতো যে, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো দৃঢ়তা, তাহলে তার এই নিয়তকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হতো। আর বিচারের ক্ষেত্রেও সে বিষয়টি বিবেচনায় আনা হতো। কারণ, ওই যুগ ছিলো পূত-পবিত্রতার যুগ। আর যদি ইবনু তাইমিয়ার ও তার অনুসারীদের মতো এই ধারণা রাখা হয় যে, তিন তালাক দ্বারা নিঃশর্তভাবে এক তালাক উদ্দেশ্য, তাহলে কখনো মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকানা রা. থেকে এক তালাকের নিয়তের ব্যাপারে শপথ নিতেন না। এ জন্য যে, তিন তালাকের শব্দ বলে আবার এক তালাকের নিয়ত করারও প্রয়োজন ছিলো না। (বরং নিয়ত ছাড়াও এক তালাকই পতিত হতো) তাছাড়া তাকে শপথ দেওয়ার দ্বারা নবিজির কোনো ফায়দাও ছিলো না। এ কারণে যে, আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহ. ও তার অনুসারীদের কাছে তাতে নিয়তের ও কোনো শর্ত নেই। বরং তিন তালাকের শব্দ বলে তিনের নিয়ত করলেও তাদের কাছে এক তালাকই পতিত হবে।

বড়োজোর রুকানা রা.-এর হাদিস দিয়ে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দৃঢ়তার নিয়তকে বিচারভিত্তিক সত্যায়িত করেছিলেন। একথা আমরাও মানি। তবে যদি কেউ প্রতিবার স্বতন্ত্র নিয়তের ভিত্তিতে তিন তালাক দেয়, তাহলেও তার মাধ্যমে এক তালাকই পতিত হবে এই হাদিসে তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং 'হাদিসে রুকানা' দিয়ে দলিল দেওয়া ঠিক হবে না।

এরপর ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, একসঙ্গে তিন তালাক আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ফকিহের যৌক্তিক দলিলও স্পষ্ট। আর তা হলো এই যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তালাকদাতার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না

---

[১০১] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২২০৬।

যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মহিলা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করবে। চাই সেই তালাক পৃথক পৃথকভাবে দেওয়া হোক কিংবা একসঙ্গে দেওয়া হোক। শাব্দিক ও পারিভাষিক বিবেচনায় তাতে কোনো পার্থক্য হবে না। তবে যে পার্থক্য ভাবা হয় তা শুধু বাহ্যিক পার্থক্য যাকে শরিয়তে বিয়ে, গোলাম আজাদি এবং স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে নিরর্থক সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং কোনো অভিভাবক যদি এক কথায় কাউকে বলে যে, আমি এই তিন মেয়েকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম তাহলে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। যেমনিভাবে ওই সুরতেও বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায় যখন অভিভাবক কোনো ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক শব্দে বলে যে, আমি এই মেয়েকে, ওই মেয়েকে এবং ওই মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম। আর আজাদ করা ও স্বীকারোক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

যারা একত্রে দেওয়া তিন তালাককে এক তালাক বলে গণ্য করেন তারা একটি দলিল এটিও দেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এভাবে কসম করে যে, আমি তিনবার আল্লাহর শপথ করলাম তাহলে সেটি একবার কসমই গণ্য হয়। তিনবার গণ্য হয় না। ঠিক সেভাবেই তালাকের ক্ষেত্রেও একই হুকুম হওয়া উচিত।

এই প্রশ্নের জবাব হলো, এই তালাককে শপথের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। কারণ, এ দুয়ের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্যটি হলো, তালাকদাতা নতুন নতুন তালাকের অস্তিত্ব দিয়ে থাকে। আর শরিয়ত তালাকের শেষসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তিন পর্যন্ত। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, তোমাকে তিন তালাক দিলাম, তাহলে সে যেন এ কথা বললো, আমি তোমাকে সব তালাক দিলাম। তবে শপথের ক্ষেত্রে কোনো শেষ সীমা নির্ধারিত নেই। এজন্যই তালাকও শপথের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।[১০২]

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন, তিন তালাকের মাসআলা মূলত মুৎয়ার মাসআলার মতো। যেমন : মুৎয়ার ব্যাপারে জাবির রা.-এর বক্তব্য হলো, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রা.-এর যুগে এবং ওমর ফারুক রা.-এর খেলাফতের শুরুতে মুৎয়ার প্রচলন ছিলো। পরে ওমর রা. আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন। তখন আমরা তা থেকে ফিরে এসেছি। উভয় মাসআলায় প্রাধান্যমূলক বক্তব্য হলো, মুৎয়া হারাম এবং তিন তালাক পতিত হয়। এজন্য ওমর রা.-এর যুগে এই দুই মাসআলার ওপর (ইজমা)

---

[১০২] ফাতহুল বারি।

ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কোনো একজনও এই ঐকমত্যের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। সাহাবায়ে কোরামের ইজমা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাদের কাছে কোনো রহিতকারী বর্ণনা বিদ্যমান ছিলো। যদিও কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের কাছে প্রথম দিকে এই রহিতকারী বর্ণনা গোপন ছিলো। কিন্তু ওমর রা.-এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের ইজমার মাধ্যমে রহিতকারী বর্ণনাটি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই এ ইজমা সংঘটিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করবে সে এই ইজমা ভঙকারী হিসেবে গণ্য হবে। কোনো মাসআলায় ঐকমত্য হওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি তাতে মতপার্থক্য করে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের কাছে তার মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য হয় না। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

চিংড়ি খাওয়ার শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'চিংড়ি খাওয়ার শরয়ি বিধান' এ প্রবন্ধটি মূলত শায়খুল ইসলাম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) লিখিত আরবি 'تكملة فتح الملهم' গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। গুরুত্ব ও প্রয়োজন বিবেচনা করে মাওলানা আবদুল মুনতাকিম সাহেব এর অনুবাদ করেছেন যা এখন পাঠকদের খেদমতে।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

চিংড়ি খাওয়ার শরয়ি বিধান

চিংড়িকে আরবি ভাষায় 'روبيان' কিংবা 'اربيان' বলা হয়। মিসরি ভাষায় একে 'جمبرى' নামে ডাকা হয়। আর ইংরেজি ভাষায় একে Shrimp অথবা Prawn বলা হয়। তিন ইমাম তথা ইমাম মালিক রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর কাছে চিংড়ি খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, তাঁদের কাছে সব সামুদ্রিক প্রাণী হালাল। কিন্তু হানাফি মাজহাব অনুযায়ী চিংড়ি জায়েজ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে; চিংড়ি মাছ হওয়া বা না হওয়ার ওপর।

অনেক অভিধান বিশারদ এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, 'চিংড়ি' এক প্রকার মাছ। যেমন : ইবনু দুরাইদ তার প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ 'জামহারাতুল লুগাত' এ উল্লেখ করেছেন, 'واربيان ضرب من السمك'। অর্থাৎ, চিংড়ি মাছেরই একটি প্রজাতি।[১০৩]

প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ 'কামুস' এবং 'তাজুল আরুস'-এ চিংড়িকে মাছ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে।[১০৪]

এমনিভাবে আল্লামা দামেরি কর্তৃক রচিত 'হায়াতুল হায়াওয়ান' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে—

---

[১০৩] জামহারাতুল লুগাত, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪১৪।

[১০৪] জামহারাতুল লুগাত, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪১৪।

الروبيان هو سمك صغير جدا أحمر.

'চিংড়ি এমন প্রজাতির মাছ, যার রং লাল হয়।'[১০৫]

অভিধান বিশারদদের এ জাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকে হানাফি মাজহাবের অনেক আলেম চিংড়ি খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন : ফতোয়ায়ে হাম্মাদিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থকার এমন অভিমতই পেশ করেছেন। আমাদের শায়খুল মাশায়িখ মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. কর্তৃক রচিত 'এমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কোনো দলিল প্রমাণের আলোকেই মাছের এমন কোনো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ নেই, যা না থাকলে মাছকে মাছ বলা যাবে না। সুতরাং এখন শুধু অভিজ্ঞদের মতামতকেই মূলভিত্তি হিসেবে ধরা হবে। এ মুহূর্তে আমার কাছে আল্লামা দামেরি কর্তৃক রচিত হায়াতুল হায়াওয়ান গ্রন্থটি রয়েছে। এতে প্রাণী জগতের তথ্য নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, اروبيان هو سمك صغير جدا অর্থাৎ, চিংড়ি খুব ছোট প্রজাতির একটি মাছ। মোটকথা অধম এ মুহূর্তে 'চিংড়ি' মাছ হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। হতে পারে এর পরে মহান আল্লাহ অন্য কিছুর স্মরণও করিয়ে দিতে পারেন।'[১০৬]

কিন্তু বর্তমান যুগের প্রাণী বিশেষজ্ঞরা চিংড়িকে মাছ হিসেবে গণ্য করে না; বরং চিংড়ি জলজপ্রাণীর স্বতন্ত্র একটি প্রজাতি বলে তারা আখ্যায়িত করেন। তারা বলেন, চিংড়ি কাকড়াজাতের এক প্রকার প্রাণী। এটি মাছজাতীয় নয়। মৎস বিশেষজ্ঞরা মাছের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

هو حيوان ذو عمود فقرى يعيش فى الماء ويسبح بعواماته ويتنفس بغلصته

'এটি মেরুদন্ডের হাড় বিশিষ্ট একটি প্রাণী। পানিতে এর বসবাস। নিজ ডানা দিয়ে সাঁতার কাটে এবং কণ্ঠনালির মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে।'[১০৭]

---

[১০৫] হায়াতুল হায়াওয়ান, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৩।

[১০৬] এমদাদুল ফাতাওয়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১০৩।

[১০৭] এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকা, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩০৫, মুদ্রণ ১৯৫০।

এই পরিচয়ের ভিত্তিতে চিংড়ি মাছের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, চিংড়ির মধ্যে মেরুদন্ডের হাড় নেই এবং কণ্ঠনালির মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসও গ্রহণ করে না। তাছাড়া আধুনিক প্রাণী বিশেষজ্ঞরা মোটাদাগে প্রাণীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—

১. মেরুদন্ড বিশিষ্ট প্রাণী।

২. মেরুদন্ডহীন প্রাণী।

প্রথম প্রকার প্রাণীর মাঝে ওইসব প্রাণী অন্তর্ভুক্ত যে প্রাণীর মেরুদন্ডে হাড় রয়েছে এবং যার শিরা-উপশিরার জোড়াও বিদ্যমান রয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকার প্রাণীর মাঝে ওইসব প্রাণী অন্তর্ভুক্ত যে প্রাণীর মেরুদন্ডে হাড় নেই। এই পরিচয়ের বিবেচনায় 'মাছ' প্রাণী জগতের প্রথম প্রকারে গণ্য হয়। আর চিংড়ি গণ্য হয় দ্বিতীয় প্রকারে। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকার ভাষ্য অনুযায়ী শতকরা নববইভাগ প্রাণীই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া চর্ম বিশিষ্ট প্রাণী এবং ক্ষেত-খামারের পোকা-মাকড়ও এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে 'দায়েরাতুল মায়ারিফ'-এর গ্রন্থকার মুস্তানি মাছের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন—

> حيوان من خلق الماء وآخر رتبة الحيوانات الفقرية دمه أحمر يتنفس فى الماء بواسطة خياشيم وله كسائر الحيوانات الفقرية هيكل عظمى
>
> 'মাছ পানিতে বসবাসকারী একটি প্রাণীর নাম। মেরুদন্ডের হাড়বিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে এর অবস্থান সবার নিচে। তার রক্ত লাল। নাকের বাঁশির মাধ্যমে সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে। মেরুদন্ডবিশিষ্ট অন্যান্য প্রাণীর মতো এর গঠন প্রক্রিয়া অনেক বড়োসড়ো হয়ে থাকে।'[১০৮]

মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজদি মাছের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন—

> السمك من الحيوانات البحرية وهو يكون الرتبة الخامسة من الحيوانات الفقرية دمها بارد احمر، يتنفس من الهواء الذائب فى الماء بواسطة خياشيمها وهى محلاة بأعضاء تمكنها من المعيشة دائما فى الماء وتعرم فيه بواسطة عوامات ولبعضها عوامة واحدة.

---

[১০৮] দায়েরাতুল মায়ারিফ, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৬০

'মাছ একটি সামুদ্রিক প্রাণী, মেরুদন্ডবিশিষ্ট প্রাণীর মাঝে এর অবস্থান পঞ্চমে। তার রক্ত লাল বর্ণের শীতল। পানিতে স্থিত বায়ূপ্রবাহ থেকে নাসিকার মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে থাকে। এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে সাজানো, যার মাধ্যমে খুব সহজে পানিতে অবস্থান করতে পারে। মাছ নিজ ডানার সাহায্যে পানিতে বিচরণ করে। কোনো কোনো মাছের ডানা শুধু একটি।'

মাছের এই পরিচয় চিংড়ির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না। কারণ, চিংড়ির মেরুদন্ডে কোনো হাড় হয় না। সুতরাং আমরা যদি প্রাণী বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করি, তাহলে চিংড়িকে মাছ বলার সুযোগ নেই। আর এমতাবস্থায় হানাফি মাজহাবের আসল মত অনুযায়ী চিংড়ি খাওয়া জায়েজ হবে না।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, চিংড়ি মাছ হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাণী বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ করা হবে নাকি সাধারণ মানুষের ব্যাপক প্রচলন গ্রহণ করা হবে? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি দুই প্রচলন পরস্পরে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে আরবদের প্রচলনই গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, হাদিসের মধ্যে সামুদ্রিক মৃত প্রাণী থেকে মাছকে আলাদা করাটা আরবি ভাষার ভিত্তিতেই হয়েছে। (সুতরাং কোনো প্রাণী মাৎসজাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে আরবি ভাষার প্রচলন ধর্তব্য।)[১০৯] আর ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনু দুরাইদ, ফাইরোজ আবাদি, জাবিদি ও দামেরির মতো অভিধান বিশেষজ্ঞরা একমত যে, 'চিংড়ি' মাছেরই একটি প্রকার।

সুতরাং উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী হানাফি মাজহাবের যেসব আলেম প্রাণী বিদ্যার তথ্য অনুযায়ী চিংড়িকে মাছ বহির্ভূত আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরা এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর যেসব ফকিহ আহলে আরবের প্রচলন অনুযায়ী চিংড়িকে মাছ বলে আখ্যা দিয়েছেন, তারা এটি জায়েজ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন।

চিংড়ি জায়েজ হওয়ার ফতোয়াটি এজন্য বেশি গ্রহণযোগ্য যে, সাধারণত এ জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে শরিয়ত ব্যাপক প্রচলনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর প্রচলন যেহেতু তাকে মাছ বলে, তাই তা খাওয়া জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ কোনো আপত্তি নেই। এ ক্ষেত্রে শরিয়ত শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে না।

তাই ফতোয়া দেওয়ার সময় চিংড়ির মাসআলায় কঠোর হওয়া উচিত নয়। বিশেষ

---

[১০৯] —উর্দু অনুবাদক।

করে যখন এ বিষয়টি একটি ইজতিহাদি বিষয় যে, তিনও ইমামের নিকট চিংড়ি হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়াও কোনো বিষয় নিয়ে ফিকহশাস্ত্রবিদগণের মাঝে মতপার্থক্য হলে, তা হালকা হয়ে যায়। তবে হাঁ চিংড়ি খাওয়া থেকে বিরত থাকাতেই বেশি সতর্কতা ও তা উত্তম বলে মনে হয়। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

হাত-বহাত ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

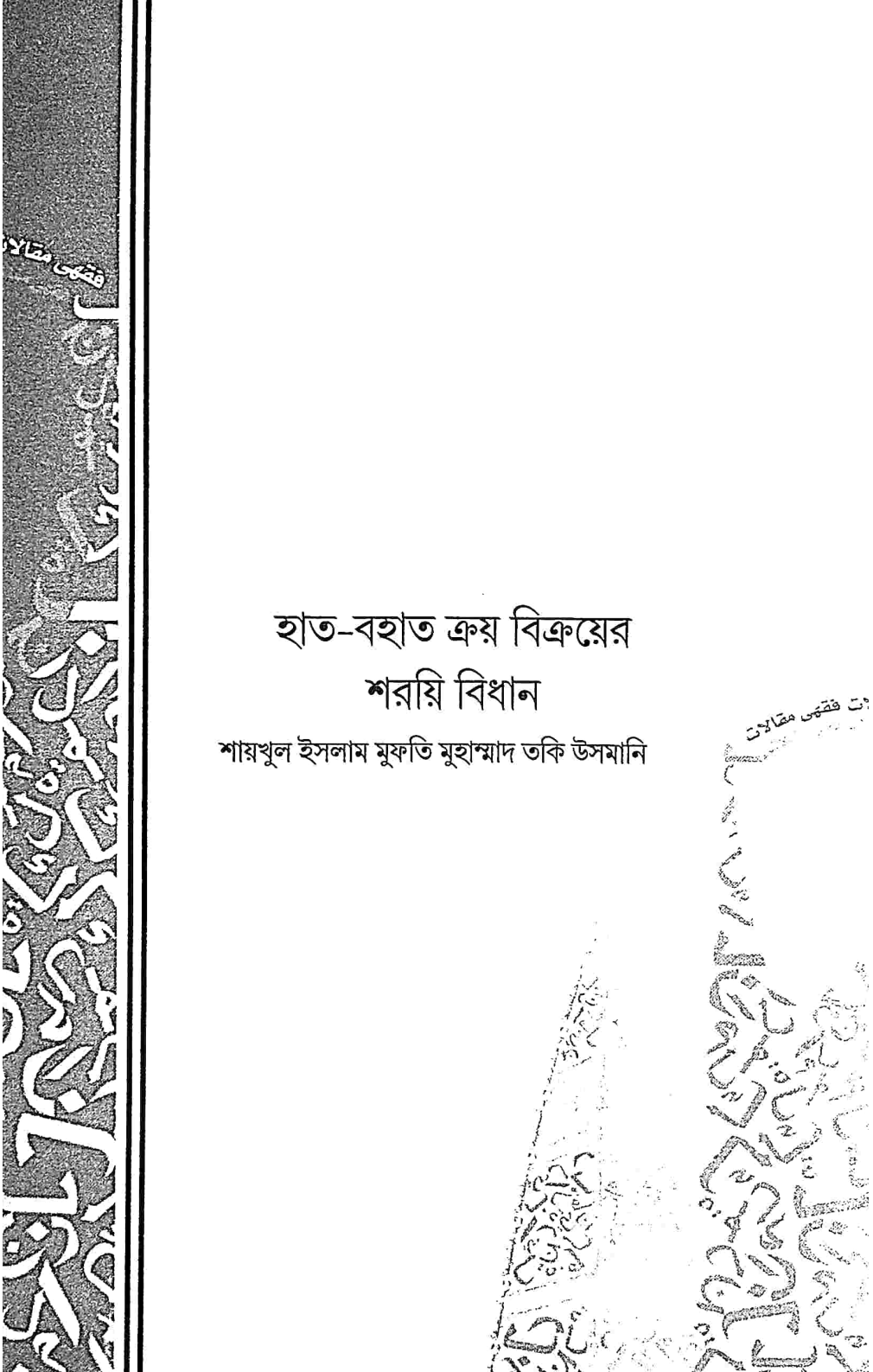

'হাত-বহাত ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ি বিধান' আলোচ্য প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) কুয়েতি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনুধাবন করে অধম এর উর্দু অনুবাদ করে করলাম।

—— আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

হাত-বহাত ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ি বিধান

আজকের এই সেমিনারে আমাকে আলোচনার জন্য যে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে, তা হলো বিনাবাক্যে হাতে হাতে ক্রয় বিক্রয় এবং দরদাম করা ছাড়া দোকানদারের কাছ থেকে অল্প অল্প করে পণ্য কেনা এবং ইসলামি ব্যাংকে বিভিন্ন লেনদেন ও আধুনিক ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ দুটি পদ্ধতি প্রয়োগের বৈধতার সীমারেখা সম্পর্কে। সুতরাং প্রথমে ওই দুই পদ্ধতির কেনাবেচার অর্থ ও সংজ্ঞা এবং এ ব্যাপারে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ কী বলেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করবো। এরপর আমরা এ দুই বেচাকেনাকে আধুনিক লেনদেনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা যায় কি না তা নিয়ে আলোকপাত করবো।

প্রথমত : বিনাবাক্যে হাত-বহাত ক্রয় বিক্রয়ের বিধান

ফিকহশাস্ত্রবিদগণের কাছে 'بيع بالتعاطى' তথা হাতে হাতে বেচাকেনা হলো, ক্রেতা-বিক্রেতা বেচাকেনার সময় মৌখিকভাবে কোনো প্রস্তাব দেবে না বা গ্রহণ করবে না। বরং 'প্রস্তাব করলাম' বা 'গ্রহণ করলাম' বলা ছাড়া বিনাবাক্যে ক্রেতা-বিক্রেতা পণ্য ও মূল্য আদান প্রদানের মাধ্যমে বেচাকেনা করবে। এভাবে নয় যে, বিক্রেতা বলবে আমি এই পণ্য বিক্রয় করলাম আর ক্রেতা বলবে আমি ক্রয় করলাম।

'بيع بالتعاطى' তথা হাত-বহাত ক্রয়-বিক্রয় দু-প্রকার : এক, এই যে, ক্রেতা বা বিক্রেতার যে-কোনো একজন মৌখিকভাবে প্রস্তাব পেশ করবে আর অপরজন কোনো কিছু বলার স্থানে শুধু কাজের মাধ্যমে ওই প্রস্তাব গ্রহণ করবে। যেমন : ক্রেতা বলবে আমাকে এক টাকা মূল্যের একটি রুটি দাও। বিক্রেতা যদি এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ক্রেতাকে মুখে কিছু না বলে চুপ থেকে রুটি দিয়ে দেয় এবং তার মূল্য উসুল করে নেয়, তাহলে এমতাবস্থায় প্রস্তাব হয়েছে মৌখিকভাবে। আর গ্রহণ করা হয়েছে কাজের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে মৌখিকভাবে কিছু বলবে না। যেমন : এক ব্যক্তি এমন দোকানে প্রবেশ করলো যে দোকানের প্রতিটি পণ্যের গায়ে মূল্য লেখা আছে। সে তার প্রয়োজনীয় পণ্যটি নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে গেলো। এ জাতীয় কেনাবেচার মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে কোনো প্রকার মৌখিক কথাই হলো না।

ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় এ উভয় প্রকারকে بيع بالتعاطى বা 'হাত-বহাত ক্রয়-বিক্রয়' বলে অভিহিত করা হয়। অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরামের কাছে সকল পণ্যই হাতে হাতে বেচাকেনা করা জায়েজ। তবে ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 'হাতে হাতে বেচাকেনা' করা জায়েজ নেই। কারণ, তাঁর মতে ক্রয়-বিক্রয় নির্ভর করে 'প্রস্তাব' ও 'গ্রহণ'-এর ওপর। আর 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র মাঝে 'প্রস্তাব' ও 'গ্রহণ' উভয়টি বা যে-কোনো একটি পাওয়া যায় না। তবে শাফিয়ি মাজহাবের গ্রন্থাবলি তালাশ করলে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র হুকুম সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ভিন্ন উক্তি রয়েছে।

১. সকল পণ্য 'হাতে হাতে বেচাকেনা' করা নাজায়েজ। এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। এটিই তাদের প্রসিদ্ধ অভিমত।

২. সাধারণ পণ্য 'হাতে হাতে বেচাকেনা' করা জায়েজ তবে মূল্যবান কোনো পণ্য 'হাতে হাতে বেচাকেনা' করা জায়েজ নেই। এটি হলো, আল্লামা ইবনু সুরাইজ এবং আল্লামা রুইয়ানি রহ.-এর অভিমত।[১১০] হানাফীদের মধ্যে ইমাম কারখি রহ.-এর অভিমতও এটি।[১১১]

---

[১১০] মুগনিল মোহতাজ, শিরবিনি রচিত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪।

[১১১] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৫৯।

৩. যে সকল পণ্য 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র প্রচলন রয়েছে, সে সব পণ্য 'হাতে হাতে বেচাকেনা' জায়েজ। তাছাড়া অন্য পণ্য এ জাতীয় কেনাবেচা জায়েজ নেই।

৪. যারা 'হাতে হাতে বেচাকেনা' সম্পর্কে অবগত আছেন, যেমন : সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীগণ। এদের জন্য 'হাতে হাতে বেচাকেনা' করা জায়েজ। আর যারা এ পদ্ধতিতে বেচাকেনার সঙ্গে পরিচিত নয়, তাদের জন্য মুখে উচ্চারণ করা ছাড়া এ জাতীয় বেচাকেনা জায়েজ নেই।[১১২]

অবশ্য অধিকাংশ ফকিহের অভিমত হলো, সকল পণ্যে 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো, এই লেনদেনটি পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে। প্রমাণ হিসেবে এখানে শুধু আল্লামা ইবনু কুদামা রহ.-এর ভাষ্য তুলে ধরা হলো, যা যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন : 'আমাদের প্রমাণ হলো, মহান আল্লাহ ব্যাবসাকে হালাল করেছেন। কিন্তু তার পদ্ধতি তিনি বর্ণনা করেননি। যেমনিভাবে অন্যান্য লেনদেন তথা কব্জা করা, সংরক্ষণ করা ও বিচ্ছেদ হওয়া জাতীয় বিষয়ে সামাজিক প্রচলনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়। এমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও তার অবস্থা ও পদ্ধতি জানার জন্য সামাজিক প্রচলনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। আর সামাজিক প্রচলনের মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে, মুসলিমদের বাজারে এই পদ্ধতিতে বেচাকেনা হয়ে থাকে। বেচাকেনার এই পদ্ধতি তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ। কেনাবেচার এই পদ্ধতির ওপর শরিয়তের কিছু বিধিনিষেধ অবশ্যই আছে। যাকে শরিয়ত আপন স্থানে বহালও রেখেছে। সুতরাং নিজের খেয়াল খুশিমতো এই জাতীয় কেনাবেচার মাঝে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা জায়েজ নেই।'

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবিদের যুগে এ জাতীয় বেচাকেনার ব্যাপক প্রসার থাকা সত্ত্বেও তাতে মৌখিকভাবে প্রস্তাব ও গ্রহণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদি এ জাতীয় কেনাবেচায় ইজাব ও কবুল ব্যবহার হতো, তাহলে অবশ্যই তা প্রসিদ্ধি লাভ করতো। যদি ইজাব কবুল কেনাবেচায় শর্তের মর্যাদা রাখতো, তাহলে এই হুকুম অন্যদের কাছে পৌছানোও ওয়াজিব হতো। আর সাহাবিদের শানে এমন ধারণা করাও অসম্ভব যে, যে বিষয় মানুষের কাছে পৌঁছানো জরুরি তা তাঁরা বর্ণনা করতে অলসতা বা দুর্বলতা প্রদর্শন করেছেন।

---

[১১২] মুগনিল মোহতাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪।

অপরদিকে কেনাবেচা এমন একটি লেনদেন যাতে রয়েছে সার্বিক প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং তাতে যদি মৌখিকভাবে ইজাব ও কবুলের শর্ত থাকতো, তাহলে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন, যার হুকুম অস্পষ্ট বা গোপন থাকতো না। তাছাড়া কেনাবেচার মাঝে যদি মৌখিকভাবে ইজাব কবুলের শর্ত হতো, তাহলে তা না পাওয়া অবস্থায় অনেক লেনদেন নষ্ট হয়ে যেতো। ফলে বাতিলপন্থায় সম্পদ আহরণের সুযোগ হতো। আমাদের জানা মতে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

আর সকলযুগে যেহেতু মানুষ 'হাতে হাতে বেচাকেনা' করে আসছে। এবং ইতোপূর্বে আমাদের বিপক্ষের লোকজন ছাড়া আর কেউই এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের বিরোধিতা করেনি। তাই তা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনিভাবে দান, হাদিয়া ও সদকার ক্ষেত্রেও ইজাব কবুলের একই বিধান যে, মৌখিকভাবে তা উচ্চারণ করা জরুরি নয়। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ জাতীয় লেনদেনের মাঝে মৌখিকভাবে ইজাব কবুল ব্যবহৃত হওয়ার কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাবশা ও অন্যান্য স্থান থেকে হাদিয়া আসতো। আর মানুষ আয়শা রা.-এর পালার দিন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাদিয়া পেশ করাকে অগ্রধিকার দিতো।[১১৩]

সহিহ বুখারিতে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে কেউ খাবার নিয়ে আসতো, তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করতেন এটি হাদিয়া না সদকা? যদি আনয়নকারী জবাবে বলতেন, এটি সদকা, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করতেন না। সাহাবিদেরকে বলতেন তোমরা তা গ্রহণ করো। আর যদি আগমনকারী জবাবে বলতেন, এটি হাদিয়া, তাহলে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তা গ্রহণ করতেন এবং উপস্থিত সবাইকে বলতেন, তোমরা তা থেকে খাও এবং নিজেও তাদের সঙ্গে খেতেন।

সালমান ফারসি রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি কিছু খেজুর নিয়ে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে বললেন, আমার ধারণা অনুযায়ী আপনি এবং আপনার সাহাবিগণ এই খেজুরের সবচেয়ে

[১১৩] বুখারি ৩৭৭৫, মুসলিম ২৪৪১।

বেশি হকদার। তাই আমি সদকার কিছু খেজুর আপনার দরবারে নিয়ে এসেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে সাহাবিদেরকে বললেন, তোমরা খেয়ে নাও। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খেজুর খেলেন না। এরপর দ্বিতীয়বার মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে খেজুর নিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আমি দেখেছি আপনি সদকার খেজুর খান না, তাই হাদিয়া-স্বরূপ এই খেজুরগুলো নিয়ে এসেছি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লাহ' বলে তা খেয়ে নেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ হাদিসগুলোর মাঝে না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মৌখিকভাবে কবুল বর্ণিত আছে। আর না ইজাবের হুকুম তিনি দিয়েছেন। বরং তিনি শুধু এটি জানার জন্য প্রশ্ন করেছেন যে, এটি সদকা না হাদিয়া? অধিকাংশ বর্ণনায়ই মৌখিকভাবে ইজাব কবুলের কথা বর্ণিত নেই। বরং শুধু হাতে হাতেই লেনদেনটি সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি রয়েছে। আর ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে সন্তুষ্টিক্রমে পরস্পরে পৃথক হওয়াও এ কথার প্রমাণ যে, লেনদেনটি সঠিক হয়েছে। কারণ, যদি এই লেনদেনে মৌখিকভাবে ইজাব কবুল বলা শর্ত হতো, তাহলে এমতাবস্থায় মানুষ বিপদে পড়ে যেতো এবং মুসলিমদের অনেক লেনদেন ফাসেদ হয়ে যেতো। ফলে তাদের অধিকাংশ সম্পদ হারাম হয়ে যেতো।

দ্বিতীয়ত : ইজাব ও কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরস্পরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। তাই যখন ইজাব কবুল ছাড়া অন্য জিনিস যেমন : 'হাতে হাতে বেচাকেনা' পাওয়া যেতো যা পরস্পরের সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে তখন দরদাম অথবা 'হাতে হাতে বেচাকেনা' ইজাব কবুলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যেতো। কারণ, সন্তুষ্টি প্রকাশের মাধ্যম শুধু ইজাব কবুল নয়।[১১৪]

দ্বিতীয়ত : ইসলামি ব্যাংকের মুরাবাহা লেনদেনে 'হাতে হাতে বেচাকেনা' জায়েজ হওয়ার সীমারেখা

এ যাবৎ যা আলোচনা করা হয়েছে তা ছিলো 'হাতে হাতে বেচাকেনা'-এর হুকুম সম্পর্কে। অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের মতানুযায়ী 'হাতে হাতে বেচাকেনা' জায়েজ। যার প্রমাণ পেছনে আল্লামা কুদামা রহ.-এর ভাষ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে

[১১৪] আল মুগনি লি ইবনু কুদামা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৬১।

দেওয়া হয়েছে। তবে এ কথা খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু সেসব লেনদেনে 'হাতে হাতে বেচাকেনা' করা যাবে, যেসব লেনদেনে শরয়ি কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে যদি 'হাতে হাতে বেচাকেনা' করতে গিয়ে শরিয়ত পরিপন্থি কোনো সমস্যা দেখা যায় অথবা এ কারণে জায়েজ কোনো লেনদেনে নাজায়েজ লেনদেনের অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে 'হাতে হাতে বেচাকেনা' পরিহার করা আবশ্যক। এর মাধ্যমে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আজকাল ইসলামি ব্যাংকে যেসব মুরাবাহা চুক্তি 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র মাধ্যমে হয়ে থাকে তা কোনোভাবেই ঠিক হবে না।

এর বিশদ বিবরণ হলো, গ্রাহক যখন ব্যাংকে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি কিংবা মেশিনারিজ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করতে আসে, তখন ব্যাংক তাকে ওইসব পণ্য ক্রয়ের জন্য সুদভিত্তিক ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রথমে বাজার থেকে সেই পণ্য নিজের জন্য কিনে। পরবর্তীকালে ওই পণ্য বাকিতে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয় করে দেয়। তবে অধিকাংশ ব্যাংক ওই পণ্য নিজে কিনে না; বরং সে গ্রাহককে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে বলে দেয়, তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে বাজার থেকে অমুক পণ্য কিনে নিয়ে এসো। গ্রাহক যখন ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে ওই পণ্য হস্তগত করে নেয় তখন পুনরায় গ্রাহক মুরাবাহা পদ্ধতিতে ক্রয়ের ভিত্তিতে ওই পণ্য ব্যাংক থেকে কিনে নেয়।

তবে এ ক্ষেত্রে জরুরি হলো, গ্রাহক প্রতিনিধি হিসেবে নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করে ওই পণ্য কেনার পর এর দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের কাছে সোপর্দ করবে। তারপর আবার গ্রাহক নতুন করে ওই পণ্য ক্রয়ের প্রস্তাব দেবে। আর ব্যাংক সেই প্রস্তাব গ্রহণ করবে।

কোনো কোনো মানুষ উল্লিখিত লেনদেনকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এমন প্রস্তাব করেন যে, ব্যাংক এবং গ্রাহকের মাঝে বাকিতে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রির লেনদেন 'হাতে হাতে বেচাকেনা'-এর ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে। নতুন করে ইজাব কবুল করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং গ্রাহক যে সময় ব্যাংকের উকিল হয়ে ওই পণ্য হস্তগত করে তখন মনে করতে হবে যে, গ্রাহক ব্যাংক থেকে ওই পণ্য 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কিনেছে।

'হাতে হাতে বেচাকেনা' যদিও জায়েজ আছে। তবে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো আমার কাছে শরয়ি দৃষ্টিকোণে জায়েজ নেই।

এর কারণ হলো, مرابحة للأمر بالشراء অর্থাৎ, ক্রয়ের নির্দেশকারীর মুরাবাহা লেনদেনকে বর্তমান ইসলামি ব্যাংকগুলো সুদভিত্তিক ঋণের পরিবর্তিত রূপ হিসেবে ব্যবহার করে যাচ্ছে। তাই এ জাতীয় লেনদেন এবং সুদি লেনদেনের মাঝে মৌলিক এমন কিছু পার্থক্য থাকা উচিত, যে পার্থক্যগুলো দুটি লেনদেনকে পৃথক করে দেয়। এখন এই দুই লেনদেনের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো, সুদি লেনদেনের ভিত্তি মুদ্রাস্ফীতির ওপর। সুতরাং ব্যাংক ওই মুদ্রাস্ফীতির (মুদ্রার উর্ধ্বগামিতার) ওপর ভিত্তি করে সুদের দাবি করে থাকে। আর মুরাবাহা ভিত্তিক লেনদেনের মূল ভিত্তি হলো, ওই ব্যবসায়িকপণ্য যা ব্যাংকের মালিকানায় থাকে এবং যাকে ব্যাংক নিজের মালিকানা ও দায়িত্বে আসার পর গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে দেয়। সুতরাং উভয়ের মাঝে কার্যত পার্থক্য বাস্তবায়নের জন্যে মুরাবাহা ভিত্তিক লেনদেনে ওই পণ্যের ওপর সামান্য হলেও এমন সময় অতিবাহিত হওয়া জরুরি, যেসময়ে ওই পণ্য ব্যাংকের মালিকানা ও দায়িত্বে এসে যায়। আর যদি ওই সময়ে পণ্য নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেটি ব্যাংকের পক্ষ থেকে যাবে। তখন ব্যাংক না ওই পণ্যের ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। আর না তার ওপর কোনো মুনাফা দাবি করতে পারবে। আর ব্যাংক এই দায়দায়িত্ব গ্রহণের কারণেই মূলত ক্রেতার কাছ থেকে এই লাভ অর্জন করতে পারে। কার্যত যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করা না হয়, তাহলে ব্যাংকের অর্জিত লাভ 'ربح ما لم يضمن' 'দায় গ্রহণ ছাড়া লাভ' এর মধ্যে গণ্য হয়ে হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী হারাম হয়ে যাবে।

এ জন্য আমরা যদি মুরাবাহার মাঝেও 'হাতে হাতে বেচাকেনা'কে বৈধ বলে এ কথা বলি যে, যে সময় গ্রাহক ব্যাংকের উকিল হয়ে ওই পণ্য কিনে নিজের দখলে নেয়, তখন ব্যাংক এবং গ্রাহকের মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাহলে সুদি লেনদেন ও মুরাবাহার মাঝে যে পার্থক্য ছিলো তাও শেষ হয়ে যাবে। কার্যত বিষয়টি এমন হলো যে, ব্যাংক গ্রাহককে টাকা দিয়ে দিলো এবং এক মুহূর্তের জন্যও পণ্যটির মালিকানা ও দায়ভার না নিয়ে গ্রাহক থেকে বেশি টাকা দাবি করলো।

আলোচ্য মাসআলায় 'হাতে হাতে বেচাকেনা' নাজায়েজ হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র মাঝে যদিও শরিয়ত অনুযায়ী মৌখিকভাবে ইজাব কবুল জরুরি নয়। কিন্তু তারপরও ক্রেতা বিক্রেতার কোনো স্থানে হাজির হওয়া এবং একজনের প্রদান ও অপরজনের দখল জরুরি। অথচ এখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কেনাবেচা সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে। না এখানে দেওয়া পাওয়া যায়,

আর না দখল করা পাওয়া যায়। ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, কেনাবেচার ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি উভয় পক্ষের উকিল হতে পারবে না। অথচ এখানে একই ব্যক্তি অর্থাৎ, গ্রাহক উভয় পক্ষের উকিল হচ্ছে।

সারকথা হলো, ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র ভিত্তিতে মুরাবাহার চুক্তি বৈধ নয়।

বিনা দরদামে অল্প অল্প পণ্য ক্রয়ের বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

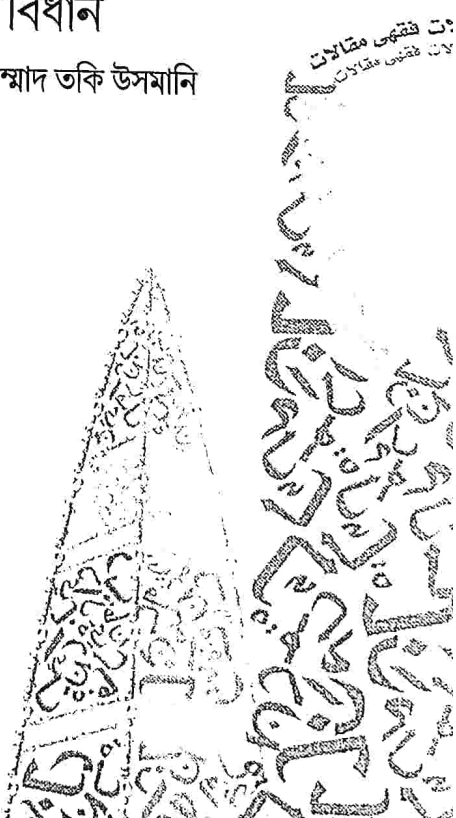

'বিনা দরদামে অল্প অল্প পণ্য ক্রয়ের বিধান' এ প্রবন্ধটিও 'হাতে হাতে বেচাকেনা' নামক প্রন্ধেরই একটি অংশ; যা শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) কুয়েতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে পেশ করেছিলেন। প্রবন্ধটি 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা গ্রন্থে' প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে অধম এর অনুবাদ পেশ করছি।

—— আবদুল্লাহ মায়মান

বিনা দরদামে অল্প অল্প করে পণ্য ক্রয়ের বিধান

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'بيع الإستجرار' মূলত استجرار المال থেকে চয়ন করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, অল্প অল্প করে পণ্য নেওয়া। মুতাআখ্খিরিন ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় 'بيع الإستجرار' হলো, কোনো ব্যক্তি দোকানদার থেকে নিজ প্রয়োজনে সময়ে সময়ে অল্প অল্প করে পণ্য নেওয়া। তবে প্রতিবারই পণ্য নেওয়ার সময় উভয়ের মাঝে মৌখিকভাবে কোনো প্রকার প্রস্তাব এবং গ্রহণ অথবা দরদাম সংঘটিত হয় না।

ইসতিজরার দুই পদ্ধতি—

১. পণ্যের মূল্য পরবর্তীকালে পরিশোধ করা।

২. প্রথমেই দোকানদারকে অগ্রীম টাকা দিয়ে দেওয়া।

'ইসতিজরার'-এর প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লামা হাসকাফি রহ. দুররুল মুখতারে উল্লেখ করেন—

ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد إستهلاكها.

'ইসতিজরার' হলো, মানুষ দোকানদার থেকে অল্প অল্প করে পণ্য নিতে থাকবে। সেই পণ্য ব্যবহার করার পর হিসাব করে শেষে মূল্য আদায় করে দেবে। এর মর্ম হলো, মানুষ দোকানদারের সঙ্গে এই মর্মে

একটি সমঝোতা করবে যে, তার বাড়িতে যখনই কোনো জিনিসের প্রয়োজন হবে, তখনই সে তার দোকান থেকে তা নিয়ে নেবে। এরপর দোকানদার তার চাহিদার পণ্যটি কোনো প্রকার মৌখিক প্রস্তাব ও গ্রহণ এবং কোনো প্রকার দরদাম বা মূল্য উল্লেখ করা ছাড়াই তাকে তা দিয়ে দেবে। তারপর দোকান থেকে একমাসে যে পরিমাণ পণ্য নিয়েছে; মাস শেষে হিসাব করে একসঙ্গে সব মূল্য আদায় করে দেবে।'

ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ নীতিমালা অনুযায়ী এ জাতীয় বেচাকেনা নাজায়েজ হওয়া উচিত। কারণ, আমরা যদি এ কথা বলি, এই বেচাকেনা ওই সময় সংঘটিত হবে যখন ক্রেতা ওই পণ্যকে দোকান থেকে উসুল করবে, এমতাবস্থায় তাতে একটি দোষণীয় বিষয় আবশ্যক হয় যে, মূল্য অজ্ঞাত থাকে; কারণ এখানে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে না দরদাম হচ্ছে, আর না মূল্যের কোনো কথা হচ্ছে। আর যদি বলা হয় যে, এই বেচাকেনা ওই সময় সংঘটিত হবে যখন মাস শেষে হিসাব করে মূল্য পরিশোধ করা হবে। এমতাবস্থায় দুটো দোষণীয় দিক আবশ্যক হয়। একটি হলো বেচাকেনা সম্পন্ন হওয়ার আগেই ক্রেতা পণ্য ব্যবহার করে শেষ করে ফেলেছে। দ্বিতীয়টি হলো— অস্তিত্বহীন পণ্যের বেচাকেনা আবশ্যক হচ্ছে। এ জাতীয় দোষণীয় দিক থাকায় কোনো কোনো ফকিহ 'ইসতিজরার'কে নাজায়েজ বলেছেন।

শাফিয়ি মাজহাবের সাধারণ ফকিহগণের অভিমতও এমন। এ সম্পর্কে আল্লামা নববি রহ. বলেন—

فَأَمَّا إِذَا أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَلَفَّظَا بِبَيْعٍ بَلْ نَوَيَا أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ الْمُعْتَادِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الناس فَهَذَا بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ لَفْظِيٍّ وَلَا مُعَاطَاةٍ وَلَا يُعَدُّ بَيْعًا فَهُوَ بَاطِلٌ وَلْتَعْلَمْ هَذَا وَلْتَحْتَرِزْ مِنْهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَأْخُذُ الْحَوَائِجَ مِنْ الْبَيَّاعِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ وَلَا مُعَاطَاةٍ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يُحَاسِبُهُ وَيُعْطِيهِ الْعِوَضَ وَهَذَا بَاطِلٌ بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ

'যদি কোনো ব্যক্তি দোকানদারের কাছ থেকে কোনো পণ্য নিয়ে তার মূল্য পরিশোধ না করে এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে মৌখিকভাবে বেচাকেনার কথা উল্লেখ না করে বরং উভয়ে এই নিয়ত করে যে, এই পণ্যের সাধারণ বাজার দর অনুযায়ী কেনাবেচা হচ্ছে। যেমনিভাবে

আজকাল অধিকাংশ মানুষ এভাবে লেনদেন করে থাকে। বেচাকেনার এই পদ্ধতি কোনো প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য। কারণ, একে না শাব্দিক বেচাকেনা বলা যায়, না হাতে হাতে বেচাকেনা বলা যায়। সুতরাং এটি যখন কোনো বেচাকেনারই অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে এটি আবার কীভাবে শুদ্ধ হয়? এই পদ্ধতিতে বেচাকেনার শরয়ি বিধান জানার পর তা থেকে বিরত থাকা উচিত। মানুষের মাঝে এর ব্যাপক ছড়াছড়ি থাকায় তুমি যেন ধোঁকায় পড়ে না যাও। কারণ, অনেক মানুষ শাব্দিক বেচাকেনা বা হাতে হাতে বেচাকেনার পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়াই নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী দোকান থেকে পণ্য নিতে থাকে। তারপর কিছুদিন যাওয়ার পর পরস্পরে হিসাব করে দোকানিকে মূল্য পরিশোধ করে দেয়। এই পদ্ধতি কোনো প্রকার মতভেদ ছাড়াই বাতিল বলে গণ্য।'[১১৫]

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, হাতে হাতে বেচাকেনা এবং বিনা দরদামে অল্প অল্প পণ্যের লেনদেনের বিষয়ে শাফিয়ি মাজহাবের অবস্থান খুব বেশি পরিমার্জিত নয়। তবে শাফিয়ি মাজহাবের কতক ফিকহশাস্ত্রবিদ বেচাকেনার এই উভয় প্রকারকে জায়েজ বলেছেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন ইমাম গাজালি রহ.। এ বিষয়ে আল্লামা রামালি রহ. বলেন—

أَمَّا الِاسْتِجْرَارُ مِنْ بَيَّاعٍ فَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا: أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَدِّرُ الثَّمَنَ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ سَامَحَ فِيهِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ

'দোকানদার থেকে অল্প অল্প করে (পণ্য) নেওয়া সর্বসম্মতভাবে বাতিল হিসেবে গণ্য। কারণ, তাতে প্রতিবার মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। উল্লেখ্য, ইমাম গাজালি রহ. 'হাতে হাতে বেচাকেনা' জায়েজ হওয়ার ভিত্তিতে তাতেও শিথিলতার পথ অনুসরণ করে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।'[১১৬]

খতিব আল্লামা শিরবিনি রহ. উল্লেখ করেন—

وَأَخْذُ الْحَاجَاتِ مِنَ الْبَيَّاعِ يَقَعُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي بِكَذَا لَحْمًا أَوْ خُبْزًا مَثَلًا وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ

[১১৫] আল মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৭৩।

[১১৬] নিহায়াতুল মোহতাজ, আল্লামা রামলি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬৪।

مَطْلُوبَهُ فَيَقْبِضُهُ وَيَرْضَى بِهِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يُحَاسِبُهُ وَيُؤَدِّي مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ، فَهَذَا مَجْزُومٌ بِصِحَّتِهِ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ الْمُعَاطَاةَ فِيمَا أَرَاهُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَلْتَمِسَ مَطْلُوبَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِثَمَنٍ كَأَعْطِنِي رِطْلَ خُبْزٍ أَوْ لَحْمٍ مَثَلًا فَهَذَا مُحْتَمَلٌ، وَهَذَا مَا رَأَى الْغَزَالِيُّ إِبَاحَتَهُ وَمَنَعَهَا الْمُصَنِّفُ (يعنى النووى رحمه الله).

'বিক্রেতা থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য নেওয়ার দুটি পদ্ধতি হতে পারে। একটি হলো, ক্রেতা বললো, আমাকে এত টাকার গোশত কিংবা রুটি দাও। সাধারণভাবে এমনটিই হয়ে থাকে। এর ওপর ভিত্তি করে বিক্রেতা চাহিদা অনুযায়ী পণ্য দিয়ে থাকে। আর ক্রেতা তাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তারপর কিছুদিন পর হিসাব করে ক্রেতা তার দায়িত্বে থাকা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করে দেয়। আমার ধারণামতে যে সকল ফুকাহায়ে কেরাম 'হাতে হাতে বেচাকেনা' জায়েজ বলেছেন, তাদের কাছে এ পদ্ধতি অবশ্যই জায়েজ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, ক্রেতা মূল্য উল্লেখ করা ছাড়াই পণ্যের অর্ডার দেয়। যেমন বলে, আমাকে এক কেজি গোশত বা রুটি দাও। বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদার ভিত্তিতে পণ্য দিয়ে দেয়। এই পদ্ধতি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। তবে ইমাম গাজালি রহ. একেও বৈধ বলে অভিমত দিয়েছেন। আর গ্রন্থকার অর্থাৎ, আল্লামা নববি রহ. তা অবৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১১৭]

মালিকি মাজহাবের গ্রন্থাবলিতে 'ইসতিজরারের' দ্বিতীয় প্রকারের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাতে টাকা প্রথমে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমনটি ইমাম মালিক রহ. তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে লিখেছেন—

وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرِ كُلَّ يَوْمٍ، فَهذَا لاَ يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ.

'যদি কোনো ব্যক্তি দোকানদারের কাছে এক দেরহাম রেখে দেয়। তারপর দোকানদার ওই দেরহামের এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ অথবা

[১১৭] মুগনিল মোহতাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪।

দেরহামের বিশেষ একটি অংশের বিনিময়ে কোনো পণ্য কিনে, তাহলে তা জায়েজ হবে। তবে যদি ওই পণ্যের মূল্য জানা না থাকে, আর ক্রেতা যদি বলে, আমি তোমার থেকে যে পণ্য কিনবো তা ওই দিনের বাজার দর অনুযায়ী কিনবো, তাহলে এ পদ্ধতিতে কেনাবেচা জায়েজ হবে না। কারণ, তাতে ধোঁকার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা বাজার দর ওঠানামা করতে থাকে। এখানে ক্রেতা বিক্রেতা কোনো প্রকার মূল্য চূড়ান্ত না করেই পৃথক হয়ে যাচ্ছে।'[১১৮]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মালিকি মাজহাবে 'ইসতিজরার' নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, মূল্য অজ্ঞাত হওয়া। মূল্য আগে পরে পরিশোধের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এতদূর পর্যন্ত মালিকিরা অধিকাংশ শাফিয়ি মাজহাবের অনুসারীদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

অবশ্য এই মাসআলায় হাম্বালি মাজহাবের আলেমদের মাঝে কিছুটা মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন : আল্লামা ইবনু মুফলিহ রহ. 'আন-নুকাতু ওয়াল ফাওয়ায়িদুস সানিয়্যাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

قال أبو داؤد فى مسائله باب فى الشراء ولا يسمى الثمن سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشئ بعد الشيئ، ثم يحاسب بعد ذلك قال : ارجو أن لا يكون بذلك بأس، قال ابو داؤد : وقيل لأحمد : يكون البيع ساعتئذ ؟ قال : لا. قال الشيخ تقى الدين وظاهر هذا أنهما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه، وأن البيع لم يكن وقت القبض، وإنما كان وقت التحاسب وإن معناه صحة البيع بالسعر.

'ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর 'মাসায়েল'-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, এই অধ্যায়টি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় এবং পণ্যের মূল্য উল্লেখ না করার বিষয়ে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুপাতে দোকানদার থেকে পণ্য নিতে থাকে, আর শেষে তার একটি হিসাব-নিকাশ করে নেওয়া হয়। ইমাম আহমাদ রহ. জবাবে বলেন, আমার ধারণা মতে তাতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, দ্বিতীয়বার ইমাম আহমাদ ইবনু

[১১৮] মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

হাম্বাল রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এই কেনাবেচা কি ওই সময়ই সংঘটিত হয়ে যাবে? তিনি জবাবে বলেন, না।

শায়খ তকি উদ্দিন রহ. বলেন, এ থেকে পরিষ্কার হলো, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে পণ্যের মূল্যের ওপর একমত পোষণ করেছিলো। ক্রেতা উক্ত পণ্য নিয়ে ব্যবহার করার পর আর এই বেচাকেনা পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময় সংঘটিত হয়নি। বরং হিসাব-নিকাশের পর কেনাবেচা সংঘটিত হয়েছে। আর এর অর্থ দাড়ায় বাজার দর অনুযায়ী বিক্রয় চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাওয়া।'[১১৯]

এই উদ্ধৃতি দ্বারা বুঝা গেল, হাম্বালি মাজহাবের কাছে 'ইসতিজরার' জায়েজ হওয়ার বর্ণনা বাজার দর অনুযায়ী বিক্রয় বৈধ হওয়ার মতামতের ওপর নির্ভরশীল। আর এ ব্যাপারে তাদের দুটি বর্ণনা রয়েছে।

আর মুতাআখখিরিন হানাফি ফকিহগণ ইসতিজরার জায়েজ হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন; যদিও দোকান থেকে পণ্য গ্রহণের সময় মূল্যের কোনো আলোচনা না করে থাকে। এ বিষয়ে দুররুল মুখতারে বলা হয়েছে -

مَا يَسْتَجِرُّهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْبَيَّاعِ إِذَا حَاسَبَهُ عَلَى أَثْمَانِهَا بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهَا جَازَ اسْتِحْسَانًا.

'মানুষ দোকান থেকে অল্প অল্প করে যে পণ্য ক্রয় করতে থাকে যদি ব্যবহারের পর তার মূল্যের হিসাব করে রাখে তাহলে লেনদেনটি ইসতেহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী জায়েজ হবে।'[১২০]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. বলেন -

وَمِمَّا تَسَامَحُوا فِيهِ وَأَخْرَجُوهُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا فِي الْقُنْيَةِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الْبَيَّاعِ عَلَى وَجْهِ الْخَرْجِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ كَالْعَدَسِ وَالْمِلْحِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَمَا انْعَدَمَتْ صَحَّ اهـ فَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ هُنَا.

'বেচাকেনার ওই পদ্ধতি যাকে হানাফি মাজহাবের ফুকাহায়ে কেরাম এই নীতি থেকে আলাদা করে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন তা 'কুনয়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। আর তা হলো, পারিবারিক প্রয়োজনের

[১১৯] মাউসুয়াতুল ফিকহিল ইসলামি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩০৫।

[১২০] দুররুল মুখতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫১৬।

ওই সকল পণ্য যা সাধারণত মানুষ দরদাম ছাড়াই প্রয়োজনের ভিত্তিতে দোকানদার থেকে নিয়ে থাকে। যেমন : ডাল, তেল, লবণ ইত্যাদি। তারপর ওই পণ্য ব্যবহার করার পর কেনাবেচা সম্পন্ন করে থাকে। এ জাতীয় লেনদেন শুদ্ধ আছে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন বস্তুর বেচাকেনা জায়েজ।'[১২১]

এ থেকে প্রতীয়মান হলো, হানাফিদের কাছে ইসতিজরার সূক্ষ্ম কিয়াস মতে জায়েজ। তবে পরবর্তীকালে ইসতেহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে ওলামায়ে আহনাফের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হানাফি মাজহাবের বিভিন্ন গ্রন্থে হানাফি ফিকহশাস্ত্রবিদগণের বিভিন্ন উদ্ধৃতি অধ্যয়নের পর যে সারকথা বের হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হলো -

ইসতিজরারের ওই পদ্ধতি যাতে মূল্য পরে আদায় করা হয়ে থাকে, তা তিনটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়।

১. হয়তো ক্রেতা যখনই দোকান থেকে কোনো পণ্য নেবে, দোকানদার তখনই তার মূল্য জানিয়ে দেবে অথবা ওই পণ্যের মূল্য যে-কোনোভাবেই হোক উভয়ের জানা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে যে সকল ফকিহ بيع تعاطى তথা 'হাতে হাতে বেচাকেনা'কে বৈধ বলেছেন তাদের কাছে ইসতিজরারের পদ্ধতিটি জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। সুতরাং এই পদ্ধতিতে 'হাতে হাতে বেচাকেনা'র ভিত্তিতে ওই সময় বেচাকেনা সংঘটিত হবে যখন ক্রেতা ওই পণ্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেবে। তবে সকল বেচাকেনার হিসাব-নিকাশ মাস শেষে একসঙ্গে হবে। এই পদ্ধতিতে মূল্য অজ্ঞাত থাকার দোষও পাওয়া যাচ্ছে না; আবার অস্তিত্বহীন বস্তু বেচাকেনা করার দোষও পাওয়া যাচ্ছে না। ইসতিজরারের এই পদ্ধতি হানাফি, মালিকি, হাম্বালি এবং শাফিয়ি মাজহাবের ফুকাহায়ে কেরাম থেকে ইমাম গাজালি রহ. ও ইবনু সুরাইজ রহ.-এর কাছে জায়েজ। তবে শাফিয়ি মাজহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী ইসতিজরার বা 'বিনা দরদামে কেনাবেচা' বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মৌখিকভাবে ইজাব কবুল পাওয়া যাওয়া। আর আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাতে হাতে বেচাকেনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদের মতামত প্রাধান্য পাবে।

---

[১২১] আলবাহরুর রায়েক, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৫৯।

২. অথবা এমন হবে যে, দোকানদার প্রতিবার মূল্য বলবে না; তবে বেচাকেনার শুরুতেই ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে এমন একটি সমঝোতা হবে যে, ক্রেতা যে দিন বিক্রেতা থেকে যে পণ্য নেবে, তা সে ওই দিনের বাজার দর অনুযায়ী নেবে। এমতাবস্থায় ইসতিজরারের এই পদ্ধতি পণ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দিনে বাজার দরের ওপর নির্ভরশীল হবে। চার ইমামের একটি প্রসিদ্ধ নীতি হলো, কোনো পণ্যের বাজার মূল্য বা সমমূল্য কিংবা গায়ের মূল্য অনুযায়ী বেচাকেনা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির মজলিসেই উভয় পক্ষ পণ্যের চূড়ান্ত মূল্য নির্দিষ্ট না করবে।[১২২]

তবে শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের এক বর্ণনা হলো, বাজার দর অনুযায়ী কেনাবেচা সহিহ হয়ে যাবে। শাফিয়ি মাজহাবের এই বর্ণনা ইমাম রাফেয়ি রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। যেমন : ইমাম নববি রহ. এই বর্ণনাকে এই শব্দে উদ্ধৃত করেছেন :

وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا ثَالِثًا أَنَّهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا لِلتَّمَكُّنِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ مَجْهُولَةً وَهَذَا ضَعِيفٌ شَاذٌّ.

'ইমাম রাফেয়ি রহ. তৃতীয় একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন, তা হলো বেচাকেনার এই পদ্ধতি পুরোপুরি জায়েজ। কারণ, মূল্য জানা সম্ভব। যেমন : কেউ বললো, আমি তোমার কাছে গমের এই স্তূপ প্রতি সা' এক দিরহামের হিসাবে বিক্রয় করবো, তাহলে বেচাকেনার এই পদ্ধতি জায়েজ আছে। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে পুরো স্তূপের সামগ্রিক মূল্য জানা যাচ্ছে না। তবে এই অভিমত দুর্বল এবং দুর্লভ।'[১২৩]

আর হাম্বালি মাজহাবের এই বর্ণনা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. এর একটি রেওয়ায়েত যা আল্লামা শায়খ তকি উদ্দিন রহ. গ্রহণ করেছেন।[১২৪] আর ইতোপূর্বে আমরা আল্লামা শায়খ তকি উদ্দিন রহ.-এর এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এসেছি। এমনিভাবে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ.ও এই বেচাকেনাকে বৈধ বলেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.

---

[১২২] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২৯।

[১২৩] আল মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৬৬।

[১২৪] আল ইনসাফ মারদাবি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১০।

থেকে এটি জায়েজ হওয়ার অভিমত বর্ণিত হয়েছে। আর তার শায়খ আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ.ও তা জায়েজ হওয়ার অভিমতকে গ্রহণ করেছেন।[১২৫]

মোটকথা! এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের উদ্ধৃতি এবং তাদের দলিলসমূহ দেখার পর যে বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, পণ্য সাধারণত দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার পণ্য হলো, যেগুলোর একক পরস্পরে তফাত হওয়ার কারণে তার মূল্যের মধ্যে পরিবর্তন আসে আর এর এমন কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই যার মাধ্যমে এসব পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। যেমন কোনো ব্যবসায়ী কোনো পণ্যকে দশ টাকায় বিক্রয় করে। আবার সেই একই পণ্য অন্য ব্যবসায়ী বিক্রয় করে দশ টাকার কমে বা বেশিতে। সুতরাং যে সকল ফকিহ বাজার দর অনুযায়ী বেচাকেনা হারাম বলে থাকেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো, এ ধরনের পণ্যসমূহ। কারণ, তার বাজার দর স্থিতিশীল নয় ফলে এসব পণ্যের দর অজ্ঞাত থাকে যা ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার পণ্য হলো, যেগুলোর এককে কোনো তফাৎ হয় না এবং তার বাজার মূল্যের মাঝেও পার্থক্য হয় না। এ জাতীয় পণ্যের মূল্য বিশেষ মানদন্ডের মাধ্যমে এমনভাবে নির্দিষ্ট হয়; যা প্রত্যেক ব্যক্তি অত্যন্ত সহজেই-এর মূল্য জেনে নিতে পারে। আর মূল্য স্থির থাকা অবস্থায় কোনো ভুল-ভ্রান্তি বা ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যে সকল ফকিহ বাজার দর অনুযায়ী পণ্য বেচাকেনাকে বৈধ বলেন; তাদের কাছে পণ্য দ্বারা এ ধরনের পণ্য উদ্দেশ্য। কারণ, এ জাতীয় পণ্য বেচাকেনার সময় মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্ভুল এই গাইড লাইনের উদ্ধৃতিই মূল্য বলে দেওয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। তাতে এমন অজ্ঞতা নেই যার দরুণ পরবর্তীকালে ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে। যেমনটি আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. ইঙ্গিত করেছেন—

وَمِمَّا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ الْبَيْعُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا حَلَّ بِهِ، أَوْ بِمَا تُرِيدُ أَوْ تُحِبُّ أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ أَوْ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى فُلَانٌ لَا يَجُوزُ... وَكَذَا لَا يَجُوزُ بِمِثْلِ مَا يَبِيعُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا لَا يَتَفَاوَتُ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ.

'যে সকল পদ্ধতিতে বেচাকেনা জায়েজ নেই তা হলো, কোনো পণ্যের

[১২৫] ইলামুল মুয়াক্কিয়িন, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪।

বেচাকেনা তার মূল্যের ওপর করা বা ক্রয়মূল্যে করা কিংবা যত টাকায় ক্রয় করতে ইচ্ছুক তত টাকায় বেচাকেনা করা, অথবা যে মূল্যে ক্রয় করতে সন্তুষ্ট সে পরিমাণ মূল্যে কেনা, অথবা মূলধনের ভিত্তিতে বেচাকেনা করা অথবা কারও ক্রয়মূল্যে বেচাকেনা করা। বেচাকেনার এই পদ্ধতিগুলো জায়েজ নেই। এমনিভাবে এই পদ্ধতিও জায়েজ নেই যে, বিক্রেতা বললো, আমার এই পণ্যটি তার অনুরূপ পণ্যের দর অনুযায়ী বিক্রয় করছি, তাহলেও তা বৈধ হবে না। তবে যদি ওই পণ্যটি এমন হয় যার মূল্যের মাঝে কোনো তারতম্য হয় না। যেমন রুটি গোশত, তাহলে তার বেচাকেনা জায়েজ আছে।

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.ও আন নাহরুল ফায়েক গ্রন্থ থেকে এ জাতীয় উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন :

وَخَرَجَ أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا كَالْبَيْعِ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ أَوْ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ فُلَانٌ ... وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ بَاعَهُ بِمِثْلِ مَا يَبِيعُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا لَا يُتَفَاوَتُ.

'এই হুকুম থেকে ওই বেচাকেনা বের হয়ে গেছে যার মাঝে মূল্য অজ্ঞাত থাকে। যেমন : ওই পণ্যের মূল্যের ওপর বেচাকেনা করা কিংবা মূলধনের ভিত্তিতে বেচাকেনা করা অথবা ক্রেতার ক্রয়মূল্যে বেচাকেনা করা বা অমুক ব্যক্তির ক্রয়মূল্যে বেচাকেনা করা। তাছাড়া এই পদ্ধতিও নাজায়েজ যে, বিক্রেতা বলবে, এই পণ্য বাজারে যে মূল্যে বেচাকেনা হয় সেই মূল্যে আমি বিক্রয় করবো। তবে শেষ এই পদ্ধতিতে বেচাকেনা জায়েজ হবে যদি এই পণ্যটি এমন হয় যার মূল্যের মাঝে তারতম্য হয় না।'[১২৬]

আমার ধারণামতে এই সিদ্ধান্তটি ভারসাম্যতার খুব কাছাকাছি এবং নীতিমালার সঙ্গে উপযোগীও বটে। কারণ, মূল্যের এমন অজ্ঞতা যা ঝগড়া বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় বেচাকেনা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে তাই কেবল প্রতিবন্ধক। কিন্তু যখন সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা প্রণয়নের কারণে ঝগড়া বিবাদের সম্ভাবনা রহিত হয়ে যায় এবং কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা আর বাকি না থাকে, তখন সেই বেচাকেনা জায়েজ হিসেবে গণ্য হবে।

---

[১২৬] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫২৯।

বর্তমান সময়ে অনেক পণ্য এমন রয়েছে যে, তার সমপর্যায়ভুক্ত পণ্যের মূল্যকে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যার দরুণ এরপর আর মূল্য নিয়ে কোনো প্রকার জটিলতা থাকে না। তাই এ জাতীয় পণ্যের মাঝে লেনদেন করা জায়েজ এবং বাজার দরের ভিত্তিতে এ জাতীয় পণ্যে ইসতিজরারও জায়েজ। যেমন : আজকাল মানুষ পত্রিকা হকারদের সঙ্গে লেনদেন করে। হকার প্রত্যহ গ্রাহকের বাড়িতে এই উদ্দেশ্যে পত্রিকা রেখে যায় যে, মাস শেষে পত্রিকার গায়ের মূল্যের ভিত্তিতে হিসাব-নিকাশ চুকানো হবে। এতে কোনো কোনো সময় এমন হয় যে, ক্রেতা নিজেও জানে না পত্রিকার গায়ের রেট কত? তবে পত্রিকার গায়ের মূল্য এমনভাবে নির্দিষ্ট যে, মানুষ তাতে পরিবর্তন করতে চাইলেও পারবে না। হাঁ! কখনো কখনো আবার এমনও হয় যে, মাসের মাঝে তার দাম বেড়ে যায়। তবে এই পরিবর্তন সকল ক্রেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনো নির্দিষ্ট ক্রেতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। সুতরাং পত্রিকার মূল্য নির্দিষ্ট করার মাঝে কোনো প্রকার ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা বিদ্যমান নেই। তাই হকার যখন ক্রেতার বাড়িতে তার নির্দেশ বা তার অনুমতিতে পত্রিকা রেখে আসবে তখন বাজার দর অনুপাতেই কেনাবেচা সংঘটিত হয়ে যাবে। এ হিসাবেই মাস শেষে হিসাব-নিকাশ চুকানো হয়। এটি ছিলো মূল্য পরবর্তীকালে প্রদানের ভিত্তিতে ইসতিজরারের দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ।

এই বিশদ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসতিজরারের দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে বেচাকেনা ওই সময় সংঘটিত হয় যে সময় ক্রেতা পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তবে শর্ত হলো, ওই পণ্যের মূল্য সুনির্দিষ্ট কোনো মানদন্ডের আলোকে এমনভাবে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে যেন মূল্য নির্ধারণে পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদের কোনো সম্ভাবনা না থাকে। আর যদি পণ্যটির মূল্য এমন কোনো মানদন্ডের আলোকে চূড়ান্ত করা সম্ভব না হয়, তাহলে পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণের সময় বেচাকেনা সংঘটিত হবে না। এই অবস্থার শরয়ি বিধান তৃতীয় পদ্ধতিতে বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৩. ইসতিজরারের তৃতীয় পদ্ধতি হলো, পণ্য গ্রহণের সময় তার মূল্য জানা থাকে না। এমনকি লেনদেনের সময় ক্রেতা বিক্রেতার অন্তরে এমন কোনো মানদন্ড থাকে না, যার ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় এবং ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকে। বরং ক্রেতা বিক্রেতা উদাসীনতার

সঙ্গে লেনদেন করে থাকে; মূল্য নির্ধারণের কোনো তোয়াক্কাই করে না। এই পদ্ধতিতে যেহেতু পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময় মূল্য একেবারেই অজ্ঞাত থাকে আর অজ্ঞতাটা এমন যে, যে-কোনো সময়-ঝগড়া বিবাদ হওয়ার আশংকা থাকে। তাই পণ্য গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কেনাবেচা সংঘটিত হবে না। বরং মাস শেষে হিসাব-নিকাশ হওয়া পর্যন্ত চুক্তিটি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য মুতাআখিরিন হানাফি ফকিহগণ বলেন, যখন মাস শেষে ক্রেতা বিক্রেতা হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করবে তখন এই বেচাকেনা সহিহ হবে। এরপর কতক ফকিহ বলেন, হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করার সময়ই এই লেনদেন 'কেনাবেচার' আকৃতি ধারণ করবে। এর অর্থ হলো, হিসাব-নিকাশের পর যখন ওই পণ্যের সঠিক মূল্য ক্রেতা বিক্রেতার সামনে এসে যাবে, তখন কেনাবেচা শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে তাতে একটি প্রশ্ন হয় যে, ক্রেতা দোকানদারের কাছ থেকে যে পণ্য মাসজুড়ে নিয়েছিলো, এর অধিকাংশই ক্রেতা ব্যবহার করে শেষ করে ফেলেছে; হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করার সময় ওই পণ্যের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। তাহলে এসব পণ্যের বেচাকেনা কীভাবে শুদ্ধ হবে?

কোনো কোনো ফকিহ এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, যদিও এটি অস্তিত্বহীন বস্তুর কেনাবেচা। কিন্তু সামাজিক প্রচলন এবং ব্যাপক ছড়াছড়ির প্রেক্ষিতে استحسانا বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে তা জায়েজ। এটি আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ.-এর অভিমত। আলবাহরুর রায়েক এবং আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের গ্রন্থে এই অভিমত উল্লিখিত হয়েছে। বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। এছাড়া এখানে আরও একটি প্রশ্ন হয় যে, এই পদ্ধতিতে ক্রেতার এমন পণ্যে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হয়, যা তার মালিকানায় নেই এবং তার বেচাকেনাও হয়নি। অথচ মালিকানাবিহীন কোনো জিনিসের মাঝে হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। এই প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া হয় যে, এখানে যেহেতু হস্তক্ষেপ হচ্ছে মালিকের অনুমতিক্রমে আর মালিকের অনুমতিতে তার পণ্যে হস্তক্ষেপ করা জায়েজ আছে। তাই এই পদ্ধতি জায়েজ।

কিছু ফিকহশাস্ত্রবিদ এই লেনদেনকে বেচাকেনার অধীনে না এনে, বরং তাকে ضمان المتلفات অর্থাৎ, বিনষ্ট পণ্যের ক্ষতিপূরণের অধীন করে জায়েজ বলেছেন। কারণ হলো, পণ্য গ্রহণের সময় মূল্য অজ্ঞাত ছিলো। আর হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করার সময় পণ্যের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না।

সুতরাং এ জাতীয় লেনদেনকে বেচাকেনা বলা কোনোমতেই ঠিক হবে না। তাই একে বলা হবে যে, পণ্য গ্রহীতা পণ্য নেওয়ার সময় তা ঋণ হিসেবে নিয়েছিলো। তারপর তা ব্যবহার করে নষ্ট করে ফেলেছে। এখন তার ফলাফল হলো, তার ক্ষতিপূরণ আসবে। আর হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করার সময় ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হবে সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেবে।

অবশ্য এতেও একটি প্রশ্ন হয় যে, হানাফি মাজহাবে শুধুমাত্র مثليات অর্থাৎ, পরিমাপযোগ্য সমজাতীয় পণ্যে কর্জ লেনদেন করা বৈধ। কিন্তু قيميات তথা অপরিমেয় পণ্যে কর্জ লেনদেন করা বৈধ নয়। অথচ অনেক সময় এ জাতীয় পণ্যেও ইসতিজরার হয়ে থাকে। তাই তারা এর জবাবে বলেছেন যে, ইসতিজরারকে এ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী বাদ রাখা হয়েছে। যেমনিভাবে রুটি এবং আটার খামিরার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে কর্জকে জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ এ উভয় পণ্য অপরিমেয় পণ্যের মাঝে শামিল।

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. ইসতিজরারের আলোচনাধীন পদ্ধতিকে বৈধ সাব্যস্ত করার এবং এতদসংক্রান্ত উল্লিখিত বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা তাঁর রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অধম প্রবন্ধকারের কাছে এ জাতীয় লেনদেনকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিটিই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। আর সেটি হলো, হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করার সময় যখন ক্রেতা বিক্রেতা ওই পণ্যের মূল্যের ওপর একমত পোষণ করবে তখন এই বেচাকেনা চুক্তি চূড়ান্ত লেনদেনে পরিণত হয়ে জায়েজ সাব্যস্ত হবে। অবশ্য এই পদ্ধতিতে একটি প্রশ্ন হবে যে, অস্তিত্বহীন বস্তুর কেনাবেচা তো নাজায়েজ?

এই প্রশ্নের সঠিক জবাব হলো, বাস্তবে এই পদ্ধতিতে অস্তিত্বহীন বস্তুর বেচাকেনা নয়, বরং এমন জিনিসের বেচাকেনা হচ্ছে যা থেকে ক্রেতা পূর্ণভাবে উপকৃত হয়েছে। আর সেই উপকৃত হওয়ার কারণেই ওই পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। অস্তিত্বহীন বস্তুর বেচাকেনা হারাম হওয়ার কারণ হলো, তাতে প্রতারণা বিদ্যমান থাকে। অনেক সময় যে কারণে বিক্রেতা সেই পণ্যকে ক্রেতার কাছে সোপর্দ করতে অক্ষম হয়। তবে আমাদের আলোচনাধীন পদ্ধতিতে প্রতারণা বিদ্যমান নেই। কারণ, বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যকে ক্রেতার

কাছে আগেই সোপর্দ করে দিয়েছে আর পণ্য ক্রেতার কাছে বিদ্যমান ছিলো। সে তা থেকে উপকৃতও হয়েছে। এমনকি সেই পণ্য উপকৃত হওয়ার ফলে শেষও হয়ে গিয়েছে। তাই হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করার সময় ওই পণ্যকে বিদ্যমান ধরে নেওয়া হবে। এভাবে সেই বেচাকেনা বৈধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, এ অবস্থায় ক্রেতা কর্তৃক এসব পণ্য ব্যবহার করা এবং এগুলোর মাঝে তার হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি বেচাকেনা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগেই সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে। আর এটি অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ হওয়ার কারণে শরিয়তে নাজায়েজ। এই প্রশ্নের জবাবে বলা হবে, হিসাব-নিকাশ চুকানোর সময় যখন কেনাবেচা সঠিক হয়ে গেল, তখন সেই সঠিক হওয়ার বিষয়টিকে পরোক্ষভাবে ওই সময়ের দিকে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হবে যে সময় ক্রেতা ওই পণ্যে নিজের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলো। আর এমনটি মনে করা হবে যে, ক্রেতা ওই পণ্যে হস্তক্ষেপ করেছে যেই পণ্যটির মালিকানা ক্রয়সূত্রে অর্জিত হয়েছে। এই পদ্ধতিটি ঠিক ছিনতাইকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো। অর্থাৎ, ছিনতাইকৃত পণ্যে ছিনতাইকারীর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। তবে ছিনতাইকারী যদি ছিনতাইকৃত পণ্যের জরিমানা আদায় করে দেয়, তাহলে সে ওই পণ্যের মালিক হয়ে যায়। আর তার এই মালিকানার সময় গণ্য করা হয় ছিনতায়ের সময় থেকেই। যেন ছিনতাইকারী ছিনতাই করার সময় থেকেই এর মালিক হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং অগ্রগন্য অভিমত অনুযায়ী ছিনতাইকারীর সকল কার্যক্রম যা সে ছিনতাইকৃত বস্তুকে কেন্দ্র করে করেছিলো, জরিমানা প্রদানের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা বৈধ বলে সাব্যস্ত হবে। আর যে পদ্ধতিতে ছিনতাই আক্রান্ত ব্যক্তি ছিনতাইকৃত বস্তু ছিনতাইকারী ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে হালাল করে দেয়; সে অবস্থায় কোনো মতবিরোধই নেই যে, ছিনতাইকারী জরিমানা আদায়ের পর সকল হস্তক্ষেপ বৈধ বলে গণ্য হবে।

অতএব ছিনতাইয়ে ছিনতাইকারী জরিমানা আদায় করার পর ছিনতাইকৃত বস্তুর মালিক তখন থেকে হয়, যখন সে ওই বস্তু ছিনতাই করেছিলো। এ হিসেবে ইসতিজরার এ পণ্য গ্রহীতার মালিকানা আরও নিশ্চিত হবে বটে। কারণ, তাতে সে মালিকের অনুমতিক্রমে ওই পণ্য গ্রহণ করে ব্যবহার করেছে। এছাড়া ইসতিজরার এ পণ্যগ্রহীতা গুনাহগার বলেও গণ্য হবে না। তবে ছিনতাইকারী ছিনতাইয়ের কারণে গুনাহগার হবে।

মোটকথা ইসতিজরারের লেনদেনটি ضمان للمتلفات তথা বিনষ্ট পণ্যের ক্ষতিপূরণের মতো নয়। যেমনটি দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারী ফিকহশাস্ত্রবিদগণের ধারণা। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, এটি ضمان للمتلفات তথা পণ্য নষ্ট করার ক্ষতিপূরণের মতো হতে পারে এ হিসেবে যে, এই লেনদেনে পরবর্তীকালে সংঘটিতব্য বেচাকেনা চুক্তিকে-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়। যেমনিভাবে জরিমানা আদায়ের পর অর্জিত মালিকানাকে ছিনতাইয়ের সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়ে থাকে।

সারকথা

মূল্য পরবর্তীকালে আদায়ের শর্তে যে ইসতিজরার হয়ে থাকে তার শরয়ি বিধান সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—

১. যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য গ্রহণকালেই মূল্য জানিয়ে দেয়, তাহলে এমতাবস্থায় প্রতিটি পণ্য গ্রহণকালেই বেচাকেনা জায়েজ হয়ে যাবে। এই পদ্ধতি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সেসকল ফিকহশাস্ত্রবিদ একমত। যারা 'হাতে হাতে বেচাকেনা'কে জায়েজ মনে করেন। আর অনেকগুলো পণ্য গ্রহণের পর একসঙ্গে পরবর্তীকালে হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত করা হবে।

২. বিক্রেতা যদি প্রতিবার ক্রেতার কাছে পণ্যের মূল্য বর্ণনা না করে, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের এ কথা জানা থাকতে হবে যে, এই কেনাবেচা বাজার মূল্যে হচ্ছে। আর সে ক্ষেত্রে বাজার মূল্যও এমন নির্দিষ্ট যে, এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই পদ্ধতিতেও প্রতিবার পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় চুক্তি সহিহ হয়ে যাবে।

৩. যদি পণ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময় বিক্রিত পণ্যের মূল্য জানা না থাকে অথবা ক্রেতা-বিক্রেতা এ কথার ওপর একমত হয় যে, বাজার মূল্যের ওপর এই বেচাকেনার চুক্তি সম্পন্ন হবে। কিন্তু বাজারে এই পণ্যের মূল্যে এত ব্যবধান হয় যে, তার মূল্য নির্দিষ্ট করণে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে এ অবস্থায় পণ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময় বেচাকেনা সহিহ হবে না, বরং হিসাব-নিকাশ যখন চূড়ান্ত করা হবে তখন এই বেচাকেনা সহিহ হবে। কিন্তু এটি সহিহ হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময়ের দিকে সম্পৃক্ত করা হবে। সুতরাং এই

পণ্যে ক্রেতার মালিকানা পণ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সাব্যস্ত হবে এবং মূল্য আদায়ের পর নিয়ন্ত্রণের সময় থেকেই পণ্যে ক্রেতার যাবতীয় হস্তক্ষেপ হালাল বলে গণ্য হবে।

অগ্রীম টাকা জমা দিয়ে ইসতিজরার করা

ইসতিজরারের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, ক্রেতা বিক্রেতাকে অগ্রীম টাকা দিয়ে রাখে। তারপর বিক্রেতা থেকে অল্প অল্প করে পণ্য নিতে থাকে। এরপর মাস শেষে কিংবা বছর শেষে ক্রেতার বিভিন্ন পণ্য গ্রহণ করার পর হিসাব-নিকাশ চুকানো হয়।

ইসতিজরারের এই পদ্ধতির দুটি দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। এক এই যে, এ পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য জানা থাকবে নাকি অজানা থাকবে? আর দ্বিতীয় হলো ক্রেতা আগে যে টাকা প্রদান করেছে তার অবস্থান কি হবে?

মূল্য জানা অজানার ব্যাপারে এখানেও সেই তিনটি পদ্ধতি পাওয়া যায় যা পরবর্তীকালে মূল্য পরিশোধের শর্তে ইসতিজরারের চুক্তির মাঝে পাওয়া গিয়েছিলো। এর বিধানও তাই হবে যা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিলো। সুতরাং এ ব্যাপারে তাতে কোনো পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয় মাসআলা তথা আগে প্রদানকৃত টাকার অবস্থান কী হবে? এ টাকাকে আগে পরিশোধিত মূল্য বলা হবে নাকি বিক্রেতার হাতে আমানত মনে করা হবে? না এই টাকা কর্জ হিসেবে ধরা হবে?

যদি একে 'আগে পরিশোধিত মূল্য' বলা হয়, তাহলে এর জন্য দুটি শর্ত জরুরি :

প্রথম শর্ত এই যে, মূল্য আদায়ের সময় বিক্রিত পণ্যের প্রকার, গুণাগুণ এবং তার পরিমাণ সব জানা জরুরি। কারণ, মূল্য বলতে গেলে বেচাকেনা হতে হবে। আর বেচাকেনার শর্তের মাঝে এটিও একটি যে, পণ্যের প্রকার, গুণাগুণ এবং তার পরিমাণ জানা থাকা।

দ্বিতীয় শর্ত : পণ্য এমন বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যেগুলোর মধ্যে بيع سلم (অর্থাৎ, অগ্রিম মূল্য দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর পণ্য গ্রহণ করা) বা بيع استصناع (অর্থাৎ, অগ্রিম মূল্য দিয়ে পণ্য তৈরির অর্ডার দেওয়া) হতে পারে। চুক্তির মাঝে ওই সকল শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে সকল শর্ত بيع سلم ও بيع استصناع জায়েজ হওয়ার জন্য জরুরি। বিভিন্ন ফুকাহায়ে কেরাম যেসব শর্ত দিয়েছেন

সেসব শর্ত অনুযায়ী 'আগে মূল্য পরিশোধ মূলক ক্রয়-বিক্রয়' শুধু بيع سلم এবং بيع استصناع এর মাঝেই হতে পারে। তাই এই লেনদেনে ওই সকল শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি।

বাস্তবতা হলো ইসতিজরারের মাঝে উল্লিখিত দুটি শর্তের কোনোটিই পাওয়া যায় না। কারণ, যে সময় ক্রেতা বিক্রেতাকে অগ্রীম অর্থ প্রদান করে ওই সময় কখনো এমন হয় যে, টাকা প্রদানকারীর খবরও থাকে না যে, ওই মূল্য দিয়ে সময়ে সময়ে কী পণ্য খরিদ করবে। আর যদি তার জানাও থাকে, তারপরও তার জন্য ওই পণ্যের গুণাগুণ, পরিমাণ এবং তা কেনার সময় উল্লেখ করা সম্ভব হয় না। তাই তাতে بيع سلم এর শর্ত পাওয়া যায় না। আবার কখনো কখনো ওই পণ্য তৈরি করার প্রয়োজনও হয় না। তাই তাতে بيع استصناع ও প্রমাণিত হয় না।

আর যদি বলা হয় ক্রেতা যে অর্থ বিক্রেতাকে দিয়েছে, ওই অর্থ বিক্রেতার কাছে আমানত-স্বরূপ। সুতরাং ক্রেতা যখনই বিক্রেতা থেকে কোনো পণ্য নেবে তখনই তার আমানতের অর্থ থেকে ওই পরিমাণ অর্থ ওই পণ্যের মূল্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট অর্থ বিক্রেতার কাছে আগের মতো আমানত হিসেবে জমা থাকবে। সেই অবশিষ্ট টাকার মধ্যে বিক্রেতার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না। কারণ, আমানতের অর্থের মাঝে হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নেই। এ পদ্ধতিটি খুবই জটিল। বরং বাস্তবে তা প্রায় অসম্ভব। আর ইসতিজরারের যে পদ্ধতি প্রসিদ্ধ এটি তারও বিপরীত। কারণ, ইসতিজরারের মধ্যে বিক্রেতা এই অর্থ পৃথকভাবে সংরক্ষণ করে রাখে না। বরং শুধু হিসাবপত্রটা খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখে। আর তাতে যেভাবে ইচ্ছে হস্তক্ষেপ করতে থাকে।

আর যদি আমরা এ কথা বলি, যে অর্থ ক্রেতা বিক্রেতাকে দিয়েছে, তা ঋণস্বরূপ। তাই বিক্রেতার জন্য তাতে হস্তক্ষেপ করা এবং তা ব্যবহার করা জায়েজ, তাহলে এ পদ্ধতিতে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, এটি এমন ঋণ যা ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিক্রয় চুক্তির সঙ্গে শর্তযুক্ত। কারণ, ক্রেতা এখানে বিক্রেতাকে যে ঋণ দিয়েছে তা সহানুভূতি-স্বরূপ নয়, বরং এজন্যে দিয়েছে যাতে ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে বেচাকেনা করতে পারে। ফলে এখানে ঋণের লেনদেনের মধ্যে বেচাকেনা শর্তযুক্ত হয়ে গেল। আর এটি এমন একটি শর্ত যা ঋণচুক্তির উদ্দেশ্য পরিপন্থি। সুতরাং এই পদ্ধতি ফাসেদ হওয়া উচিত।

আমার ধারণা মতে যে সকল ফকিহ ইসতিজরারের মাসআলা নিয়ে আলোচনা

করেছেন তাদের কেউই এই প্রশ্নের পেছনে ছুটেননি। আমার মতে ক্রেতা যে অর্থ বিক্রেতাকে প্রথমেই দিয়ে দিয়েছে, তাকে বলা হবে হিসাবের ওপর প্রদত্ত টাকা। আর যে অর্থ হিসাবের ভিত্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে, ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী যদিও তাকে ঋণ হিসেবেই গণ্য করা হয়। যেমন : যে ব্যক্তিকে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে, সে তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে পারে। আবার এই টাকা নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণও দিতে হয়; কিন্তু হিসাবের ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থ এমন ঋণ হয়ে থাকে যার মধ্যে ভবিষ্যতে বেচাকেনার শর্ত করাও জায়েজ আছে। কারণ, তা একটি প্রসিদ্ধ শর্ত। আর যে টাকা হিসাবের ভিত্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে তার উদ্দেশ্য ঋণ দেওয়া নয়; বরং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বেচাকেনার কারণে ক্রেতার ওপর যে দায় দায়িত্ব আরোপিত হবে সেই দায়িত্ব থেকে ক্রেতাকে মুক্ত করা উদ্দেশ্য থাকে; যেন ক্রেতার জন্য তার প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়। তাই এটি এমন এক ঋণ যার মধ্যে বেচাকেনার শর্ত আরোপ করা একটি প্রসিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আর যে শর্ত সমাজে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তা হানাফিদের কাছে বৈধ। যদিও এই শর্ত চুক্তির পরিপন্থি। যেমন : এমন শর্ত করে চামড়া ক্রয় করা জায়েজ আছে যে, বিক্রেতা তা জুতো বানিয়ে দেবে।

আর একারণেই যে সকল ফিকহশাস্ত্রবিদ ইসতিজরারকে জায়েজ বলেন, চাই তাতে অর্থ আগে পরিশোধ করা হোক বা পরে পরিশোধ করা হোক তারা তাতে কোনো পার্থক্য করে না। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন :

قَالَ: فِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ: دَفَعَ دَرَاهِمَ إِلَى خَبَّازٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ مِائَةَ مَنٍّ مِنْ خُبْزٍ، وَجَعَلَ يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَمْنَاءَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَمَا أَكَلَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى خُبْزًا غَيْرَ مُشَارٍ إِلَيْهِ، فَكَانَ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا وَلَوْ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ، وَجَعَلَ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَمْنَاءٍ وَلَمْ يَقُلْ فِي الِابْتِدَاءِ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ يَجُوزُ وَهَذَا حَلَالٌ وَإِنْ كَانَ نِيَّتُهُ وَقْتَ الدَّفْعِ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ الْآنَ بِالتَّعَاطِي وَالْآنَ الْمَبِيعُ مَعْلُومٌ فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ صَحِيحًا. اهـ قُلْت: وَوَجْهُهُ أَنَّ ثَمَنَ الْخُبْزِ مَعْلُومٌ فَإِذَا انْعَقَدَ بَيْعًا بِالتَّعَاطِي وَقْتَ الْأَخْذِ مَعَ دَفْعِ الثَّمَنِ قَبْلَهُ، فَكَذَا إِذَا تَأَخَّرَ دَفْعُ الثَّمَنِ بِالْأَوْلَى.

‘আল ওয়াল ওয়ালিজিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি বেকারির মালিককে কিছু দিরহাম দিয়ে বলে, আমি তোমার থেকে

একশত কিলো রুটি কিনেছি। তারপর সে বেকারি থেকে প্রতিদিন পাঁচ কিলো রুটি নিতে থাকে, তাহলে এই বেচাকেনা ফাসেদ বলে গণ্য হবে এবং সেই রুটি খাওয়া মাকরুহ হবে। কারণ, সে অনির্দিষ্ট রুটি কিনেছে। ফলে এখানে পণ্য অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে কিছু দিরহাম দেওয়ার পর, প্রতিদিন বিক্রেতা থেকে পাঁচ কিলো রুটি নিতে থাকে, আর দেরহাম দেওয়ার সময় এ কথা না বলে যে, আমি তোমার থেকে এতগুলো রুটি ক্রয় করবো, তাহলে এমতাবস্থায় এই বেচাকেনা জায়েজ হবে এবং সেই রুটি খাওয়া হালাল হবে। যদিও দেরহাম দেওয়ার সময় রুটি ক্রয় করার নিয়ত করেছিলো। কারণ, শুধু নিয়ত দিয়ে বেচাকেনা সংঘটিত হয় না। এখন এই লেনদেন হাতেহাতে বেচাকেনা হিসেবে গণ্য হবে। আর এখন পণ্যের অজ্ঞতাও আর নেই। তাই এই বেচাকেনা সহিহ হবে। আমার অভিমত অনুযায়ী এই বেচাকেনা বৈধ হওয়ার কারণ হলো, রুটির মূল্য জানা আছে। আর রুটি নেওয়ার সময় যেহেতু হাতে হাতে বিক্রয় সংঘটিত হয়ে গেল; এমতাবস্থায় যে, ক্রেতা আগেই মূল্য পরিশোধ করেছিলো। সেহেতু যে পদ্ধতিতে ক্রেতা মূল্য পরে পরিশোধ করবে সে পদ্ধতিতে বেচাকেনা আরও উত্তমভাবে জায়েজ হবে।[১২৭]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. 'আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের' গ্রন্থে উল্লেখ করেন –

وَمِنْهَا لَوْ أَخَذَ مِنَ الْأَرُزِّ وَالْعَدَسِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَقَدْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهِ دِينَارًا مَثَلًا لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ ثُمَّ اخْتَصَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي قِيمَتِهِ هَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْأَخْذِ أَوْ يَوْمَ الْخُصُومَةِ. قَالَ: فِي التَّتِمَّةِ: تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْأَخْذِ

'যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে চাল, ডাল বা এ জাতীয় অন্য কোনো পণ্য গ্রহণ করে। এবং পণ্য গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি প্রথম থেকেই কিছু দিনার সেই ব্যক্তির কাছে এই উদ্দেশ্যে রেখে দেয়, যাতে প্রয়োজনের সময় খরচ করতে পারে। তাহলে পরবর্তীকালে ওই পণ্যের মূল্য নিয়ে উভয়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হলে ওই সময় কোন দিনের মূল্য ধরা হবে? পণ্য যে দিন নিয়েছে সেদিনের মূল্য ধরা হবে, নাকি বিবাদ যে দিন হয়েছে সেই দিনের মূল্য ধরা হবে? পরিশিষ্টে এ ব্যাপারে

[১২৭] রদ্দুল মুহতার : ৪।

বর্ণিত হয়েছে যে, যেদিন সে পণ্য গ্রহণ করেছিলো ওই দিনের বাজার মূল্য ধরা হবে।[১২৮]

ইতোপূর্বেও ইমাম মালিক রহ.-এর একটি অভিমত 'মুআত্তা'-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে :

وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَماً. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ منه مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً.

'এতে কোনো সমস্যা নেই যে, এক ব্যক্তি কোনো দোকানির কাছে একটি দিরহাম রেখে দেবে। তারপর সেই দোকানদার থেকে ওই দিরহামের এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ কিংবা ওই দিরহামের নির্দিষ্ট একটি অংশের বিনিময়ে কোনো জিনিস কিনে নেবে।[১২৯]

এই উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয়, যেভাবে মূল্য পরে পরিশোধ সাপেক্ষে ইসতিজরার জায়েজ আছে; ঠিক তেমনিভাবে অর্থ অগ্রীম প্রদান সাপেক্ষেও ইসতিজরার জায়েজ আছে। আর বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত এই টাকা বিক্রেতার কাছে ঋণ হিসাবে থাকবে। তারপর বেচাকেনার সময় ঋণের ওই অর্থ পণ্যের মূল্যের আনুপাতিক হারে কাটা হবে। আর এই অর্থ বিক্রেতার কাছে দায়বদ্ধ হিসেবে থাকবে। যদি সেই অর্থ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা বিক্রেতার সম্পদ থেকে বিনষ্ট হবে। তবে যদি এই অর্থ বিক্রেতার কাছে আমানত হিসেবে রাখা হয় আর বিক্রেতা যদি তাতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে বিক্রেতার কাছে সেই অর্থ আমানত হিসেবে গণ্য হবে। তখন বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ আসবে না।

এর মাধ্যমে পত্র-পত্রিকা বা অন্যকোনো জিনিসপত্রের ডাকযোগে ক্রেতার কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে বার্ষিক বা মাসিক হিসাব অনুযায়ী অগ্রীম টাকা নিয়ে নেওয়ার সমাধানটিও বেরিয়ে আসে। আজকাল আমাদের দেশে-এর প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, মাসে মাসে বা সপ্তাহে সপ্তাহে বিক্রেতা বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পত্র-পত্রিকা বা জিনিসপত্র প্রেরিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ওই সকল প্রতিষ্ঠানের কাছে যে অর্থ আগেই জমা রাখা হয় তা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকবে। ক্রেতার কাছে যে পত্রিকা পৌঁছেছে কেবল সেই

[১২৮] রদ্দুল মুহতার : ৪।

[১২৯] মুআত্তা ইমাম মালিক রহ.।

পত্রিকার ক্ষেত্রেই বেচাকেনা সম্পন্ন হবে। এ জন্যই বছরের মাঝে যদি পত্রিকা আসা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আবশ্যক হয় অবশিষ্ট সেই অর্থ ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া।

চতুর্থত : ব্যাংকিং সেক্টরে ইসতিজরারের ব্যবহার

ব্যাংকিং সেক্টরে ইসতিজরারের প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, আজকাল ইসলামি ব্যাংকগুলোতে যে সমস্ত লেনদেনের প্রচলন আছে তা মূলত চার ধরনের –

১. 'মুরাবাহা' (তথা ক্রয় মূল্য উল্লেখপূর্বক তার চেয়ে বেশি দামে বিক্রয় করা।)

২. 'ইজারা' (তথা পণ্য ভাড়া দিয়ে মুনাফা অর্জন করা।)

৩. 'মুদারাবা' (তথা একজনের মূলধনের সঙ্গে অপরজনের শুধু শ্রম দিয়ে বানিজ্য করা।)

৪. 'মুশারাকা' বা শরিকানা ব্যাবসা করা।

এই চার ধরনের লেনদেনের মাঝে শেষ তিন ধরনের মধ্যে ইসতিজরারের লেনদেন সম্ভব নয়। কারণ, ব্যাংকের গ্রাহকেরা যারা ব্যাংক থেকে মূলধন সংগ্রহের মাধ্যমে কারবার চালিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে ইসতিজরারের লেনদেন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাংক সাপলায়ারের সঙ্গে ইসতিজরারের ভিত্তিতে 'মুরাবাহা'-এর লেনদেন এভাবে করতে পারে যে, ব্যাংক আগে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই সমঝোতা করে নেবে যে, সে বাজার দর অনুযায়ী অচিরেই তার থেকে বিভিন্ন সামানপত্র, যন্ত্রপাতি এবং মেশিনারিজ ক্রয় করবে। অথবা বাজার দর অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডিসকাউন্ট সাপেক্ষে সামানপত্র ক্রয় করবে। এরপর ব্যাংকের কাছে যখন কোনো গ্রাহক আসবে শরয়ি নিয়ম অনুযায়ী 'মুরাবাহা'-এর লেনদেন করতে, তখন ব্যাংক ইসতিজরারের ভিত্তিতে গ্রাহকের প্রয়োজনীয় সামানপত্র ওই ব্যবসায়ী থেকে কিনে নেবে। তারপর ব্যাংক ওই সামানপত্র গ্রাহকের কাছে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করবে। আর ইসতিজরার চুক্তি যেহেতু হাত বহাত ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এজন্যে ব্যাংকের গ্রাহকেরা ব্যাংকের সঙ্গে ইসতিজরারের ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারবে না।

অবশ্য এখানে এ পদ্ধতি আছে যে, ব্যাংক তার সঙ্গে ইসতিজরারের সাদৃশ্যপূর্ণ

লেনদেন করবে। আর তা হলো, ব্যাংক তার সঙ্গে চুক্তি করবে যে, এক বছরের মধ্যে মুরাবাহার ভিত্তিতে ব্যাংক তাকে সর্বোচ্চ এই পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করবে। তারপর গ্রাহক ওই সকল পণ্য একই সঙ্গে উসুল না করে বছরের মাঝে বিভিন্ন সময়ে তা উসুল করে নেবে। যেমন : ব্যাংক গ্রাহকের সঙ্গে এই চুক্তি করলো যে, সে এক বছরের মধ্যে দশ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের সামানপত্র তার কাছে বিক্রয় করবে। তবে গ্রাহক এ সব সামানপত্র একসঙ্গে ক্রয় করবে না; বরং প্রথমে সে উদাহরণ-স্বরূপ এক মিলিয়ন টাকার সামানপত্র ক্রয় করবে। তারপর বছরের মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী ওই গ্রাহক ব্যাংক থেকে সামানপত্র ক্রয় করতে থাকবে। এভাবে এগ্রিমেন্টে উল্লিখিত দশ মিলিয়ন টাকার পণ্য পুরো বৎসরের মাঝে উসুল করে নেবে। আর তখনই চুক্তিটি শেষ হয়ে যাবে।

উপরে উল্লিখিত লেনদেন পরবর্তীকালে মূল্য আদায়ের প্রেক্ষিতে ইসতিজরারের যে প্রথম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তারই অনুরূপ। কারণ, গ্রাহক ব্যাংক থেকে কিছুদিন পরপর সামানপত্র নিতে থাকে। তবে প্রতিবার সামানপত্র নেওয়ার সময় তার মূল্য জানা হয়। এই চুক্তিতে 'তায়াতি' পদ্ধতিতে বিক্রিকে যে সকল ফিকহশাস্ত্রবিদ জায়েজ বলেন তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। আমরা পেছনে 'তায়াতি' পদ্ধতিতে বিক্রির আলোচনায় বলে এসেছি যে, 'মুরাবাহা'র লেনদেনে 'তায়াতি' পদ্ধতিতে বিক্রিকে জারি করার বিষয়টি এই লেনদেনকে সুদের সাদৃশ্য বানিয়ে দেয়। তাই এ জাতীয় লেনদেন থেকে বিরত থাকাই উচিত। কারণ, 'মুরাবাহা' চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সামানপত্র কে প্রথমে নিজের মালিকানায় নেবে। তারপর ব্যাংক এবং গ্রাহক ইজাব (প্রস্তাব) এবং কবুল (সম্মতি)-এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র বেচাকেনার চুক্তি করবে। এতে করে কিছু সময়ের জন্য হলেও ওই পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় এবং তার দায়িত্বে এসে যাবে। আর ব্যাংকের জন্য তা থেকে মুনাফা অর্জন জায়েজ হবে। সুতরাং উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে মুরাবাহা চুক্তিতে ইসতিজরারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েজ হবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

মুদারাবা সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

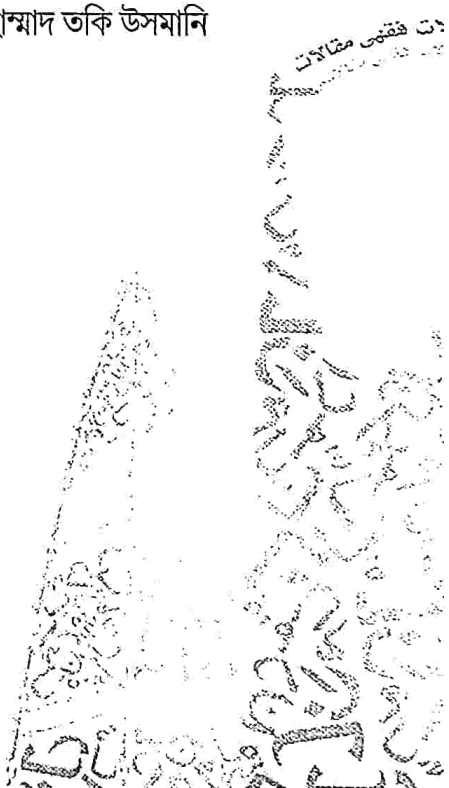

'মুদারাবা সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান' এ প্রবন্ধটি سندات المقارضة এর বঙ্গানুবাদ। শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) জেদ্দায় অবস্থিত 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক'-এর উদ্যোগে আয়োজিত একটি সেমিনারে এটি পেশ করেছিলেন। মুফতি তকি উসমানির সুযোগ্য সাহেবজাদা মাওলানা ইমরান আশরাফ উসমানি এর উর্দু অনুবাদ করেছেন। প্রবন্ধটি بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة গ্রন্থেও প্রকাশিত হয়েছিলো।

——আবদুল্লাহ মায়মান

মুদারাবা সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান

আজকের এই সেমিনারে আমাকে যে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা যদিও 'মুদারাবা সার্টিফিকেট' রহিত করার ব্যাপারে যে, তাকে কীভাবে শেষ করা হবে? কিন্তু এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করার আগে 'মুদারাবা সার্টিফিকেট'-এর বাস্তবতা এবং তার গুরুত্ব ও ফিকহি অবস্থান জেনে নেওয়া জরুরি; যেন 'মুদারাবা সার্টিফিকেট' রহিত করার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সার্টিফিকেটের শরয়ি অবস্থান স্পষ্ট হয়।

মুদারাবা সার্টিফিকেট

মুদারাবা সার্টিফিকেট-এর বাস্তবতা হলো, ওইসব সুদি ঋণের সার্টিফিকেটের শরয়ি বিকল্প সার্টিফিকেট যা বর্তমান যুগের ব্যাংক এবং ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো জারি করেছে। সর্বপ্রথম আমরা এই সুদি ঋণের সার্টিফিকেটের পরীক্ষা করে দেখবো।

প্রথমত : সুদি ঋণের সার্টিফিকেট

সুদি ঋণের সার্টিফিকেট মূলত এমন কিছু দলিলপত্র যা ওই সকল ঋণের প্রমাণ-স্বরূপ যা বিভিন্ন কোম্পানি সাধারণ মানুষ থেকে নির্দিষ্ট সুদের ভিত্তিতে নিয়ে

থাকে। আর এই দলিলপত্র ভবিষ্যতে বিক্রয় যোগ্যও হয়। কোনোমতেই এগুলো রহিত করা যায় না।

কোম্পানিগুলোর এ জাতীয় দলিলপত্র জারি করার প্রয়োজন এ জন্য হয় যে, কোনো কোনো সময় কোম্পানিগুলোর নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা কিংবা কোম্পানিকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে শেয়ারের ব্যবস্থা করার পরও অতিরিক্ত পুঁজির প্রয়োজন হয়। তখন কোম্পানি নতুন শেয়ার জারি করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। আর তা প্রমাণের জন্য দলিল-পত্রের প্রচলন করে থাকে। আর এসব দলিল পত্রকে সনদপত্র বা বন্ড বলা হয়। আর কোম্পানি নতুন করে এ জন্য শেয়ার জারি করে না যে, অতিরিক্ত শেয়ার জারি করার দ্বারা আগের অংশীদারদের অংশীদারিত্ব কমে যাবে। উদাহরণ-স্বরূপ : কোম্পানি প্রথমে এক লাখ টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করেছিলো। যা থেকে কোনো এক ব্যক্তি দুই হাজার টাকার শেয়ার নিয়েছিলো। তখন তার অংশীদারিত্ব ছিলো ২%। এখন যদি কোম্পানি আরও এক লাখ টাকার অতিরিক্ত শেয়ার জারি করে, তাহলে কোম্পানির মূল পুঁজি দাঁড়াবে ২লক্ষ টাকায়। আর ২ হাজার টাকা ২ লাখ টাকার ১% হয়ে যাবে। এভাবে নতুন শেয়ার জারি করার দ্বারা আগের অংশীদারদের লোকসান হয়ে যাবে। যার অনুমতি সে দেবে না। এ জন্যই কোম্পানি এ পদ্ধতিতে ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে।

তাছাড়া এই সহজতার কারণে সাধারণ মানুষেরও উপকার হয়। কেননা সে নিজের প্রতিদিনের বেঁচে যাওয়া অংশকে নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণে হয় নিজের ঘরে সংরক্ষণ করে রাখতো কিংবা ব্যাংকে জমা রাখতো। তবে মানুষের চাহিদা হলো, নিজের পুঁজিকে সার্বিক লাভজনক খাতে খাটানো। যেমন উৎপাদনশীল কাজ বা বড়ো কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে খাটানো। এখন যদি সে তার এ ইচ্ছাপূরণের জন্য নিজের পুঁজিকে বড়োবড়ো শিল্পকারখানা বা ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দেয়, তাহলে তাতে এ সন্দেহ থেকে যায় যে, ভবিষ্যতে তার এ পুঁজি ফিরে পেতে কোনো সমস্যা হয় কি না? এ কারণে সে তার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এ জাতীয় ঋণ দিতে পিছপা থাকে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য অর্থনীতিবিদরা বন্ড ও সার্টিফিকেট প্রথা প্রচলন করেছেন। যাতে পুঁজিপতিরা ঋণ দিতে উৎসাহিত হয় এবং তাদের টাকা সবধরনের সন্দেহ-সংশয় থেকে নিরাপদ হয় যায়। এই অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে একদিকে যেমন পুঁজিপতিকে নির্দিষ্ট সুদের লোভ দেখিয়ে ঋণ দানের উৎসাহ

জোগানো হয়। অপরদিকে খোলা বাজারে এই অঙ্গীকারনামা বেচাকেনারও সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে পুঁজিপতিরা যে-কোনো সময়ে নিজেদের পুঁজি ফিরিয়ে নিতে পারে এবং একে তারা খোলা বাজারে এর বাজারমূল্যে বিক্রয় করতে পারে।। যা অধিকাংশ সময় তার (Face value) অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে। এতে পুঁজিপতিরা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে।

এভাবেই আধুনিক অর্থব্যবস্থা মানুষর জন্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পুঁজি বিনিয়োগের এক সংরক্ষিত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। তবে তাতে যদি চিন্তা-ভাবনা করা হয়, তাহলে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রকৃতঅর্থে এই পদ্ধতি সুদি ঋণের ওপর ভিত্তিশীল। যার কারণে শরিয়ত একে কোনো ভাবেই অনুমোদন দিতে পারে না। তাছাড়াও তাতে আরও অনেক শরয়ি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বিদ্যমান রয়েছে। যার বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান এটি নয়। এ কারণে কোনো কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের মুসলিমরা চিন্তা-ফিকির করে শরিয়ত-সম্মত একটি 'মুদারাবা সার্টিফিকেট'-এর পদ্ধতি বের করেছেন। যার আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো—

مقارَضَة বা قِراض ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ চুক্তি। যেখানে পুঁজি বিনিয়োগকারী নিজের পুঁজি কোনো ব্যবসায়ী (যাকে মুদারিব বলা হয়)-কে দিয়ে থাকে। যাতে এর মাধ্যমে সে ব্যাবসা করতে পারে এবং তা থেকে যে মুনাফা অর্জিত হবে; তা পরস্পরে সম্মতির ভিত্তিতে বণ্টন করে নিতে পারে। এই চুক্তিকে 'মুদারাবা' চুক্তি বলে। এই 'মুদারাবা চুক্তির' দলিল পত্র (যাকে সনদপত্র বলে ব্যক্ত করা হয়) জারি করার উদ্দেশ্য হলো, এসব সনদপত্রের বাহক ও তার ইস্যুকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাঝে 'মুদারাবা' চুক্তি হয়ে যাওয়া। আর সনদপত্রের বাহকদেরকে নির্দিষ্ট পরিমান অংক মুনাফা দেওয়ার পরিবর্তে পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, কোম্পানি লাভবান হলে সিদ্ধান্তকৃত শতকরা হারে মুনাফা দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত : এসব সার্টিফিকেটের ব্যাপারে জারিকৃত বিশেষ কিছু নীতিমালা

কোনো কোনো ইসলামি রাষ্ট্র এই সনদপত্রের ব্যাপারে কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই আলোচনায় আমরা প্রথমে ওই সকল নীতিমালা এবং তার বাস্তব নমুনা পেশ করবো। যাতে এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে শরিয়তের বিধান বর্ণনা করা

সম্ভব হয়। এরপর আমরা ইসলামি শরিয়তের আলোকে খসড়া-স্বরূপ প্রচলিত কাজের একটি প্রস্তাব পেশ করবো।

এ মুহূর্তে আমাদের সামনে দুটি নীতিমালা রয়েছে। একটি হলো, জর্ডান সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা 'মুদারাবা সার্টিফিকেট নম্বর ১০-১৯৮১। আর দ্বিতীয়টি হলো, الشركات المساهمة এর নীতিমালা -১৯৮৪। এই নীতিমালাকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান চালু করেছে। এই নীতিমালায় ওই সার্টিফিকেট-এর ওপর একটি স্বতন্ত্র আলোচনা شهادات المساهمة المؤجلة (Partisipation Term Certificate) এ নামে বিদ্যমান।

জর্ডান সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা

জর্ডান সরকার কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা মুদারাবা সনদের বিস্তারিত বিবরণ জনাব ড. আবদুস সালাম আববাদি তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ প্রবন্ধটি আম্মানে অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি জেদ্দা-এর তৃতীয় অধিবেশনে পেশ করেছেন। সেই প্রবন্ধের সারকথা নিচে তুলে ধরা হলো।

১. 'মুদারাবা সার্টিফিকেট' এমন নির্দিষ্ট ও মূল্যমান বিশিষ্ট কাগুজে প্রমাণ যে, এগুলোকে বিভিন্ন কোম্পানি ও পুঁজি বিনিয়োগকারীদের সম্পদের দলিলপত্র হিসেবে জারি করা হয়ে থাকে। সেই লিখিত দলিলপত্রে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের নামও লিপিবদ্ধ থাকে। এর মাধ্যমে কোম্পানি মানুষদের থেকে পুঁজি উসুল করে থাকে। তারপর কোম্পানি সেই পুঁজির মাধ্যমে নিজেদের বড়োবড়ো কারবার বা শিল্প কারখানাকে পূর্ণতায় নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে কোম্পানি মুনাফা লাভ করে।

২. এই সনদের বাহকরা একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে ওই কারবারে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ পেয়ে থাকে। আর মুনাফার হার সনদপত্র জারি করার সময়ই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। 'মুদারাবার সনদ'-এর বাহকদেরকে কোনো প্রকার সুদ দেওয়া হয় না। আর না কোম্পানি থেকে সুদ তলব করার কোনো অধিকার তাদের রয়েছে।

৩. ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে 'পারস্পরিক ঋণ ব্যবস্থা'র প্রসিদ্ধ একটি নীতি হলো, যখন কারবার করে লাভবান হবে, তখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পুঁজিপতি

এবং কারবার পরিচালনাকারী কোম্পানির পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত হার অনুযায়ী মুনাফা পাবে। কিন্তু মুদারাবার জর্ডানি সনদপত্রে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর মুদারাবার সনদ'-এর বাহককে মুনাফা দেওয়া হবে। আর তখন বাণিজ্য পরিচালনাকারী কোম্পানি নিজ মর্জি অনুযায়ী তাদের মুনাফার হার নির্ধারণ করবে। তাতে সনদধারী ব্যক্তির কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। তবে কোম্পানির পক্ষ থেকে মুনাফা নির্দিষ্ট করার পর সার্টিফিকেট হোল্ডারকে তার অংশ দিয়ে দেওয়া হবে। আর কোম্পানির মুনাফার অংশ অংশীদারদের মাঝে বণ্টন করার পরিবর্তে পৃথকভাবে এক স্থানে সংরক্ষণ করে রাখা হবে। যাতে ওই পুঁজির মাধ্যমে ওইসব সনদপত্রকে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়বার কিনে রহিত করা যেতে পারে।

৪. প্রত্যেক 'সার্টিফিকেট হোল্ডারের' ওপর আবশ্যক হলো, ওই চুক্তিতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুত সময়ে সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে আসবে। আর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কোম্পানির কাছে দরখাস্ত করবে যে, কোম্পানি যেন ওই সার্টিফিকেটে উল্লিখিত মূল্য ফিরিয়ে দিয়ে তা রহিত করে দেয়, যাতে ওই সার্টিফিকেট হোল্ডার সার্টিফিকেটের বিনিময়ে প্রদেয় অর্থ ফিরিয়ে নিতে পারে। সুতরাং সার্টিফিকেট প্রদানকারী কোম্পানি ওই পুঁজি স্বীয় সংরক্ষিত মুনাফার মাধ্যমে ফিরিয়ে দেবে। যার আলোচনা তৃতীয় নাম্বারে অতিবাহিত হয়েছে।

৫. এভাবে সার্টিফিকেট হোল্ডার কোম্পানি প্রদেয় অর্থ উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে উসুল করে নেবে। পরবর্তীকালে এমন একটি সময় আসবে যখন সকল সার্টিফিকেট রহিত করার সব কাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন কোম্পানি ওই প্রজেক্ট ও কারবারের যাবতীয় জিনিসের মালিক হয়ে যাবে। যার ফলে পরবর্তীকালে ওই প্রজেক্টের যাবতীয় মুনাফা শুধু কোম্পানির অংশীদাররা পাবে। সার্টিফিকেট হোল্ডারকে কোনো মুনাফা দেওয়া হবে না।

৬. অবশ্য যদি ওই কোম্পানি লোকসানে পতিত হয়, তাহলে জর্ডান সরকার তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা রাখবে এবং গ্রাহকদের সার্টিফিকেটের ফেস ভ্যালুর জামিন হবে। যদিও লোকসানের ক্ষেত্রে মুদারাবার নীতি হলো, লোকসানটা শুধু পুঁজিদাতা বহন করবে। মূলনীতি অনুযায়ী লোকসানটা সনদপত্র প্রাপ্তদের ওপর অর্পিত হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু লোকসান কাটিয়ে ওঠতে এবং পুঁজিদাতাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে জর্ডান নীতিতে এ

কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, লোকসান হওয়া অবস্থায় পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরকে সনদপত্রে উল্লিখিত মূল্য আদায়ে রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে।

৭. লোকসানের সময় রাষ্ট্র কর্তৃক সনদপত্র প্রাপকগণকে যে পুঁজি দেওয়া হবে তা সনদপত্র প্রদানকারী কোম্পানির দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে সনদ রহিতকরণের সময় উল্লিখিত ঋণ পরিশোধ করা কোম্পানির ওপর আবশ্যক হবে।

এই হলো জর্ডান সরকার কর্তৃক জারিকৃত মুদারাবা সার্টিফিকেটের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও নমুনা। যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি ত্রুটি নজরে আসে। যেগুলো নিচে নাম্বার দিয়ে তুলে ধরা হলো—

১. মুদারাবা বা মুকারাজা-এর বাস্তবতা হলো, দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের জন্য পুঁজি বা লাভের জিম্মাদার হতে পারবে না। কারণ, তাতে যে মুনাফা অর্জন হয়, তা মূলত ব্যবসায়িক মুনাফা। সুদি লাভ নয়। আর শরিয়ত-সম্মত ব্যাবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার মালিক তখনই হতে পারে যখন লোকসান হলে তার দায়-দায়িত্বও নির্দ্বিধায় মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং যদি মুদারিব পুঁজির দায়-দায়িত্ব নিয়ে নেয়, তাহলে তা আর মুদারাবা চুক্তি থাকে না। যেহেতু জর্ডান সরকার কর্তৃক প্রণীত মুদারাবার সার্টিফিকেট-এর মধ্যেও ফেস ভ্যালু পরিমান মূল্যের জামানত নেওয়া হয়ে থাকে। তাই এই শর্ত ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী মুদারাবার নীতির পরিপন্থি। যদি প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি এই মূল্যের জামানত নিয়েছে; সে বাস্তবে সনদ প্রদানকারী অথবা কারবারকারী কোম্পানি (মুদারিব. নয়। বরং সরকার তৃতীয় পক্ষ হিসেবে জামানত নিয়েছে। আর শরিয়ত তৃতীয় পক্ষের পক্ষ থেকে লোকসানের জামানত নেওয়া চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য কোনো প্রতিবন্ধক নয়। প্রতিবন্ধক তখন হয় যখন দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের জিম্মাদারি নেয়।

কিন্তু এই কথা এই দৃষ্টিকোন থেকে অগ্রহণযোগ্য যে, এর মধ্যে রাষ্ট্র ফেস ভ্যালুর এমন জিম্মাদারি নেয়নি যে, সে কোনো ধরনের বিনিময় নেওয়া ছাড়াই স্বেচ্ছায় নিজের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবে এবং পরিবর্তীতে কখনোই সেই টাকা কোম্পানির কাছে দাবি করবে না। বরং রাষ্ট্র এখানে সার্টিফিকেট ইস্যুকারী কোম্পানির এজেন্ট ও প্রতিনিধি হিসেবে ওই

লোকসানের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। এর দলিল হলো : রাষ্ট্র যেই পুঁজি সরবরাহ করছে সেটি ওই কোম্পানির দায়িত্বে ঋণ হয়ে যাচ্ছে, আর কোম্পানির ওপর এটি আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে যে, যখন সে সব সার্টিফিকেটের রহিতকরণের কাজ সম্পাদন করবে তখন সেই সার্টিফিকেটের ফেস ভ্যালু রাষ্ট্রকে ফেরত দেবে। এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা বাকি থাকবে যে, কোম্পানি রাষ্ট্রকে ওই ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত জিম্মাদার রাষ্ট্র নয় বরং সার্টিফিকেট ইস্যুকারী কোম্পানিকেই (মুদারিব) মনে করা হবে।

২. আর যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, সরকার শুধু সহযোগিতা-স্বরূপ এই জামানতের দায়িত্ব নিয়েছে এবং কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেবে। আর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদায়কৃত অর্থ কোম্পানির জিম্মায় ঋণ হিসেবে থাকবে না। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র যদিও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা রাখছে, তথাপি এটি ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের আরেকটি মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আর তা এই যে, ইসলামি ফিকহের একটি মূলনীতি হলো, كفيل তথা 'দায়িত্বশীল'-এর দায়িত্ব এমন সব বিষয়ে বৈধ, যেসব বিষয়ে মূল ব্যক্তির দায়িত্ব আদায় করা আবশ্যক। যেমন : ঋণ কিংবা ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য বা অন্য কোনো অপরিহার্য বিষয়ের ক্ষেত্রে জামানত বৈধ। তবে যদি সেটি মূল ব্যক্তির দায়িত্বে আদায় করা আবশ্যক না হয়, তাহলে তার দায়িত্ব গ্রহণও বৈধ নয়। যেমন আমানতের সম্পদ যার কাছে আমানত রাখা হয়, তার কোনো অবহেলা ছাড়া সেই পণ্যটি নষ্ট হয়ে গেলে আমানতদারের ওপর তা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

এমনিভাবে শিরকাত এবং মুদারাবার অর্থ যদি কোনো অংশীদার বা কোনো মুদারিব-এর হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ সেই অংশীদার কিংবা মুদারিব-এর ওপর আবশ্যক নয়। কারণ, তা আদায় করা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ জাতীয় সম্পদের জামানত নেওয়াও সহিহ নয়। এই মূলনীতি সমস্ত ফিকহের কিতাবে প্রসিদ্ধ। তাতে কারও কোনো মতবিরোধ নেই। আল্লামা মারগিনানি রহ. বলেন—

والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، لكن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب، لا بما كان مضمونا بغيره

كالمبيع والمرهون، ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة.

'যে সব জিনিসের জামানত নেওয়া যায় সেগুলোর জামানত নেওয়া যদিও আমাদের কাছে সহিহ, কিন্তু ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর কাছে সহিহ নয়। আমাদের কাছেও প্রত্যেক জিনিসের জামানত নেওয়া বৈধ নয়; বরং এতে মূলনীতি হলো, যেসব বস্তু সত্তাগতভাবে আদায় করা অপরিহার্য সেসব ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও জামানত সহিহ আছে। যেমন : ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়-এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্য কিংবা দরদামের সময় হাতে নেওয়া সম্পদ অথবা ছিনতাইকৃত পণ্য। তবে যেসব বস্তু সত্তাগতভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয় (বরং তার মূল্য আদায় করা ওয়াজিব)। যেমন : বিক্রিত পণ্য ও বন্ধকি পণ্য যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে হুবহু সেই পণ্যই ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক নয়। অনুরূপভাবে আমানতের সম্পদ, যেমন : কারও গচ্ছিত রাখা সম্পদ ধার নেওয়া, ধার নেওয়া বস্তু বা ভাড়া নেওয়া বস্তু বা মুদারাবা ও অংশীদারিত্বের পুঁজি।'[১৩০]এগুলোর হুকুম হলো, এসব সম্পদের জামানত নেওয়া সহিহ নয়।'

ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অনুসারী খতিব আল্লামা শিরবিনি রহ. বলেন—

يَصِحُّ ضَمَانُ رَدِّ كُلِّ عَيْنٍ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ كَمَغْصُوبَةٍ وَمُسْتَعَارَةٍ وَمُسْتَامَةٍ وَمَبِيعٍ لَمْ يُقْبَضْ ، (إلى قوله) أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْمَالِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا التَّخْلِيَةُ دُونَ الرَّدِّ.

'প্রত্যেক এমন পণ্যের জামানত নেওয়া বৈধ, যা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। যেমন ছিনতাইকৃত পণ্য, ধার নেওয়া সম্পদ অথবা এমন বিক্রিত পণ্য যার নিয়ন্ত্রণ এখনো প্রতিষ্ঠা হয়নি। হাঁ তবে এমন পণ্য যার আদায় অপরিহার্য নয়, যেমন দানের পণ্য, অংশীদারের পুঁজি, উকিল কিংবা ওসিয়তকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন পণ্য—এগুলোর জামানত নেওয়া সহিহ নয়। কারণ, এ জাতীয় সম্পদ ক্ষতিপূরণযোগ্য সম্পদ নয়। তাই

[১৩০] হেদায়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৩।

এগুলোতে শুধু হস্তগত করার সুযোগ দিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। ফেরত দেওয়া জরুরি নয়।'[১৩১]

আল্লামা ইবনু কুদামাহ হাম্বালি রহ. বলেন—

وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ، كَالْمَغْصُوبِ وَالْعَارِيَّةِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، (إلى قوله) فَأَمَّا الْأَمَانَاتُ، كَالْوَدِيعَةِ، وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، (إلى قوله) فَهَذِهِ إِنْ ضَمِنَهَا مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ فِيهَا، لَمْ يَصِحَّ ضَمَانُهَا.

'ক্ষতিপূরণযোগ্য পণ্যের জামানত বৈধ। যেমন, ছিনতাইকৃত সম্পদ এবং ধার নেওয়া সম্পদ। এই অভিমত পোষণ করেন ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী। তবে আমানতসমূহ যেমন, আমানত রাখা সম্পদ, ভাড়া দেওয়া সম্পদ, অংশীদারিত্ব ও মুদারাবার সম্পদ। যদি সীমালঙ্ঘনের শর্ত ছাড়া কোনো ব্যক্তি এ জাতীয় সম্পদের জামানত নেয়, তাহলে তার জামানত সহিহ হবে না।'

কারণ, যে ব্যক্তির অধীনে এ জাতীয় সম্পদ আছে তার জিম্মায়ই তা ক্ষতিপূরণযোগ্য নয়, তাহলে জামানতকারীর ওপর কিভাবে ক্ষতিপূরণযোগ্য হবে। তবে যদি কেউ সীমালঙ্ঘনের শর্তে কোনো জামিন হয়, তাহলে ইমাম আহমাদ রহ.-এর বাহ্যিক কথা দ্বারা পরিষ্কার হয় যে, তার কাছে এই জামানত সহিহ আছে।'

হাম্বালি মাজহাবের كشاف القناع عن متن الإقناع গ্রন্থে আছে—

(وَتَصِحُّ) الْكَفَالَةُ (بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُهَا. (وَلَا تَصِحُّ) الْكَفَالَةُ (بِالْأَمَانَاتِ) كَالْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ (إلَّا) إنْ كَفَلَهُ (بِشَرْطِ التَّعَدِّي).

'ক্ষতিপূরণযোগ্য পণ্যের জামানত সহিহ। যেমন : ছিনতাইকৃত পণ্য, ধার নেওয়া সম্পদ। কারণ, এ জাতীয় সম্পদ আদায় ওয়াজিব-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে আমানতের পণ্যের জামানত নেওয়া সহিহ নয়। যেমন : আমানত রাখা সম্পদ, ধার, শিরকাত ও মুদারাবার সম্পদ। তবে যদি কেউ সীমালংঘনের শর্তে দায়িত্ব নেয়, তাহলে তা সহিহ আছে।'[১৩২]

---

[১৩১] মুগনিল মোহতাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০২।

[১৩২] কাশশাফুল কিনা আন মাতনিল ইকনা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৫৪।

আল্লামা ইবনু হুমাম রহ. বলেন—

وَضَمَانُ الْخُسْرَانِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَضْمُونٍ وَالْخُسْرَانُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى أَحَدٍ، حَتَّى لَوْ قَالَ بَائِعٌ فِي السُّوقِ عَلَى أَنَّ كُلَّ خُسْرَانٍ يَلْحَقُكَ فَعَلَيَّ أَوْ قَالَ لِمُشْتَرِي الْعَبْدِ إِنْ أَبَقَ عَبْدُكَ هَذَا فَعَلَيَّ لَا يَصِحُّ

'লোকসানের জামানত নেওয়া সহিহ নয়। কারণ, জামানত এমন জিনিসের হয়ে থাকে যা নিজেই জামানত যোগ্য। আর লোকসান কারও ওপর জামানতযোগ্য নয়। যেমন : কোনো বিক্রেতা যদি বাজারে এ কথা বলে দেয় যে, যদি তোমার কোনো লোকসান হয়, তাহলে তা আমার জিম্মায়। অথবা গোলামের ক্রেতাকে বলে দেয় যে, যদি তোমার গোলাম পালিয়ে যায়, তাহলে তা আমার জিম্মায়। এ উভয় জামানত সহিহ নয়।'[১৩৩]

কিন্তু যা জামানতযোগ্য নয় এমন বস্তুর জামানত নেওয়া সহিহ না হওয়ার অর্থ হলো, সে যে সম্পদের দায়িত্ব নিয়েছে, সেই সম্পদের দায়িত্ব নেওয়া আইনগতভাবে তার ওপর আবশ্যক নয়। তাই যে ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে আদালতের মাধ্যমে তার জন্য ওই টাকা তলব করার অধিকার নেই। তবে তৃতীয় পক্ষের জন্য নিজের ওপর ওই সম্পদ আদায়ের আবশ্যকতাকে একটি অঙ্গীকার মনে করা হবে। যাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য মানা যেতে পারে, তবে আইনগতভাবে নয়। এখন যদি তৃতীয় পক্ষ ওই ওয়াদা অনুযায়ী অর্থ আদায় করে দেয়, তাহলে তা ওই সনদ বাহকের জন্যে নেওয়া বৈধ হবে। তবে বিচারক তৃতীয় পক্ষকে তা আদায়ে বাধ্য করতে পারবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মালিকি মাজহাব অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের ওয়াদাকে উপরিউক্ত অবস্থায় আইনগতভাবে অপরিহার্য করার সুযোগ আছে কি না? আমি এ ব্যাপারে সংশয়ে আছি। কারণ, আমরা যদি ওই ওয়াদাকে অপরিহার্য মনে করি, তাহলে এমতাবস্থায় জামানত আবশ্যক হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে শিরকাত ও মুদারাবার মূলধনের জামানত বা কাফালত নাজায়েজ হওয়ার কোনো অর্থ থাকে না।

---

[১৩৩] ফতহুল কাদির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩২৩।

৩. সনদপত্র রহিত করার মাসআলা

জর্ডানি সনদপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত তৃতীয় মাসআলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তাযোগ্য। আর সেই জিজ্ঞাসাটি হলো, এ জাতীয় সনদপত্র ফেস ভ্যালুর ওপর রহিত করা যায় কি-না? তাতে প্রশ্ন জাগে যে, যদি ফেস ভ্যালুর ওপর রহিত করা হয়, তাহলে এ অবস্থায় তা মুদারাবা-এর হাকিকত থেকে বের হয়ে ঋণের পর্যায়ে চলে যাবে।

এই সূক্ষ্ম বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য জরুরি হলো, প্রথমেই সনদপত্র রহিত করার ক্ষেত্রে ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি জানা। সনদপত্র রহিত করার উদ্দেশ্য হলো, পুঁজি বিনিয়োগকারীর পক্ষ থেকে মুদারাবার সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়া। আর এই ফিরিয়ে নেওয়া তখনই সহজ যখন মুদারাবার সম্পদ নগদ বিদ্যমান থাকে। তবে যদি মুদারাবার সম্পদ পণ্যে রুপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে পণ্যের প্রকৃত মালিক পুঁজি বিনিয়োগকারীর জন্য (رب المال) ওই পণ্যকে মুদারিব কারবারীর কাছে বিক্রয় করে দেওয়া। কারণ, মুদারাবার মাঝে মুদারিবের শুধু পুঁজি ব্যয়ের অধিকার অর্জিত হয়। এতে তার বিলকুল মালিকানা নেই। সুতরাং কারবারে যদি লাভ হয়, তাহলে মুদারিব শ্রম দেওয়ার কারণে লাভ পেয়ে যাবে। তবে লোকসান হলে তার ওপর কোনো দায় দায়িত্ব আসবে না। ব্যাবসায় পুঁজি খাটানো অবস্থায় কেউ যদি এই মাসআলার আলোকে সনদপত্র রহিত করতে কোম্পানির কাছে আসে, তাহলে বুঝতে হবে সে কারবারে খাটানো বিস্তৃত অংশ (অবন্টিত অংশ) কোম্পানির কাছে বিক্রয় করতে চাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত মাসআলাগুলো চিন্তাযোগ্য।

১. পুঁজি বিনিয়োগকারী (রববুল মাল) নিজের মুদারাবার মালকে অর্থের আকৃতিতে না থাকা অবস্থায় ফেরত নিতে পারবে কি না?
২. মুদারাবা চুক্তিতে সনদপত্র ফিরিয়ে নেওয়া বা রহিত করার উল্লিখিত শর্ত জায়েজ আছে কি না?
৩. যদি সনদপত্র রহিত করা জায়েজ হয়, তাহলে পুঁজিদাতা সেই সার্টিফিকেটের লিখিত মূল্য পাবে না বাজার মূল্য পাবে?

প্রথম মাসআলা এবং তার জবাব

সর্বপ্রথম আমরা এই মাসআলার নিরীক্ষণ করবো যে, মুদারাবার মূলধন এমন সময়ে ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে করা, যখন তা নগদ অর্থের আকৃতিতে না হয়।

একে ফিকহি পরিভাষায় মুদারাবার চুক্তি ভঙ করা কিংবা মুদারিবকে মুদারাবার চুক্তি থেকে বরখাস্ত বলা হয়।

এ জন্যই ফুকাহায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, মুদারাবাকে ভঙ করার সময় মুদারিব-এর জন্য ওয়াজিব হলো, এই মুদারাবার সম্পদের আসবাবপত্রগুলো বিক্রয় করে নগদ অর্থের আকৃতিতে নিয়ে আসা। যেমনটি দুররুল মুখতারে বর্ণিত হয়েছে—

وينعزل (اى المضارب) بعزله (اى رب المال) فان علم بالعزل والمال عروض باعها.

'মুদারিব পুঁজি বিনিয়োগকারীর (রববুল মাল) বরখাস্ত করার দ্বারা বরখাস্ত হয়ে যায়। কাজেই যদি মুদারিব-এর কাছে বরখাস্তের সংবাদ পৌঁছে আর ওই সময় মূলপুঁজি পণ্যের আকৃতিতে থাকে, তাহলে মুদারিব তা বিক্রয় করে দেবে।'[১৩৪]

আল-মুগনি লি ইবনু কুদামাতে বর্ণিত আছে—

وَالْمُضَارَبَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ، تَنْفَسِخُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا.... وَإِنْ انْفَسَخَتْ وَالْمَالُ عَرْضٌ، فَاتَّفَقَا عَلَى بَيْعِهِ أَوْ قَسَمَهُ، جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، لَا يَعْدُوهُمَا..... وَإِنْ طَلَبَ رَبُّ الْمَالِ الْبَيْعَ، وَأَبَى الْعَامِلُ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُجْبَرُ الْعَامِلُ عَلَى الْبَيْعِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْمَالِ نَاضًّا كَمَا أَخَذَهُ. وَالثَّانِي، لَا يُجْبَرُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الرِّبْحِ.

'মুদারাবা চুক্তি, বৈধ চুক্তির মধ্য থেকে একটি চুক্তি। কোনো একজন রহিত করার দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আর যদি মুদারাবা এমন সময় রহিত হয়ে যায় যে সময় মূলপুঁজি পণ্যের আকৃতিতে থাকে এবং মুদারিব ও পুঁজিবিনিয়োগকারী তা বিক্রয় করতে চায় বা বণ্টন করতে একমত হয়ে যায়, তাহলে এমন করা জায়েজ। কেননা তাদের এটি করার অধিকার আছে। আর যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী বিক্রয় কামনা করে এবং মুদারিব অস্বীকার করে, তাহলে তা দুভাবে জায়েজ হবে। প্রথমটি হলো, মুদারিবকে বিক্রয়ের জন্য বাধ্য করা হবে, যাতে সে তা বিক্রয় করে

[১৩৪] দুররুল মুখতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬৫৬।

পুঁজিকে নগদ অর্থে রূপান্তর করে নেয়। এটি হলো ইমাম শাফিয়ি রহ. এর মাজহাব। কেননা মুদারিব-এর ওপর আবশ্যক হলো, যেভাবে সে পুঁজি নিয়েছিলো সেই অবস্থায় পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়টি হলো, যদি এ মালের মাঝে কোনো লাভ না হয় অথবা মুদারিব এই মুনাফা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে, তাহলে মুদারিবকে ব্যাবসার ওই মাল নগদ অর্থে রূপান্তর করতে বাধ্য করা যাবে না। বরং পুঁজিবিনিয়োগকারী (রববুল মাল) ওই মাল সে অবস্থায়ই ফেরত নিয়ে নেবে।'

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুদারাবার মাল ফিরিয়ে নিতে শরিয়তের কোনো বিধি নিষেধ নেই। এমতাবস্থায় যদি মাল নগদ অর্থে না থাকে, তাহলে তা বিক্রয় করে নগদ অর্থে রূপান্তর করে নেবে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, মুদারাবার মাল যেমনিভাবে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রয় করা জায়েজ তেমনিভাবে মুদারিব-এর কাছে বিক্রয় করাও জায়েজ। যেমন : মুদারিব যদি ওই মাল ক্রয় করতে চায়, তাহলে কাঙ্ক্ষিত মূল্য মুদারাবার পণ্যের মূল পুঁজির সঙ্গে একত্রিত করে নেবে। তারপর পুঁজিবিনিয়োগকারী নিজ মূলধন মুনাফার সঙ্গে আদায় করে নেবে; আর মুদারিব শুধু নিজ অংশের মুনাফা আদায় করবে।

দ্বিতীয় মাসআলা

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, মুদারাবা চুক্তিতে বেচাকেনার মাধ্যমে পুঁজি ফিরিয়ে নেওয়ার শর্তারোপ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? এই প্রশ্নের জবাব হলো, বাহ্যত এতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কারণ, এই শর্তটি মুদারাবা চুক্তির পরিপন্থি নয়। কারণ, পুঁজিবিনিয়োগকারীর (রববুল মালের) অধিকার আছে যখনই সে ইচ্ছা করবে মুদারাবা চুক্তিকে ভঙ করে দিতে পারবে। তখন মুদারিব-এর ওপর আবশ্যক হলো, যদি পুঁজি নগদ অর্থে না থাকে, তাহলে তা বিক্রয় করে নগদ অর্থে রূপান্তর করে নেওয়া। কারণ, মুদারাবা চুক্তিতে এই জাতীয় সম্পদে বিক্রয়ের শর্তারোপ করা চুক্তির চাহিদা বিরোধী নয়। উল্লেখ্য যে, তাতে এই শর্ত জুড়ে দেওয়া যে, ক্রয়-বিক্রয় শুধু মুদারিবের কাছেই হতে হবে তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে বিক্রয় করা যাবে না। বাহ্যত তাতে ও কোনো শরয়ি প্রতিবন্ধকতা নেই। কারণ, অনেক ফিকহশাস্ত্রবিদগণের কাছে পুঁজিপতি এবং মুদারিবের মাঝে মুদারাবার সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লামা কাসানি রহ. বলেন—

وَيَجُوزُ شِرَاءُ رَبِّ الْمَالِ مِنَ الْمُضَارِبِ، وَشِرَاءُ الْمُضَارِبِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللهُ : لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ بَيْنَهُمَا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ. (وَجْهُ) قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ هَذَا بَيْعُ مَالِهِ بِمَالِهِ، وَشِرَاءُ مَالِهِ بِمَالِهِ إِذِ الْمَالَانِ جَمِيعًا لِرَبِّ الْمَالِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ كَالْوَكِيلِ مَعَ الْمُوَكِّلِ. (وَلَنَا) أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِلْكَ رَقَبَةٍ لَا مِلْكَ تَصَرُّفٍ، وَمِلْكُهُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ كَمِلْكِ الْأَجْنَبِيِّ، وَلِلْمُضَارِبِ فِيهِ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لَا الرَّقَبَةِ، فَكَانَ فِي حَقِّ مِلْكِ الرَّقَبَةِ كَمِلْكِ الْأَجْنَبِيِّ حَتَّى لَا يَمْلِكَ رَبُّ الْمَالِ مَنْعَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ، فَكَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَالِ الْأَجْنَبِيِّ، لِذَلِكَ جَازَ الشِّرَاءُ بَيْنَهُمَا.

‘পুঁজিবিনিয়োগকারী মুদারিব থেকে মাল কিনতে পারবে এবং মুদারিবও পুঁজিবিনিয়োগকারী থেকে মাল কিনতে পারবে। যদিও সেই মুদারাবা ব্যাবসায় কোনো মুনাফা অর্জিত না হয়। এটি আমাদের তিন ইমামের মাজহাব। তবে ইমাম জুফার রহ. বলেন, এটি নিজের মালকে নিজের মালের বিনিময়ে বিক্রয় করার মতোই হলো। কারণ, উভয় মালই পুঁজিবিনিয়োগকারীর। তাই এই পদ্ধতি জায়েজ নেই। বিষয়টি এমন হলো যেন বেচাকেনার জন্য নিযুক্ত উকিল নিজের মুয়াক্কেলের সঙ্গেই ক্রয়-বিক্রয় করে নিলো। তবে আমাদের দলিল হলো, পুঁজিবিনিয়োগকারীর যদিও মুদারাবার সম্পদে প্রকৃত মালিকানা আছে; কিন্তু তাতে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার নেই। অর্থাৎ, ব্যবহার বা হস্তক্ষেপের বিবেচনায় পুঁজিবিনিয়োগকারী সম্পূর্ণ অপরিচিত। অপরদিকে মুদারিব-এর জন্য ব্যবহারের অধিকার আছে। তবে প্রকৃত মালিকানা নেই। সুতরাং মুদারিব-এর প্রকৃত মালিকানা না থাকায় সে এই মালের মাঝে অপরিচিত। এমনকি পুঁজিবিনিয়োগকারীরও এই অধিকার নেই যে, সে মুদারিবকে ওই সম্পদ ব্যবহারে বাঁধা দেবে। এ থেকে বুঝা গেল, মুদারাবার সম্পদ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক বিবেচনায় অপরিচিত। তাই উভয়ের মাঝে বেচাকেনা জায়েজ আছে।’[১৩৫]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মুদারিব-এর হাতে মুদারাবার সম্পদে

[১৩৫] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১০৮।

বিক্রয়ের শর্ত জুড়ে দেওয়া চুক্তির চাহিদা পরিপন্থি নয়। তাই এই শর্ত জুড়ে দেওয়ার মাঝে কোনো শরয়ি সমস্যা নেই।

তৃতীয় মাসআলা

তৃতীয় মাসআলা হলো, সার্টিফিকেটের রহিতকরণ লিখিত মূল্যের ওপর হবে না বাজার মূল্য অনুযায়ী হবে? আমার কাছে এর জবাব হলো, বাজার মূল্য অনুযায়ী হওয়া চাই। তারপর যদি বাজার মূল্য লিখিত মূল্যের চেয়ে বেশি হয়; তাহলে দুই মূল্যের মাঝে যে পার্থক্য হবে, তা মুদারাবা সম্পদের মুনাফা হিসেবে ধরা হবে। তাই এই মুনাফাও উভয়ের মাঝে বণ্টন করা হবে, তাদের আগেকার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি সার্টিফিকেটের লিখিত মূল্য একশত টাকা; আর রহিত করার সময় তার বাজার মূল্য হয়ে গেল একশত বিশ টাকা। এখন যদি মুদারিব তা খরিদ করতে ইচ্ছে করে, তাহলে একশত বিশ টাকা দিয়ে খরিদ করতে হবে। এখানকার বিশ টাকা মুদারাবা সম্পদের লাভ হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং মুদারাবা চুক্তিতে যদি অর্ধেক হারে উভয়ের মুনাফা নেওয়ার চুক্তি থেকে থাকে, তাহলে দশ টাকা মুদারিবের, আর দশ টাকা পুঁজিবিনিয়োগকারীর। এখন মুদারিব একশত দশ টাকা দিয়ে ওই সার্টিফিকেট পুঁজিবিনিয়োগকারী (রববুল মাল) থেকে কিনে নেবে।

এখন কথা হলো যদি ওই সার্টিফিকেটের রহিতকরণ বাজার মূল্য অনুযায়ী হতে হয়, তাহলে তার দলিল কী? তার দলিল হলো, শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে মুদারাবা সম্পদের মালিক রাববুল মাল বা পুঁজিবিনিয়োগকারী। আর মুদারাবার সম্পদে মুদারিবের অংশ শুধু মুনাফায়। এখন বাজারে যদি ওই সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই বৃদ্ধিটা মূলত মুদারাবার সম্পদে। সুতরাং মুনাফা মুদারিবকে দেওয়া হবে, তাছাড়া বাকি মুনাফা ও মূল পুঁজি রাববুল মালের হবে। তা সত্ত্বেও যদি এই শর্ত লাগানো হয় যে, ওই সার্টিফিকেট বাজার মূল্যের স্থানে লিখিত মূল্যের ওপর বিক্রয় করতে হবে, তাহলে এই শর্ত মুদারাবা চুক্তির পরিপন্থি হওয়ায় নাজায়েজ হবে। এ জন্যই ফকিহগণ এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছেন। আল্লামা কাসানি রহ. বলেন—

وَإِذَا اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ مَتَاعًا وَفِيهِ فَضْلٌ، أَوْ لَا فَضْلَ

فِيهِ، فَأَرَادَ رَبُّ الْمَالِ بَيْعَ ذَلِكَ فَأَبَى الْمُضَارِبُ، وَأَرَادَ إِمْسَاكَهُ حَتَّى يَجِدَ رِبْحًا، فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الْمَالِكِ عَنْ تَنْفِيذِ إِرَادَتِهِ فِي مِلْكِهِ لِحَقٍّ يَحْتَمِلُ الثُّبُوتَ وَالْعَدَمَ، وَهُوَ الرِّبْحُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ الْإِمْسَاكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ يُقَالُ لَهُ: ادْفَعْ إِلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ، وَحِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَيُسَلِّمُ الْمَتَاعَ إِلَيْكَ.

'মুদারিব যখন মুদারাবার অর্থের বিনিময়ে কোনো আসবাবপত্র কেনে। তারপর সেই আসবাবপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাক না পাক পুঁজিপতি (রববুল মাল) সেই আসবাবপত্র বিক্রয় করতে চায়। কিন্তু মুদারিব তা অস্বীকার করে অথবা আসবাবপত্রকে ওই সময় পর্যন্ত আটকে রাখতে চায় যতক্ষণ পর্যন্ত মুনাফা অর্জিত না হয়। তখন মুদারিবকে তা বিক্রয় করতে বাধ্য করা হবে। তবে যদি মুদারিব ওই সম্পদ রাববুল মালকে দেওয়ার ইচ্ছে করে এ জন্য যে, মালিককে তার মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা থেকে শুধু অনিশ্চিত মুনাফার ভিত্তিতে বিরত রাখা কীভাবে ঠিক হবে? তাই মুদারিবকে বলা হবে যদি তুমি এই সম্পদ রাখতে চাও, তাহলে পুঁজিবিনিয়োগকারীর অর্থ ফেরত দিয়ে দাও। আর যদি ওই পুঁজিতে মুনাফা হয়, তাহলে মুদারিবকে বলা হবে, পুঁজি ও মুনাফা থেকে তার অংশ তাকে ফিরিয়ে দাও। বিনিময়ে সে তার তামাম আসবাবপত্র তোমাকে দিয়ে দেবে।'[১৩৬]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সার্টিফিকেটের মালিক শুধু লিখিত মূল্যেরই মালিক নয়, বরং তার সঙ্গে নিজ মুনাফার অংশেরও মালিক। তাই ওই সার্টিফিকেটকে শুধু মূল পুঁজির ফেস ভ্যালুর ভিত্তিতে রহিত করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এ জন্য জরুরি হলো, তার বেচাকেনা বাজার দর অনুযায়ী হওয়া। এরপর উভয়ের মাঝে আগেকার সিদ্ধান্তকৃত হারে মুনাফা বণ্টন করা হবে।

উল্লিখিত বিশদ আলোচনা-পর্যালোচনার আলোকে ওই সার্টিফিকেট রহিতকরণের সময় তার বাজার মূল্য ও লিখিত মূল্যের পার্থক্যের বিবেচনায় তিনটি পদ্ধতি হতে পারে—

[১৩৬] বাদায়েউস সানায়ে। খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১০৩।

১. বাজার মূল্য ও লিখিত মূল্য উভয়টি সমান সমান। এই পদ্ধতিতে কোনো জটিলতা নেই। কারণ, রহিতকরণ উভয় মূল্যের বিবেচনায় হতে পারে।

২. বাজার মূল্য লিখিত মূল্যের চেয়ে কম। তখন রহিতকরণ বাজার মূল্য অনুযায়ী হবে। আর লোকসানটি ধরা হবে সার্টিফিকেট হোল্ডারের।

৩. বাজার মূল্য লিখিত মূল্য অপেক্ষা বেশি। এ অবস্থায় জরুরি হলো, সার্টিফিকেটের রহিতকরণ বাজার মূল্য থেকে এই পরিমাণ বাদ দেওয়ার পর হবে, যতটুকু অর্থ কোম্পানির মুনাফা হিসেবে এসেছে। যেমন : যদি কোম্পানি ও সার্টিফিকেট হোল্ডারের মাঝে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, মুনাফা অর্ধেক অর্ধেক হারে বণ্টিত হবে। সে ক্ষেত্রে যদি সার্টিফিকেটের লিখিত মূল্য একশত টাকা হয়। আর রহিত করার সময় তার বাজার মূল্য একশত বিশ টাকা হয়। তখন রহিতকরণটা একশত দশ টাকার ওপর হবে। কারণ, অবশিষ্ট দশ টাকা কোম্পানির মুনাফা হওয়ার ভিত্তিতে বাদ দেওয়া হবে।

তৃতীয়ত : শেষ প্রশ্ন

ওইসব সার্টিফিকেটের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, সার্টিফিকেটের নির্দিষ্ট সংখ্যা রহিতকরণের কাজ কি একই সময় হবে, না প্রত্যেক সার্টিফিকেটের অংশবিশেষের রহিতকরণ একই সময় হবে? দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রত্যেক সার্টিফিকেটের মুনাফা মূল্য কম হওয়ার কারণে কম হয়ে যাবে? নাকি রহিতকরণ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ সার্টিফিকেটের মুনাফা পুরোটাই থেকে যাবে?

আমার কাছে এই প্রশ্নের জবাব হলো, রহিতকরণের এই উভয় পদ্ধতি অবলম্বনে শরয়ি কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কারণ, এ কথা প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, সার্টিফিকেট রহিত করার অর্থ হলো, মুদারাবার মূল পুঁজি মুদারিব-এর কাছে বিক্রয় করা। আর এই বেচাকেনা যেমনিভাবে সমুদয় পুঁজির মধ্যে সহিহ হবে, তেমনিভাবে তার কিছু অংশের মাঝেও সহিহ হবে। অবশ্য যখন বিনিয়োগকারী নিজের অর্ধেক সম্পদ মুদারিব-এর কাছে বিক্রয় করে দেবে, তখন অবশিষ্ট অর্ধেকের মাঝে মুদারাবা চুক্তি আগের অবস্থার ওপর স্থির থাকবে এবং এই সামগ্রিক সম্পদ উভয়ের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী কার্যক্রমে স্থিতি লাভ করেবে। যেন মুদারিবের পুঁজিবিনিয়োগকারী থেকে ওই অংশ ক্রয়ের পর সমুদয় পুঁজির উপর শিরকাতে ইনান (শিরকাতের বিশেষ একটি প্রকার)

অস্তিত্বে চলে আসবে এবং মুদারিব ওই কারবারে নিজের কেনা অংশের কারণে অবশিষ্ট সম্পদে মুদারাবার সঙ্গে সঙ্গে শরিকও হয়ে যাবে। তারপর সেই পুরো সম্পদে যে মুনাফা অর্জন হবে, এর অর্ধেক মুদারিব অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আদায় করবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক পুঁজিপতি ও মুদারিব-এর মাঝে আগের চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে। উদাহরণ-স্বরূপ : জায়েদ খালেদেকে এক লাখ টাকা মুদারাবার ভিত্তিতে অর্ধেক মুনাফার শর্তে প্রদান করল। খালেদ এই পুঁজি দিয়ে কারবারের জন্য আসবাবপত্র খরিদ করল। এখন এই পুরো সম্পদ জায়েদের মালিকানায় মনে করা হবে। তারপর খালেদ ওই আসবাবপত্রের অর্ধেক অংশ কিনলো এবং সম্পদকে আগের কারবার থেকে পৃথক না করে বরং জায়েদের সন্তুষ্টিক্রমে তাতে কারবার জারি রাখলো। এ অবস্থা এ কথার দাবি করে যে, উভয় ব্যক্তি এখন অর্ধেক অংশে পরস্পরে ক্রয়-বিক্রয় করার পর অংশীদার হয়ে গেল। অর্ধেকের মালিক খালেদ আর অর্ধেকের মালিক জায়েদ। আর জায়েদের অবশিষ্ট অর্ধেক অংশের মাঝে আগের মুদারাবা-এর শর্ত চালু থাকবে। আর খালেদ ওই সামষ্টিক সম্পদের অর্ধেকের তো মালিক হয়ে যাবে তবে বাকি অর্ধেকের মধ্যে সে জায়েদের মুদারিব থাকবে।

এরপর যদি সামগ্রিক পুঁজির মাঝে ধরে নেওয়া যাক ৫০ হাজার টাকা মুনাফা অর্জিত হলো, তাহলে এর মাঝে ২৫ হাজার টাকা খালেদ পাবে শরিক হওয়ার ভিত্তিতে। আর অবশিষ্ট ২৫ হাজার টাকা মুদারাবার মুনাফা। উদাহরণ-স্বরূপ : জায়েদ ও খালেদ পরস্পরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্ধেক অর্ধেক হারে নিয়ে যাবে। সুতরাং পুঁজিপতি হিসেবে জায়েদ পাবে সাড়ে ১২ হাজার। আর মুদারিব হিসেবে খালেদ পাবে সাড়ে ১২ হাজার। উভয়ের মাঝে মুনাফার বণ্টন নিচের ব্যাখ্যা অনুযায়ী হবে।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে খালেদ মোট মুনাফার ২৫ হাজার টাকা পাবে এবং মুদারিব হিসেবে বাকি মুনাফার সাড়ে ১২ হাজার টাকা পাবে। খালেদের উভয় অংশের সমষ্টি হচ্ছে ৩৭ হাজার ৫ শত টাকা। পুঁজিপতি হিসেবে জায়েদ পাবে সাড়ে ১২ হাজার টাকা। মোট মুনাফা ৫০ হাজার টাকা।

এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যখন পুঁজিপতি মুদারাবার সম্পদ থেকে কোনো অংশ মুদারিব-এর কাছে বিক্রয় করে দেয়—আর যদি ওই অংশে মুনাফা হয়—তখন তা মুদারিবের দিকে এ জন্যই ফিরবে যে, সে নিজের অংশের কারণে ব্যাবসায় অংশীদার হয়েছে। সুতরাং সামগ্রিক মুনাফায় পুঁজিপতির মুনাফা কম

হয়ে যাবে। আর মুদারিব-এর মুনাফা বেড়ে যাবে। যেহেতু এই সার্টিফিকেটের রহিতকরণ বাস্তবে ওই সম্পদের বিক্রয় যা এই সার্টিফিকেটের বিপরীতে রয়েছে। অতএব, রহিত করার পর যদি এই অংশে মুনাফা হয়, তাহলে মুনাফার ওই অংশ সার্টিফিকেট প্রচলনকারী কোম্পানির (মুদারিবের) দিকে ফিরবে।

এজন্য এই অংশের সীমা পর্যন্ত সার্টিফিকেট হোল্ডারের মুনাফা বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে। আর এই মুনাফা কম হওয়াটা পূর্ণ সার্টিফিকেট রহিত করার অপেক্ষাও করবে না। (বরং সঙ্গে সঙ্গেই কমে যাবে।)

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি সার্টিফিকেটের লিখিত মূল্য একশত টাকা হয়, আর সার্টিফিকেট হোল্ডার তার অর্ধেক রহিত করার জন্য হাজির হয় এবং এর ওপর কোম্পানিও রাজি থাকে, তাহলে সার্টিফিকেট হোল্ডারের মুনাফা তাৎক্ষণিকভাবে ৫০ শতাংশ কমে যাবে। অতএব এ কথা বলা সহিহ নয় যে, তার পুরো মুনাফা সার্টিফিকেট পরিপূর্ণভাবে রহিত হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এই হলো শরিয়ত-সম্মত উপায়ে উভয় পন্থার আলোচনা। এখন যদি বাস্তব প্রেক্ষাপট যাচাই করা হয়, তাহলে বোঝা যায়, প্রথম পন্থায় আমল করা অধিকতর সহজ। অর্থাৎ, সব সার্টিফিকেটের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমান সংখ্যার পূর্ণ রহিতকরণ একই সময়ে হয়ে যাবে, যাতে কার্যত মুনাফার হিসাব করা সহজ হয়। হতে পারে এই পদ্ধতিটি এজন্যও সমীচীন যে, ওই সব সার্টিফিকেটের লিখিত মূল্য এত অল্প যে, বাহ্যত তা ভাংতি করারও প্রয়োজন হয় না। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

জিহাদ আক্রমণাত্মক নাকি প্রতিরক্ষামূলক?

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

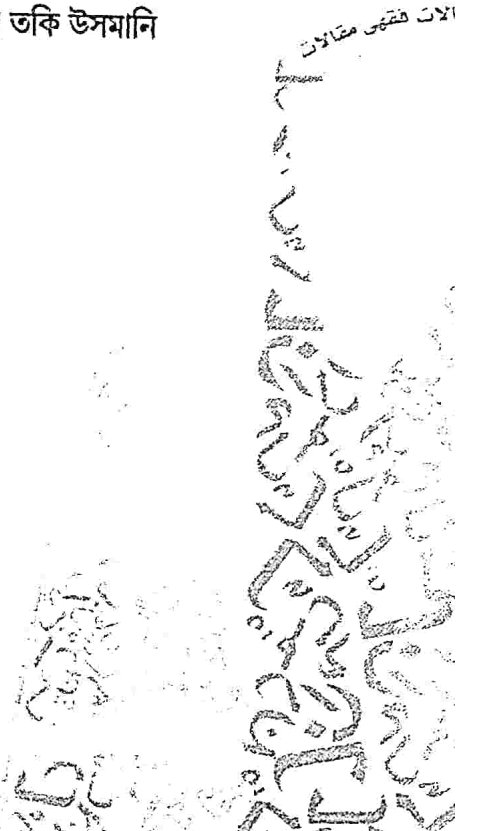

'জিহাদ আক্রমণাত্মক নাকি প্রতিরক্ষামূলক?' এ প্রবন্ধটি এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) রচনা করেন। পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি মাসিক আল-বালাগ পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।

—— আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

ইসলামে জিহাদ আক্রমণাত্মক না প্রতিরক্ষামূলক?

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

মুহতারাম জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ তকি উসমানি সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আপনার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা আল-বালাগ পড়ার সুযোগ অধমের হয়েছে। ১৩৯১ হিজরির মুহাররম (১৯৭১ এর মার্চ)-এর সংখ্যার ১০ নাম্বার পৃষ্ঠায় ১৭ ও ১৮ ধারায় এই ভাষ্য পেলাম—

'১৭' 'অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মাঝে যেসব রাষ্ট্র ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু নয়, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যাবে।'

'১৮' 'অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যে সব চুক্তি করা হয়; তা যদি শরিয়ত-সম্মত হয়, তাহলে সেগুলোর অনুসরণ করা যাবে। অন্যথায় কৃত চুক্তি ভঙের ঘোষণা দিয়ে দেবে।

এ ধারাগুলো থেকে বুঝা যায়—অমুসলিম রাষ্ট্র যদি শত্রুতার মানসিকতা না রাখে এবং উভয়ের মাঝে উদারনীতি বিদ্যমান থাকে, তাহলে ইসলামি রাষ্ট্র থাকাসত্ত্বেও অমুসলিমদেরকে তাদের স্বধর্মের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, মুসলিমদের পূর্ণ শক্তি থাকাসত্ত্বেও সেখানে ইসলামি হুকুমত

বাস্তবায়ন ও আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করবে না। যদিও আমি অধমের মতে সেখানেও দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ চালিয়ে যাবে। যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুতাভাবাপন্ন হওয়ার জন্যে যথেষ্ট মনে করা হবে।

মোটকথা! এ উভয় ধারার সঙ্গে অধম সম্পূর্ণ একমত। কারণ, অধমের অভিমত হলো, মুসলিমদের আসল কাজ হলো, পুরো পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগ করা। কর্তৃত্ব অর্জন করা ও কাফেরদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে সর্বত্র ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। (যা মাওলানা মওদুদি সাহেবের অভিমত।) অবশ্য শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব বিশিষ্ট অমুসলিম রাষ্ট্রের এবং তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য, নিজেদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে কর্তৃত্ব অর্জনের (আক্রমণাত্মক জিহাদ-এর মাধ্যমে) চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু মাসিক আল-বালাগ-এর ১৩৯১ হিজরির রবিউস সানি (১৯৭১ এর জুন) সংখ্যায় مختصر سيرت نبوية রচিয়তা মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেব লাখনোবি রহ. এ বিষয়ে আলোচনার ধারাবাহিকতায় ৭১ তম পৃষ্ঠায় লেখেন—

'জিহাদের বিধান প্রবর্তন কেবল জুলুম ও নিপীড়ন দূরীভূত করার জন্য। অন্য শব্দে জিহাদ হলো, নিজেদের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের জিহাদসমূহকে প্রতিরোধমূলক এবং আত্মরক্ষামূলক থেকে মুক্ত মনে করা কেবল ধর্মহীনতাই নয়, বরং পরিষ্কার অজ্ঞতা।'

উল্লিখিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি টেনে আপনি লিখেছেন -এ সকল কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, 'শুধু প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ জায়েজ। অথচ জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, যার সারমর্ম হলো, ইসলামকে বিজয়ী করা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তিকে মিটিয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আক্রমণাত্মক জিহাদ শুধু জায়েজই নয়, বরং সময় সাপেক্ষে তা ওয়াজিব এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া পুরো ইসলামি ইতিহাস এ জাতীয় জিহাদের ঘটনাবলিতে ভরপুর।

অমুসলিমদের খামাখা আপত্তিতে প্রভাবিত হয়ে শুধু শুধু বাস্তবতাকে অস্বীকার করা অথবা এ জাতীয় ঘটনাগুলোতে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা গোঁজামিল

দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, বল প্রয়োগ করে কাউকে মুসলিম বানানো হয়নি। এমনকি ইসলাম তার অনুমতিও দেয়নি। এমন হলে তো তাদের ওপর জিজিয়ার বিধান জারি করার কোনো অর্থই হয় না। তবে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তরবারি ওঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি কুফর-শিরকের ওপর অটল থাকতে চায়, তাহলে সেটি তার ব্যাপার। তবে এ কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করা চাই যে, আল্লাহর সৃষ্ট এই দুনিয়ায় একমাত্র তারই শাসন চলবে। আর একজন মুসলিম আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা ও যারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য জিহাদ করে। আমরা এই বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে ওইসব লোকের সামনে কেন লজ্জিত হবো? যাদের পুরো ইতিহাস জবর দখল ও রক্তপাতের ইতিহাস। যারা শুধু নিজেদের কামনা-বাসনার জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি?

এই আলোচনা পর্যালোচনা সম্পর্কে আমি জনাবের খেদমতে দুটি আরজি পেশ করছি—

১. মাওলানা আবদুশ শাকুর লাখনোবি রহ. এর বক্তব্য থেকে এই মতলব বের করা যে, তাঁর দৃষ্টিতে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক জিহাদই জায়েজ। অধমের দৃষ্টিতে এটি সহিহ নয়। কারণ, তিনি এ কথাও বলেছেন যে, জিহাদের অর্থ হলো, নিজেদের স্বাধীনতাকে হেফাজত করা। যার অধীনে আক্রমণমূলক জিহাদও শামিল। যেমনটি হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. বলেন—

> 'ইসলামকে রক্ষা করা প্রতিরক্ষা ও নিজস্ব স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করার জন্যই জিহাদ। এ থেকে কেউ যেন এমনটি না বোঝে যে, নিজেদের পক্ষ থেকে জিহাদের সূচনা করা যাবে না। সূচনা করার উদ্দেশ্যও এই, প্রতিরক্ষা ও নিজস্ব স্বাধীনতার সংরক্ষণ। কারণ, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ জাতীয় কাজ করা প্রায় অসম্ভব। আর সেই প্রতিকূল অবস্থা বাধাকে প্রতিহত করার জন্যই জিহাদের বিধান। সারকথা হলো: ইসলামকে হেফাজতে বর্তমানে যে বাধা আছে এবং ভবিষ্যতে যে বাধা আসবে তাকে প্রতিহত করাই জিহাদের উদ্দেশ্য।'[১৩৭]

---

[১৩৭] মালফুজ ৪৯৭, আল ইজাফাতুল ইয়াওমিয়্যাহ, ৩য় খন্ড।

মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেব নিশ্চয়ই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক আক্রমণমূলক জিহাদ সম্পর্কে অবগত থাকবেন। তাই তিনি আক্রমণমূলক জিহাদকে নাজায়েজ বলতে পারেন না। তিনি মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল জিহাদকে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক বলে থাকেন; যা সহিহ। কারণ, এসবের উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা ও নিজস্ব স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য আরবের কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মিটিয়ে দেওয়া যাতে সেখানে সত্য দীনের বিজয় অর্জন হয়। আর যখন এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেল তখন বিদায় হজের সময় মহান আল্লাহ সুরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ করেন—আজ কাফেররা নিরাশ হয়ে গিয়েছে তোমাদের দীনের (পরাস্ত হওয়ার) ব্যাপারে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের দীনকে মিটিয়ে দেবে। অন্তরে আমারই ভয় স্থান দাও। (অর্থাৎ, আমার হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করো না।) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। (সকল বিষয়ে শক্তি দানের মাধ্যমেও; যার ফলে কাফেররা নিরাশ হবে এবং বিধিবিধান ও নিয়মনীতির মাধ্যমেও।) তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করলাম। (দীনি বিধিবিধানও পূর্ণ হয়েছে এবং দুনিয়ার শক্তি-সামর্থ্যও অর্জিত হয়েছে এবং দীনের পরিপূর্ণতার মধ্যে উভয়টি এসে গেছে।)[১৩৮]

মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেবও 'নিজস্ব স্বাধীনতা সংরক্ষণ-এর অধীনে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ও আক্রমণাত্মক জিহাদ উভয়টিকেই শামিল করেছেন। এখন যদি আমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করে দিতাম, তাহলে বেশি উত্তম হতো, যাতে পাঠক কোনো ধরনের দ্বিধা ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

২. দ্বিতীয় কথা হলো, (যা বিশেষভাবে এই দরখাস্ত লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে) আল-বালাগে প্রকাশিত আপনার বক্তব্যের ওপর পর্যালোচনা এখানে এ উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে যেন আপনি নিজের চিন্তাধারা ও উদ্দেশ্যের সত্যায়ন বা প্রত্যাখ্যান ব্যক্ত করতে পারেন। (প্রত্যাখ্যান করা অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণও পেশ করে দেবেন বলে আশা করছি) নিচের আলোচনা দ্বারা ওইসব চিন্তাধারা আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

---

[১৩৮] সুরা মায়িদা : ৩।

আপনি আক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্য বলেছেন اعلاء كلمة الله বা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা। আপনার দৃষ্টিতে এর মর্মার্থ হলো, ইসলামের বিজয় ও তার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং কুফরের প্রভাবকে পরাস্ত করা। যেন আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহরই কর্তৃত্ব চলে। এই উদ্দেশ্যকে বোঝার জন্য প্রথমে اعلاء كلمة الله এর অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা জরুরি। অধমের কাছে প্রত্যেক যৌক্তিক, সত্য ও নীতিবান কথাকেই 'কালিমাতুল্লাহ' বা কালিমাতুল হক তথা সত্যের পয়গাম বলে। সুতরাং আল্লাহর কালিমাকে প্রত্যেক যুক্তিহীন, ভ্রান্ত ও নীতিপরিপন্থি কথাবার্তার ওপর বিজয়ী করা। অর্থাৎ, মানুষের অন্তরে পরকালের ভয়, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ এবং এগুলোর মর্যাদা ও সৌন্দর্যের ইয়াকিন ও বিশ্বাস অন্তরে সৃষ্টি করার চেষ্টা অব্যাহত রাখাই হলো كلمة الحق বা كلمة الله

আর কোনো জিনিসের বিজয় এর অর্থ হলো, অধিকাংশ মানুষের অন্তরে সেই জিনিসকে বদ্ধমূল করে দেওয়া। যেমন : অজ্ঞতা বিস্তারের উদ্দেশ্য হলো, অধিকাংশ মানুষ মূর্খ থাকা। দুনিয়ার বিজয়ী হওয়ার অর্থ হলো, অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার ভালোবাসায় ডুবে থাকা। হালাল, হারামের কোনো পার্থক্য না করা। পশ্চিমা কৃষ্টিকালচার বিজয়ী হওয়ার অর্থ হলো, ব্যাপকভাবে মানুষ তাদের আদর্শ গ্রহণ করা। হানাফিয়্যাতের বিজয়লাভের অর্থ হলো, অধিকাংশ মুসলিম সৎপথপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

সুতরাং ইসলাম বিজয়ী হওয়ার অর্থ হলো, বাস্তবে অধিকাংশ মানুষ ইসলামের অনুসারী হয়ে যাওয়া। মূলত এটিই হলো ইসলাম বিজয়ী হওয়ার অর্থ। যদি كلمة الله এর অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, তাহলে إعلاء كلمة الله এর উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের এমন বিজয় যা অর্জনের একমাত্র পন্থা হলো, দাওয়াত ও তাবলিগ। সেইসঙ্গে মুবালিলগ ও মুসলিমদের যাবতীয় কাজ প্রকৃত ইসলাম অনুসারে হওয়া। এর দ্বারা অমুসলিমদের অন্তর ও মানসিকতায় পরিবর্তন আসতে পারে। শুধু শুধু তাদেরকে ইসলামি হুকুমতের প্রজা বানিয়ে রাখার দ্বারা এই উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। কারণ, এমতাবস্থায় তাদের পরাজয়ের উপলব্ধি হবে। যা দাওয়াত ও তাবলিগের মর্মবাণী কান পেতে শুনতে প্রতিবন্ধক হবে। সুতরাং আক্রমণমূলক জিহাদ দ্বারা ইসলামের দীনী বিজয় হবে না, বরং মুসলিমদের রাজনৈতিক বিজয় হবে এবং এই রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইসলামের কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম

হবে না বরং তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামের নয়। ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তিতো হলো, পুরো মুসলিম জাতি কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হয়ে যাওয়া। আর রাজনৈতিক বিজয় এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য তো সহিহ মুসলিম হওয়াও জরুরি নয়।

রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা এ উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে না যে, আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম চলবে। কারণ, অমুসলিমরা ট্যাক্স আদায় করে, ফলে দেখা যায় তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন-ব্যবস্থার পাবন্দি করে। মদ ও শূকর তাদের জন্য হারাম হয় না। ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের কোনো শাস্তি হয় না। তাদের রীতিনীতি যথাযথভাবেই চলতে থাকে। তাদের মূর্তিপূজা অবাধে চলতে থাকে। আর এটি চির সত্য যে, যদি কোনো কারণে অমুসলিম প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের অধিকাংশ ইমান গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের এই রাজনৈতিক বিজয় শুধুমাত্র ওই সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি হুকুমত শক্তিশালী থাকে। যখনই ইসলামি হুকুমত দুর্বল হয়ে যাবে তখন অমুসলিম প্রজারা বিদ্রোহ শুরু করে দেবে এবং অতীত ইতিহাসের তুলনায় অধিক প্রতিশোধ নেবে। যেমনটি স্পেনে ইসলামি হুকুমত বিলুপ্তির পর হয়েছিলো, হিন্দুস্তানে যা এখনো বহাল রয়েছে। যদিও এ ক্ষেত্রে মারাত্মক অবস্থা বিভাজনের কারণেও সৃষ্টি হয়েছে।

আমার আলোচনার উদ্দেশ্য আদৌ এমন নয় যে, কোথাও আক্রমণমূলক জিহাদ করা যাবে না, বরং অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্রের ওপর সামর্থ্য থাকা অবস্থায় আক্রমণাত্মক জিহাদ করা ওয়াজিব। বিষয়টি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। (বরং আরও কিছু অবস্থায় ওয়াজিব যার আলোচনার স্থান এটি নয়।) যেন কাফের সম্প্রদায়ের শক্তি ভেঙে চুরমার হয় এবং দাওয়াত ও তাবলিগের পথে কোনো অন্তরায় না থাকে। শত্রু ভাবাপন্ন নয় এমন যে সকল অমুসলিম দেশ মুসলিম দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী তারা যদি নিজ দেশে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ করতে অনুমতি প্রদান করে, তাহলে তাদের সঙ্গে আক্রমণমূলক জিহাদ উচিত নয়। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে সম্প্রসারণ ও দখলদারি নীতিকে খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। তবে এর বিপরীত হলো তৎকালীন যুগের বিজয়সমূহ। কারণ, ওই সময় বিজয় ছিলো

একটি সাধারণ ব্যাপার। তখন বিজয় ছিলো বাদশাহদের সৌন্দর্যের প্রতীক। যেসকল আক্রমণাত্মক জিহাদের ঘটনা দ্বারা ইতিহাস ভরপুর তার সবই ছিলো তৎকালীন যুগের কথা। তবে মুসলিমরা অবশ্যই নিজেদের সামরিক শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি করবে। এমনকি প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃদ্ধি করে রাখা উচিত। যাতে করে অমুসলিম রাষ্ট্র যুদ্ধের নাম নেওয়া তো দূরের কথা জিহাদের ভয়ে সর্বদা প্রভাবিত থাকে। সামরিক শক্তি অর্জন করা এবং তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা কুরআনের নির্দেশ। অতীতে বিজয়ের ব্যাপক প্রচলন থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের প্রাথমিক বিজয়গুলো ছিলো অন্যান্য জাতির বিজয়ের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যান্য জাতির বিজয় ছিলো শুধু শক্তির মহড়া এবং নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ করা। আগে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী নিজের কামনা-বাসনার জাহান্নাম পূর্ণ করাই ছিলো তাদের এসব কর্মের উদ্দেশ্য। তাদের এসব কর্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্দেশ্য রাজ্য বিস্তার ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। অথচ মুসলিমদের (জাজিরাতুল আরব, ইরান, রোমের জিহাদ ছাড়াও যেখানে এসব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি ছিলো) প্রাথমিক বিজয়সমূহের সময় রাজ্য বিস্তারের কোনো উদ্দেশ্যই ছিলো না। বরং তাদের মূল টার্গেট ছিলো আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং চতুর্দিকে ইসলামের দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়া। (আর এর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা ছিলো রাজ্য বিস্তার)। যেমন : হাকিমুল ইসলাম কারি মুহাম্মদ তৈয়্যব রহ. বলেন, বাহ্যত সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধ করতেন। তবে মূল উদ্দেশ্য ছিলো, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। যদি তাদের উদ্দেশ্য রাজ্য বিস্তার হতো, তাহলে নিশ্চয়ই তারা এমন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেন না যে, তোমাদের রাজ্য তোমাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। তবে আমাদেরকে শুধু এতটুকু সুযোগ দাও যে, আমরা যেন অনায়াসে ইসলামের প্রচার-প্রসার করে যেতে পারি। আমরা কাউকে বল প্রয়োগ করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবো না। যদি তাদের মন চায়, তাহলে মানতেও পারে, আবার নাও মানতে পারে। সেটি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। যারা এই চুক্তি মেনে নেবে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। যদি রাজ্য বিস্তার করাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এই চুক্তির কোনো প্রয়োজন হতো না। বরং তাদের রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতেন।

মোটকথা যখন অন্যান্য জাতি চুক্তিবদ্ধ বা জিম্মি হিসেবে থাকতে রাজি হতো,

তখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো। কারণ, মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। আর দাওয়াত ও তাবলিগের চূড়ান্ত রূপই হলো এটি।[১৩৯]

অধম নিজের চিন্তাধারাকে এখানে তুলে ধরেছে যেন জনাবের পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া সহজ হয়। ভালো থাকুন। ওয়াসসালাম।

বিনীত নিবেদক
—অধম সাইয়্যেদ বদরুল ইসলাম
জেদ্দা, সৌদি আরব

শাইখুল ইসলাম মুফতি তকি উসমানি-এর জবাব

মুহতারাম,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি জিহাদ বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, আমি এর সারমর্ম এমন বুঝেছি যে, যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র নিজেদের রাষ্ট্রে তাবলিগের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে এদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা জায়েজ নেই। আপনার বক্তব্য দ্বারা যদি এমনটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে অধম এর সঙ্গে একমত নয়। ইসলামের প্রচার-প্রসারের পথে প্রতিবন্ধকতা শুধু এতটুকুই নয় যে, অমুসলিম রাষ্ট্র তাবলিগের ওপর আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে। কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর হওয়া বাস্তবেই দীনে হকের তাবলিগের পথে অনেক বড়ো অন্তরায়। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতের ওপর আইনি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু পৃথিবীতে যেহেতু আজ তাদের বিরাট প্রভাব এবং শান-শওকত প্রতিষ্ঠিত; তাই তাদের এই প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে পুরো বিশ্বের এমন মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে যা মানুষের সত্য গ্রহণের পথে এমন এক বড়ো বাধা যা তাবলিগের ওপর আইনি বাধার চেয়েও বড়ো।

অতএব, কাফেরদের এই প্রভাব প্রতিপত্তিকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। যাতে অমুসলিমদের প্রভাবের কারণে যে মানসিকতা

---

[১৩৯] কারি মুহাম্মাদ তৈয়্যব সাহেব রহ. আওর উনকি মাজালিস, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৭-২৩৮।

সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হয়ে সত্য গ্রহণের রাস্তা সহজ হয়ে যায়। যতদিন পর্যন্ত তাদের এই প্রভাব-প্রতিপত্তি বাকি থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবেই। ফলে দীনে হক গ্রহণ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ, দীনে হক গ্রহণের আগ্রহ আর দিলে জাগ্রত হবে না। তাই জিহাদ জারি থাকবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بِالله وَلا بِالْيوْمِ الاخِرِ وَ لا يحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولهُ وَلا يدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتبَ حَتى يعْطُوا الْجِزْى عَن يدٍ وهمْ صغِرُونَ﴾

'তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের ওই লোকদের সঙ্গে যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিজিয়া প্রদান করে।'[১৪০]

এই আয়াতে জিহাদকে ওই সময় পর্যন্ত জারি রাখতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা নত হয়ে জিজিয়া আদায় না করবে। যদি জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু দাওয়াত ও তাবলিগের স্বাধীনতা হতো, তাহলে বলা হতো, যতক্ষণ পর্যন্ত তাবলিগের অনুমতি প্রদান না করবে। কিন্তু জিজয়া দেওয়া এবং তাদের অপমানিত হওয়ার কথা উল্লেখ করাটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, উদ্দেশ্য হলো তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সমূলে ধ্বংস করা এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে মানুষের মন-মানসিকতায় যে প্রভাব পড়েছে, তা দূর করে দেওয়া। এমনটি হলে মানুষ খোলামনে ইসলামের সৌন্দর্যের ওপর চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাবে। ইমাম রাজি রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে কাবিরে লিখেছেন—

لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ تَقْرِيرُهُ عَلَى الْكُفْرِ، بَلِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا حَقْنُ دَمِهِ وَإِمْهَالُهُ مُدَّةً، رَجَاءَ أَنَّهُ رُبَّمَا وَقَفَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَلَى مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ وَقُوَّةِ دَلَائِلِهِ، فَيَنْتَقِلُ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ... فَإِذَا أُمْهِلَ الْكَافِرُ مُدَّةً وَهُوَ يُشَاهِدُ عِزَّ الْإِسْلَامِ وَيَسْمَعُ دَلَائِلَ صِحَّتِهِ، وَيُشَاهِدُ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ فِي الْكُفْرِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى الِانْتِقَالِ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَهَذَا هو المقصود من شرع الجزية.

'জিজিয়ার উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে কুফরের ওপর বহাল রাখা নয়,

[১৪০] সুরা তাওবা, আয়াত : ২৯।

বরং জিজিয়ার মাকসাদ হলো, তাকে প্রাণে না মেরে কিছু সময় সুযোগ করে দেওয়া যাতে সে ওই সময়ের ভেতরে ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে এবং মজবুত দলিল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে কুফর ছেড়ে ইমানের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে। যদি কাফেরদের কিছু সময় অবকাশ দেওয়া হয়, তাহলে তারা সেসময় ইসলামের মাহাত্ম্য ও আভিজাত্য প্রত্যক্ষ করবে এবং এর সঠিকতার দলিল-প্রমাণ জানতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে কুফরের অপমান ও অসম্মান দেখবে। এতে আশা করা যায় এগুলো প্রত্যক্ষ করার পর সে ইসলামের প্রতি ধাবিত হবে এবং ইসলাম গ্রহণের আশা তার অন্তরে জাগ্রত হবে। মূলত এটিই হলো, জিজিয়া আদায়ের উদ্দেশ্য।'[১৪১]

দ্বিতীয় আরেকটি চিন্তা ও গবেষণার বিষয় হলো, নববি যুগে বা সাহাবি যুগে এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, অন্য কোনো দেশে হামলা করার আগে তাবলিগি মিশন পাঠিয়ে তাদের থেকে এ কথা শোনার প্রতীক্ষায় ছিলেন যে, তারা তাবলিগি মিশনকে প্রবেশের অনুমতি দেবে কি না? যদি না দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। রোমে হামলা করার আগে কোনো প্রতিনিধি দল কি তারা পাঠিয়েছিলেন? ইরানে হামলা করার আগে কি এ কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, যদি জিহাদের আমল ছাড়া শুধু তাবলিগের মাধ্যমেই কাজ হয়ে যায়, তাহলে উত্তম। প্রকাশ থাকে যে, কখনো এমন করা হয়নি। একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, তাবলিগের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া উদ্দেশ্যই ছিলো না। যদি উদ্দেশ্য এতটুকুই হতো, তাহলে একটি শর্তের মাধ্যমেই অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া যেতো আর মুসলিমদের তাবলিগি কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু অধমের জানা মতে, পুরো ইসলামি ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনার নজির পাওয়া যায় না, যেখানে শুধু তাবলিগি কার্যক্রমের অনুমতির শর্তে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এর স্থানে কাদেসিয়ার প্রান্তরে মুসলিমগণ যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা ছিলো-

وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله.

'মানবজাতিকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে যাওয়া।'[১৪২]

---

[১৪১] তাফসিরে কাবির, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৬২০।

[১৪২] কামিল ইবনু আসির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৮।

এমনিভাবে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হলো—

﴿وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ﴾

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেতনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' [১৪৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অধমের পিতা মাওলানা মুফতি শফি রহ. লেখেন—

দীনের অর্থ হলো প্রাবল্য ও বিজয়লাভ। তখন আয়াতের সার-সংক্ষেপ দাঁড়াবে মুসলিমরা কাফেরের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলিমরা তাদের জুলুম থেকে মুক্তি পায় এবং ইসলামের বিজয় না আসে, যাতে করে অন্যদের জুলুম থেকে মুসলিমদের মুক্ত করা যায়'।

একটু আগে বেড়ে তিনি বলেন, এই তাফসিরের সারমর্ম হলো, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করা ওয়াজিব, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের ওপর তাদের জুলুমের ফেতনা শেষ না হবে এবং সকল ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয় না আসবে। আর এ অবস্থাটা শুধু কেয়ামতের আগ মুহূর্তেই হবে। এজন্যে জিহাদের বিধান কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।[১৪৪]

মোটকথা, আমার মতে জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু তাবলিগি কাজে স্বাধীনতা অর্জন নয়, বরং কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান ঘটিয়ে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা; যাতে মুসলিমদের প্রতি কেউ বাঁকা চোখে তাকাতে না পারে। অপরদিকে কাফেরদের প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ যেন তাদের ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে। বাস্তবিক অর্থে ইসলামের সংরক্ষণই মূল উদ্দেশ্য। এই জন্যই কোনো কোনো আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন 'হেফাজতে ইসলাম' শব্দ দিয়ে। তবে কাফেরদের শক্তি ও প্রভাব ধ্বংস করে মুসলিমদের শান-শওকত প্রতিষ্ঠা করা ইসলাম হেফাজতের মৌলিক উপাদান। তাই এই মৌলিক উপাদানকে তা থেকে বের করা যাবে না। আমার জানামতে সকল শীর্ষস্থানীয় আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য একেই সাব্যস্ত করেছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরিস কান্ধলভি রহ. বলেন, 'জিহাদের বিধান দ্বারা

---

[১৪৩] সুরা আনফাল, আয়াত : ৩৯।

[১৪৪] মাআরিফুল কুরআন, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩৩।

কাফেরদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো, দীনকে পৃথিবীর বুকে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলিমরা যেন পৃথিবীতে ইজ্জত সম্মানের সঙ্গে জীবন-যাপন করতে পারে, নিরাপত্তার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারে; কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার আশংকা না থাকে সেই ব্যবস্থা করা। তারা যেন ধর্ম পালনে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে না পারে। ইসলাম কখনো নিজের দুশমনদের অস্তিত্বের দুশমন নয়, বরং তাদের এমন শান-শওকত ও প্রভাব প্রতিপত্তির দুশমন যা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য আশংকা-স্বরূপ'।[১৪৫]

অন্য আরেক স্থানে তিনি লেখেন, মহান আল্লাহ বলেছেন—

﴿وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ﴾

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ পর্যন্ত না ফেতনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' [১৪৬]

আলোচ্য আয়াতে ওই ধরনের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, হে মুসলিম তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করো যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরের ফেতনা নির্মূল না হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই আয়াতে ফেতনা দ্বারা কুফরি শক্তি এবং তাদের শান-শওকতের ফেতনা উদ্দেশ্য। আর আয়াতে ويكون الدين كله لله দ্বারা দীনের প্রচার-প্রসার ও দীনের বিজয় উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এসেছে ليظهره على الدين كله অর্থাৎ, দীন এই পরিমাণ বিজয়ী ও শক্তিশালী হওয়া যাতে কুফরি শক্তির মাধ্যমে পরাজিত হওয়ার আশংকা না থাকে এবং দীনে ইসলাম কুফরের ফেতনা থেকে পুরোপুরিভাবে আশংকামুক্ত হয়ে যায়।[১৪৭]

আর যদি দাওয়াত ও তাবলিগি কার্যক্রমের অনুমতি পাওয়ার পরই জিহাদের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়, তাহলে আজকাল পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই দাওয়াত ও তাবলিগের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। (আফসোস আজো কোনো কোনো মুসলিম দেশ এর অনুমতি দিচ্ছে না) এ অবস্থায় কি এ কথা বলা হবে যে, এখন আর তরবারি ওঠাবার প্রয়োজন নেই? পুরো পৃথিবীতে কুফরি শক্তির

---

[১৪৫] সিরাতে মুস্তফা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৮।

[১৪৬] সুরা আনফাল, আয়াত : ৩৯।

[১৪৭] সিরাতে মুস্তফা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৬।

শান-শওকত ও বিজয় নিশান উড়তে থাকবে, তাদের পলিসি চলবে, তাদের বিধিবিধান সবই মানতে হবে, তাদের কৃষ্টি-কালচার ছড়িয়ে যাবে, তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, আর মুসলিমরা এ নিয়ে তুষ্ট থাকবে যে, তাদেরকে অমুসলিম দেশে ধর্ম প্রচারে কোনো ধরনের বিধি নিষেধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। প্রশ্ন হলো, যে পৃথিবীতে কুফরি শক্তির প্রভাব প্রতিপত্তি কায়েম আছে; সেখানে আপনার তাবলিগের অনুমতি মিলে যাওয়ায় কতজন লোক এমন হবে যারা তাবলিগকে সাদরে গ্রহণ করবে এবং কতজন লোক বুঝে-শুনে ইসলামের ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে প্রস্তুত থাকবে? যে পরিবেশে রাজনৈতিক শক্তির আশ্রয়ে ইসলাম ও তার শিক্ষা-দীক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তা-চেতনা প্রচার হচ্ছে এবং তা প্রচার-প্রসারে ওইসব মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে যা মুসলিমরা ব্যবহার করতে পারে না। এমন এলাকায় শুধু তাবলিগ করার অনুমতি পেলে তা অমুসলিমদের মাঝে কতটুকুই বা প্রভাব ফেলতে পারবে?

হাঁ যদি ইসলাম ও মুসলিমদের এমন শক্তি ও শান-শওকত অর্জিত হয়ে যায় যার বিরুদ্ধে কুফরি শক্তি মাথা ওঠাতে পারে না অথবা কমপক্ষে ওই ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে না, যার আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন করা জিহাদের বিধানের পরিপন্থি নয়। এমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরি শক্তির প্রভাবকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি নিঃসন্দেহে বৈধ।

অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে দুই অবস্থায় চুক্তি হতে পারে—

১. যে সকল রাষ্ট্রের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা মুসলিমদের কোনো ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই সেসব রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি ও নিরাপত্তার চুক্তি করা যেতে পারে। অবশ্য এর মেয়াদকাল হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলিমদের জন্য হুমকি-স্বরূপ না হবে।

২. যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য সামরিক শক্তি অর্জনে সক্ষম না হবে। অর্থাৎ, যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করা যেতে পারে।

আপনি 'আল বালাগ'-এর মুহাররম ১৩৯১ হিজরি সংখ্যায় প্রকাশিত আমার যে বিষয় বস্তুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে ওই চুক্তিগুলোই উদ্দেশ্য। আর রবিউস সানি

১৩৯১ হিজরি সংখ্যায় প্রকাশিত যে বিষয়ের উদ্ধৃতি আপনি টেনেছেন এতে ওই পদ্ধতি উদ্দেশ্য, যখন কাফেরদের প্রভাব মুসলিমদের প্রভাবের ওপর প্রবল হবে।

সুতরাং আপনি যা লিখেছেন, শত্রু, অকল্যাণকামী ও শত্রুভাবাপন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষমতা থাকলে আক্রমণাত্মক জিহাদ করা ওয়াজিব। যেন তাদের শক্তি খর্ব হয়ে যায় এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি না থাকে। আর যে সকল অমুসলিম বন্ধুদেশ দাওয়াত ও তাবলিগ করার অনুমতি প্রদান করে, তাদের সঙ্গে আক্রমণাত্মক জিহাদ করা মুনাসিব নয়। যদি এর মাধ্যমে আপনার উদ্দেশ্য এমন হয়, যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, তাহলে তা ঠিক আছে। আর যদি আপনার উদ্দেশ্য এমন হয় যে, শুধু দাওয়াত ও তাবলিগের অনুমতি প্রদান করলেই একটি অমুসলিম দেশ মিত্রদেশ ও কল্যাণকামী দেশে পরিণত হয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে জিহাদ করা মুনাসিব থাকে না, তাহলে অধমের মতে আপনার এই চিন্তাধারা আদৌ সঠিক নয়। যার দলিল প্রমাণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

আপনার এই বক্তব্য যে, ''আজকাল বিশেষত সম্প্রসারণ ও দখলদারি নীতিকে খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। তবে এর বিপরীত হলো ওই যুগ যে যুগে বিজয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। আর সেসব বিজয় রাজা-বাদশাহদের প্রশংসনীয় কীর্তির মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতো। আর যেসকল আক্রমণমূলক জিহাদের ঘটনা দ্বারা ইসলামের ইতিহাস ভরপুর রয়েছে ওই সকল ঘটনা ওই যুগেই ছিলো।' আপনার কথার প্রতি আমার শতভাগ মূল্যায়ন রয়েছে। তবে আমি এর সঙ্গে কঠোর বিরোধিতা রাখি। কেননা আপনার এ কথা যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য হবে, ভালো-মন্দ যাচাইয়ের জন্য ইসলামের কোনো নীতিমালা নেই। তাই কোনো যুগে কোনো মন্দ বিষয়কেও যদি ভালো মনে করা হয়, তাহলে ইসলামও সেটিকে ভালো মনে করে। আর যে যুগে এটিকে লোকেরা খারাপ মনে করে তখন ইসলামও তাকে খারাপ মনে করে।

প্রশ্ন হলো, আক্রমণাত্মক জিহাদ বাস্তবেই কল্যাণকর কি না? যদি কল্যাণকর হয়ে থাকে, তাহলে শুধু এই অজুহাতে কেন আক্রমণাত্মক জিহাদ থেকে মুসলিমরা বিরত থাকবে যে, আজকাল সম্প্রসারণ ও দখলদারি নীতিকে খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর যদি বাস্তবেই তা কল্যাণকর না হয়, তাহলে অতীতে ইসলাম কেন এ থেকে বারণ করেনি? তাহলে কি শুধু এ কারণেই আক্রমণাত্মক জিহাদের

আমল চলে আসছে যে, এটি রাজা-বাদশাহদের সৌন্দর্যের প্রতীকের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতো।

অধমের মতে ইসলামের ইতিহাসের আক্রমণমূলক জিহাদের এই ব্যাখ্যা চরমভাবে বিকৃত এবং বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। প্রকৃত কথা হলো, কাফেরদের শক্তিকে শেষ করার জন্য ওই যুগেও জিহাদের আমল হয়েছে। যখন এগুলো ছিলো রাজা বাদশাহদের সৌন্দর্যের প্রতীক। এ জন্য নয় যে, সে যুগে এর ব্যাপক প্রচলন ছিলো বরং এ জন্য যে, আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তা ছিলো বাস্তবেই কল্যাণকর। অন্যথায় বাদশাহদের সৌন্দর্যের মাঝে এটিও ছিলো যে, তারা বিজয়ের নেশায় মত্ত হয়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও কোনো পার্থক্য করতো না।

কিন্তু ইসলাম এই ব্যাপক প্রচলনের ওপর ভিত্তি করে এমন নিন্দনীয় বিষয়ের ওপর আমল করাকে পছন্দ করেনি; বরং ইসলাম যুদ্ধের এমন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। শুধু প্রণয়নই করেনি বরং বাস্তবে আমল করেও দেখিয়েছে যা ওই যুগের বাদশাহরা কল্পনাও করতে পারেনি। এমনকি ওইসব নীতিমালা ছিলো নির্যাতিত ও মজলুম জনতার জন্য চমকপ্রদ ও আশার আলো যারা বাদশাহদের এমন নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করেও বাদশাহর প্রশংসায় ছিলো পঞ্চমুখ।

যে উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক জিহাদ প্রথম যুগে জায়েজ ছিলো, সে উদ্দেশ্যে আজো আক্রমণাত্মক জিহাদ জায়েজ আছে। শুধু এ অজুহাতে তার বৈধতাকে আড়াল করা যেতে পারে না যে, পারমাণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারকারী নিরাপত্তার দাবিদাররা সম্প্রসারণনীতির ভয় দেখিয়ে আমাদের ওপর নাক সিটকাবে। যাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এশিয়াসহ আফ্রিকার অধিকাংশ জাতি এখনো রক্তের বন্যায় প্লাবিত।

আমার গোস্তাখি মাফ করবেন আমার মনে হয় এটিও কাফেরদের ব্যাপক প্রোপাগান্ডার ভিত্তিতেই হয়েছে যে, মানুষ ভালো-মন্দের বিচার করে বিশ্বব্যাপী এমন অপপ্রচারের ওপর ভিত্তি করে যা মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা বলে প্রচার করে থাকে। তারা এমন জোরালোভাবে প্রচার-প্রসার করে যে, অমুসলিম তো পরের ব্যাপার, বরং স্বয়ং মুসলিমরাই তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের দীনের ব্যাপারে, বিধিবিধানের ব্যাপারে অযাচিত মন্তব্য করতে উৎসাহবোধ করে। যদি বাতিল পন্থীদের প্রতিপত্তিকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়াও সম্প্রসারণবাদি

নীতির শামিল হয়, তাহলে আমরা এমন নীত মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি। এমন নয় যে, আমরা ওই মন্তব্যকারীদের সামনে হাত জোর করে বসে থাকবো যে, আপনারা যখন আক্রমণাত্মক জিহাদকে ভালো মনে করবেন, তখন আমরাও তাকে ভালো মনে করে তার ওপর আমল করতে থাকবো। আর যখন আপনারা নিজেদের গ্রন্থাবলিতে একে মন্দ বলতে শুরু করবেন, তখন আমরাও একে নিজেদের ওপর হারাম করে নেবো। আপানার এই দৃষ্টিভঙির সঙ্গে অধমের একমত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

কৃতজ্ঞতা : আল-বালাগ, মুহাররম সংখ্যা, ১৪০৫হি.

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

মাকতাবাতুল ইসলাম থেকে প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. পরকালের সম্বল : সহজে নেকি অর্জন [আসান নেকিয়া]

২. দেশ দেশান্তর-১ [জাহানে দিদা-১]

৩. দেশ দেশান্তর-২ [জাহানে দিদা-২]

৪. দেশ দেশান্তর-৩ [দুনিয়া মেরে আগে]

৫. দেশ দেশান্তর-৪ [সফর দর সফর]

৬. নির্বাচিত গল্প [সংকলন]

৭. ইসলাহি গল্প [সংকলন]

৮. ইমানি গল্প [সংকলন]

৯. আমার পিতা আমার শায়খ [মেরে ওয়ালিদ মেরে শায়খ]

১০. সুদবিহীন ব্যাংকিং [গায়রে সুদি ব্যাংকারি]

পাঠকের পাতা

ফিকহি মাকালাত তৃতীয় খণ্ডে যা আছে

- ব্যাংক-ডিপোজিটের শরয়ি বিধান
- রপ্তানির শরয়ি বিধান
- আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় জুমার খুতবা দেওয়ার বিধান ও চার ইমামের মাজহাবের তাহকিক
- জাকাতের আধুনিক মাসায়েল
- তিন তালাকের শরয়ি বিধান
- চিংড়ি খাওয়ার শরয়ি বিধান
- হাত-বহাত ক্রয় বিক্রয়ের শরয়ি বিধান
- বিনা দরদামে অল্প অল্প পণ্য ক্রয়ের বিধান
- মুদারাবা সার্টিফিকেটের শরয়ি বিধান
- জিহাদ আক্রমণাত্মক নাকি প্রতিরক্ষামূলক

মাকতাবাতুল ইসলাম
www.maktabatul-islam.com